KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ১৯/১ ১৯/২ ১৯/৩ ১৯/৪	Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৫৪ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৫৪ কার্তিক - পৌষ ১৩৫৪ মাঘ - চৈত্র ১৩৫৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

চ তু র ঙ্গ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

হুমায়ুন কবির
সম্পাদিত
ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৪

দম আটকাতে বসবেন না !

খাপী জামায় এমন ক'রে ফাঁস লাগাবার কি দরকার—আজকাল তো হাত বাড়ালেই 'স্যানফোরাইজ্‌ড' কাপড় পাওয়া যাচ্ছে। 'স্যানফোরাইজ্‌ড' মার্কা কাপড় দিয়ে জামা করালে যতবারই কাচুন না কেন কখনো কুঁচকে খাটো হবে না।

দেখে নেবেন ·SANFORIZED· REGD TD MK মার্কা

তা'হলে আপনার পোশাক আর কখনো
কুঁচকে খাটো হবে না!

রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক 'স্যানফোরাইজ্‌ড'-এর স্বত্বাধিকারী ক্লুয়েট, পীবডি এণ্ড কোং, ইনক (সীমাবদ্ধ দায়িত্ব সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত) কর্তৃক প্রচারিত। 'স্যানফোরাইজ্‌ড' ট্রেডমার্ক কেবলমাত্র যে সমস্ত কাপড় কুঁচকে খাটো হয়ে যাওয়া নিরোধ করবার জন্য কোম্পানীর কঠিন মান উত্তীর্ণ হতে পারে তাতেই ব্যবহার করবার অনুমতি দেওয়া হয়।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য—'স্যানফোরাইজ্‌ড' সার্ভিস, ৯৫, মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই-২

ACP 4368 R

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

চতুরঙ্গ

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪

॥ সূচীপত্র ॥

আবুল কালাম আজাদ ॥ আঠারশো সাতান্ন ১

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ শত বর্ষ আগে ১৫

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ ট্রেনের জানলা ১৯

বিষ্ণু দে ॥ সনেট ২০

হুমায়ুন কবির ॥ আমেরিকার চিঠি ২১

লীলা মজুমদার ॥ চীনে লণ্ঠন ৩৩

বিনয় ঘোষ ॥ বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের সমস্যা ৭১

নীহাররঞ্জন রায় ॥ আধুনিক সাহিত্য ৮৬

সমালোচনা—হুমায়ুন কবির, অমলেন্দু বসু,
সরোজ আচার্য, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,
অচ্যুত গোস্বামী ও অশোক মিত্র ৯১

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ১২ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

PSI 7

আঠারশো সাতান্ন

আবুল কালাম আজাদ

অতীতের যে সমস্ত ঘটনা আমাদের চিত্তে গভীর আবেগ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে কোন বস্তুনিষ্ঠ ইতিবৃত্ত রচনা করা যে কত কঠিন, সে কথা আমি জানি। ব্যক্তিগত, জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় নানা সংস্কারের প্রভাব এসে পড়ে ব'লে নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে বিভিন্ন ঘটনার বিচার যে কী দুরূহ, সে বিষয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। সত্যিকার অর্থে ঐতিহাসিক হ'তে হ'লে সেই চেষ্টাই কিন্তু সমস্ত মন দিয়ে সর্বদাই করতে হবে। একথাও আমি মানি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের ইতিহাস লেখা আরও দুরূহ ছিল। সেই কাজ দু'টি কারণে এখন খানিকটা সহজ হ'য়ে এসেছে। প্রথমত, যে সমস্ত ঘটনা নিয়ে আমাদের আলোচনা, তারা এখন এক-শো বছর পুরানো হ'য়ে গেছে। যে সময় সে-সব ঘটনা ঘটেছিল, সেই সময়কার তীব্রতা ও বেদনা আজ অনেকখানি ম্লান। কালের এই ব্যবধানের দরুণ তখনকার কালের নায়ক-নায়িকাদের কার্যকলাপ আজ আমরা অনেকটা নিরাসক্ত ও সংস্কারমুক্ত চোখে দেখতে পারি। তা ছাড়া, পুরানো এইসব ঘটনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করবার প্রয়োজনও আজ আর নেই। ভারত এবং ব্রিটেনের রাজনৈতিক সম্বন্ধের সমস্যার আজ সমাধান হয়েছে। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে এই সমাধান সম্ভব হয়েছে ব'লে উভয় দেশের মধ্যে আজ নতুন ক'রে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভারত ও ব্রিটেনের সম্বন্ধ বিচারে আগেকার দিনের যে তিক্ততা, সে তিক্ততার এখন আর পরিচয় মেলে না। যে নতুন আবহাওয়ার আজ সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে ১৮৫৭-র ঘটনাবলী আজ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে নিরাসক্তভাবে বিচার করা যায়। ভারতীয় সিপাহী এবং ইংরেজশাসক, কোনো দলেরই দোষত্রুটিগুলিকে আজ বাড়িয়ে তুলবার বা ঢাকবার কোন প্রয়োজন নেই।

এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময়কার কোন ভারতবাসীই ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংগ্রাম বা বিপ্লবের কোনো বিবরণ লেখেননি। একটু ভাবলেই কিন্তু কেন লেখেননি তা বোঝা যায়। ইংরেজ রাজশক্তি নির্মমভাবে আন্দোলন দমন করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত দেশে সেদিন দারুণ একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছে। বিনা বিচারে শত শত লোকের

প্রাণদণ্ড হয়েছে। গাছের ডালে ফাঁসি-দেওয়া লোকের মৃতদেহ দেখে ব্রিটিশ সরকারের নৃশংসতার কথা ভেবে দেশের জনসাধারণ আতঙ্কে শিউরে ওঠেনি, উত্তর ভারতে এমন অঞ্চল ছিল না বললেই চলে। ১৮৫৭-র ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন ভারতীয়-ই তাই সেদিন স্পষ্টভাবে নির্ভয়ে কিছু বলতে বা লিখতে সাহস করেনি। ব্রিটিশ সরকারের কয়েকজন সমর্থক বা কর্মচারী কিছু কিছু লিখে গেছেন বটে, কিন্তু স্বাধীন এবং স্পষ্টভাবে লেখার সাহস কারোরই ছিল না।

তখনকার দিনের ভারতীয়েরা যে ভয়ে কি রকম অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল, মির্জা মৈনুদ্দিনের দৃষ্টান্ত থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মৈনুদ্দিন তখন দিল্লীর সহরতলীর দারোগা ছিলেন। গোলমালের সময়ে তিনি পারস্যে পালিয়ে যান এবং দু'বছর বাদে ভারতে ফিরে আসেন। আন্দোলনের কালে তিনি সার থিওফিলাস মেটকাফের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। বিদ্রোহান্তে মেটকাফ তাঁকে তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিষয়ে লিখতে অনুরোধ করেন। মৈনুদ্দিন যথারীতি তা লিখে মেটাকাফকে দিলেন। দিলেন কিন্তু একটি স্পষ্ট সর্তে, যে যতদিন মৈনুদ্দিন জীবিত থাকবেন, তাঁর সে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হ'তে পারবে না। তাঁর সেই বৃত্তান্তের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-ই ছিল না; শুধু তিনি নিজে বিদ্রোহের সময় কি কি করেছিলেন, তার কথাই লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি এত আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন যে, কেবলমাত্র উপরিউক্ত সতেই মেটকাফকে পাণ্ডুলিপি দিতে রাজী হয়েছিলেন। মেটকাফ তাঁর কথা রাখেন এবং মৈনুদ্দিনের মৃত্যু-সংবাদ পাবার পরই সেই বৃত্তান্তের একটি ইংরেজী অনুবাদ করিয়েছিলেন। মেটকাফের জীবদ্দশায় সেই ইংরেজী অনুবাদ আর প্রকাশিত হ'তে পারেনি।

২

প্রায়-ই প্রশ্ন ওঠে, সিপাহী বিদ্রোহের জন্য দায়ী কারা? অনেক সময় বলা হয় যে একদল লোকের সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমার কিন্তু সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ আছে। আন্দোলনের সময় এবং তা শেষ হবার পরেও ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহের উৎপত্তি এবং কারণ নিয়ে অনেক খোঁজখবর ও সযত্ন গবেষণাকার্য চালিয়েছিলেন। হাউস অব কমন্সে লর্ড সালসবেরী স্পষ্টই বলেছিলেন, যে কেবল চর্বি-মেশানো টোটার জন্য এত বড় ব্যাপক ও বিরাট একটা বিদ্রোহ সংঘটিত হ'তে পারে, একথা বিশ্বাস করতে তিনি একেবারেই রাজী নন। আপাতচোখে যা মনে হয় তার চাইতে গভীর কোন কারণে যে এই বিদ্রোহ হয়েছিল, এ বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল না। সেই কারণ বা কারণগুলি কি সে সম্পর্কে খোঁজ করবার জন্য ভারত সরকার এবং পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার উভয়েই অনেকগুলি কমিশন ও বোর্ড নিয়োগ করেছিলেন। সেই সময়কার প্রচলিত সমস্ত কাহিনী-উপকাহিনীই প্রযত্নের সঙ্গে তাঁরা বিশ্লেষণ করেছিলেন। হাতে-বেলা রুটি বা চাপাতির মাধ্যমে খবর পাঠানো ও প্রচারের গল্প তখন প্রচলিত ছিল। ভারতে ইংরেজ মাত্র এক-শো বছর রাজত্ব করতে পারবে এবং পলাশীর যুদ্ধের এক-শো বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৫৭-র জুন মাসে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটবে, এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণীও তখন অনেকেই বিশ্বাস করত। অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা করার পরেও কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারেই বিপ্লব ঘটেছিল। ভারতীয় সৈন্যদল

ও জনসাধারণ কোম্পানীর শাসন নির্মূল করার জন্য আগে থেকেই সমবেতভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তারও কোনো প্রমাণ মেলেনি। বহুদিন থেকে আমার নিজেরও এই বিশ্বাস ছিল এবং সাম্প্রতিক গবেষণায় আমার ধারণা পরিবর্তন করার মতো নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি।

বাহাদুর শাহ্-র বিচারের সময় তাঁকে ব্রিটিশ শাসন-উচ্ছেদকারী পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক প্রমাণ করার বহু চেষ্টা হয়েছিল। যে সমস্ত সাক্ষি-সাবুদ ও তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছিল, সে সময়কার ইংরেজ বিচারকের চোখেও তা প্রামাণিক মনে হয়নি। সাধারণ বিচারবুদ্ধির লোকের কাছে আজ তা হাস্যকর মনে হবে। বস্তুতপক্ষে বাহাদুর শাহের বিচারের ফলে এটাই প্রমাণ হয়েছিল যে, বিপ্লব তখন যে ভাবে যে সময়ে ঘটেছিল, তাতে ইংরেজশাসক যতখানি আশ্চর্য হয়েছেন, বাহাদুর শাহ তার চেয়ে কম আশ্চর্য হননি।

৩

এই শতাব্দীর গোড়াতে কয়েকজন ভারতীয় লেখক ১৮৫৭ সালের আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাঁদের সেই বইগুলি ইতিহাস নয়, রাজনৈতিক প্রচার মাত্র। সিপাহী বিপ্লবকে তাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের পূর্বপরিকল্পনা-অনুগামী স্বাধীনতাযুদ্ধ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। জনকয়েক বিদ্রোহী নেতাকে তাঁরা এই বিদ্রোহের পরিকল্পনাদাতা ও সংগঠকরূপেও চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বলা হয় যে শেষ পেশোয়া বাজী রাওয়ের উত্তরাধিকারী নানাসাহেব সিপাহী বিদ্রোহের একজন প্রধান পরিচালক ও নেতা ছিলেন এবং ভারতের সমস্ত সামরিক ঘাঁটিগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এর প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বলেন, নানাসাহেব ১৮৫৭-র মার্চ ও এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ ও আম্বালায় গিয়েছিলেন এবং তার কিছুদিন পরেই মে মাসে বিদ্রোহ সুরু হয়। এই ঘটনা সমাবেশকে কিন্তু প্রমাণ বলা চলে না। বিদ্রোহের কিছুদিন আগে নানাসাহেব লক্ষ্ণৌ এবং আম্বালা হয়তো গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে তিনিই বিদ্রোহের সংগঠক ছিলেন।

এই সমস্ত অনুমান যে কতখানি ভিত্তিহীন একটি দৃষ্টান্ত দিলে তা পরিষ্কার হবে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অযোধ্যার উজির আলি নকি খাঁ-কে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নায়ক বলে প্রমাণ করতে চান। এই সময়কার অযোধ্যার ইতিহাস নিয়ে যিনি পড়াশুনো করেছেন, তাঁর কাছে এই অনুমান হাস্যকর মনে হবে। আলি নকি খাঁ মনে-প্রাণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তাঁবেদার ছিলেন। ইংরেজরা চেয়েছিলেন, ওয়াজিদ আলি শাহ্ স্বেচ্ছায় তাঁর রাজ্য ছেড়ে দেন। এ উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য তাঁরা আলি নকির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট জেনারেল আউটরাম আলি নকি খাঁকে প্রচুর পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আলি নকি খাঁ ওয়াজিদ আলি শাহ্-কে এত বেশী পাঁড়াপাঁড়ি সুরু করেন যে অবশেষে ওয়াজিদ আলির মা ভাবলেন যে হয়তো আলি নকি ছলে-কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে বসবেন। সেই আশঙ্কাতে তিনি রাজ্যের শীল-মোহর নিজে নিয়ে অন্তঃপুরে রেখে দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে তাঁর হুকুম ছাড়া সেই শীল-মোহর কেউ বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না। লক্ষ্ণৌর প্রায় সকলেই এ সব কথা জানেন এবং তাঁরা আলি নকি খাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘৃণা করেন। এমন লোককে সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম সংগঠক মনে করা যে কতখানি অবাস্তব ও অসম্ভব, তা সহজেই বোঝা যায়।

মুন্সী আজিমুল্লা খাঁ এবং রঙ্গো বাপুজীকেও অনেক সময় বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী মনে করা হয়। আজিমুল্লা খাঁ ছিলেন নানাসাহেবের প্রতিনিধি। নিজের পক্ষসমর্থনের জন্য এবং বাজী রাওয়ের পেন্‌সন্‌ যাতে তিনিও পান, সে তদ্বির করার জন্য নানাসাহেব তাঁকে লন্ডন পাঠিয়েছিলেন। লন্ডন থেকে ফেরার পথে তিনি তুরস্কে যান এবং সেখানে ক্রিমিয়ার রণাঙ্গনে ওমর পাশার সঙ্গে দেখা করেন। আজিমুল্লার মতো রঙ্গো বাপুজীও একই ধরনের উদ্দেশ্যে লন্ডন গিয়েছিলেন। ডালহৌসী সাতারাকে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ডালহৌসীর সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করতেই রঙ্গো বাপুজী লন্ডন যান।

আজিমুল্লা ও রঙ্গো বাপুজী কোম্পানীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করতে লন্ডন গিয়েছিলেন ব'লে অনেকে মনে করেন যে তাঁরা বিদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। এসব কথা অনুমান মাত্র এবং অনুমান প্রমাণ নয়। তা ছাড়া লণ্ডনে এক-ই ধরনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কথাবার্তা যদি তাঁরা ব'লেও থাকেন, কেবলমাত্র তার উপরে নির্ভর ক'রে তাঁদের বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বলা চলে না। ভারতের ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক যতক্ষণ খুঁজে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাঁদের বিদ্রোহের অগ্রণী বলা চলে না। তেমন কোনো সম্পর্কের কোনোরকম প্রমাণ মেলেনি। তাই উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে আমরা তাঁদের বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারী ব'লে গণ্য করতে পারি না। কানপুরের কাছে বিঠুর অধিকারের পর নানা সাহেবের সমস্ত কাগজ ও দলিলপত্রাদি ইংরেজদের হাতে আসে। আজিমুল্লা খাঁ-র কাগজ-পত্রও তাঁদের হাতে পড়ে। এই কাগজপত্রের মধ্যে ওমর পাশাকে লেখা আজিমুল্লার একটি চিঠি ছিল। চিঠিতে তিনি ওমর পাশাকে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের কথা জানিয়েছিলেন। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে চিঠিটি লেখা হ'লেও পাঠানো হয়নি। এবং এই চিঠি কিংবা অন্য কোনো কাগজপত্র থেকে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে ভারতে আজিমুল্লা কখনো বিদ্রোহের পরিকল্পনা বা চেষ্টা করেছিলেন।

যে সমস্ত সাক্ষি-প্রমাণ মেলে তার বিচার করলে এই সিদ্ধান্তই আনিবার্য হ'য়ে দাঁড়ায় যে ১৮৫৭-র বিপ্লব কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলে হয়নি। বিদ্রোহের খসড়া তৈরি করেছিলেন এক বা অধিক এমন কোনো চিন্তানায়কেরও পরিচয় মেলে না। কোম্পানীর শাসনে এক-শো বছর কাটানোর ফলে কোম্পানীর প্রতি ভারতীয়দের মনে বিরাগ জন্মে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম কোম্পানী নবাব অথবা সম্রাটের নামে শাসনকার্য চালাতেন। ভারতীয়রা তাই দীর্ঘদিন যাবৎ বুঝতে পারেননি যে ইংরেজ ক্রমশ ভারতবর্ষ অধিকার ক'রে ফেলছেন এবং এভাবে বিদেশী রাজ্যস্থাপনের ফলে ভারতবাসী স্বদেশেই পরাধীন বা গোলাম হ'তে চলেছে। ব্যাপকভাবে এই বোধ এবং উপলব্ধি যখন জাগল তখন-ই বিপ্লবের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো। অবশেষে বিদ্রোহ যখন সত্য সত্যই ঘটল, তখন ব্যক্তি বা দলের ষড়যন্ত্রের ফলে তা ঘটেনি—জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিক্ষোভের ফলেই তা ঘটেছে।

৪

স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন ওঠে, ভারতবাসীদের এই বিদ্রোহ ঘটতে প্রায় এক-শো বছর লাগলো কেন? সে কালের ঘটনা-পরম্পরার বিচার করলেই তার জবাব পাওয়া যাবে। ভারতে

ব্রিটিশ শাসনের ক্রমপ্রসারণের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া বোধ করি দুর্লভ। বিদেশের লোক রাতারাতি এসে এ দেশ অধিকার করেনি। এ-দেশের উপর কর্তৃত্ব তারা আস্তে আস্তে বিস্তার করেছে এবং এ দেশের লোকেরাই সে-কাজে তাদের সাহায্য করেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজ ইংলণ্ডেশ্বরের নাম ক'রে আসেনি, এসেছে বণিক হিসাবে। ফলে তাদের কর্মকৃতির সত্যকার রূপ ভারতবাসীর চোখে সহজে ধরা পড়েনি। গোড়া থেকে যদি ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতো, তাহ'লে ভারতীয়দের বুঝতে দেরী হতো না যে একটি বিদেশী শক্তি তাদের দেশে অধিকার বিস্তারে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু কোম্পানী ছিল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। এ দেশের লোক তাই বহুদিন বোঝেনি যে বণিকের ছদ্মবেশে নতুন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কোম্পানীর প্রতিনিধিরাও সেকালে এমন আচার-ব্যবহার করতো, যা কোনো রাজপ্রতিনিধিই করতে পারতো না। ইংরেজ অথবা অন্য যে কোনো নরপতির প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি এ দেশের ছোটখাট রাজা-রাজড়া বা মোগল দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কথায় কথায় সেলাম জানাতে বা কুর্নিশ করতে নিশ্চয়ই ধিধাবোধ করতো। কোম্পানীর প্রতিনিধিদের এসব কোনো বালাই ছিল না। যে কোনো ভারতীয় বণিকের মতো তারাও নগণ্যতম রাজকর্মচারীর কাছেও প্রয়োজন হ'লে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে নতিস্বীকার করতো। রাজ্যশাসনের ভয় ছিল না ব'লে অন্যান্য বণিকের মতো তারাও ঘুষ দেওয়া-নেওয়া বা তজ্জাতীয় অপরাধ-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে কখনো পশ্চাৎপদ হতো না।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, কোম্পানী দীর্ঘদিন যাবৎ নিজের নামে কোনোরকম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেনি। যখন-ই স্বার্থসিদ্ধি ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন হয়েছে, কোম্পানী একজন না একজন স্থানীয় শাসনকর্তার সঙ্গে অসঙ্কোচে হাত মিলিয়েছে। কর্ণাটকের নবাবের পক্ষসমর্থন ক'রে কোম্পানী দক্ষিণে তার অধিকার কায়েম করেছিল। বাংলাদেশেও তারা মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমের অধীনে এবং তাঁর হ'য়ে শাসনকার্য চালাতো। বাংলাদেশের প্রকৃত শাসনকর্তা হবার পরেও বহুদিন কোম্পানী স্বাধীন রাজার অধিকার বা মর্যাদা দাবি করেনি। সম্রাটের কাছে ক্লাইভ দেওয়ানী অধিকারের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং বহুদিন পর্যন্ত কোম্পানী সম্রাটের নায়েব হিসাবেই শাসনকার্য চালিয়েছিল। শুধু তাই নয়, অন্যান্য সুবাদার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তার মতো কোম্পানীও প্রচলিত রীতি-নীতি বা নিয়মকানুন পালন ক'রে চলত। এই সব প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিজেদের শৌল-মোহর ছিল, কিন্তু সেই শৌল-মোহরেও তাঁরা নিজেদের মোগল সম্রাটের অনুগত ভৃত্যরূপেই বর্ণনা করতেন। তাঁদের মতো কোম্পানীর গভর্নর-জেনারেলেরও নিজস্ব শৌল-মোহর ছিল এবং তিনিও নিজেকে দিল্লীর সম্রাট শাহ্‌ আলামের ভৃত্য ব'লেই ঘোষণা করতেন। অন্যান্য সুবাদার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হতেন, তাঁকে উপহার-উপঢৌকন দিতেন এবং বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার পেতেন। কোম্পানীর গভর্নর-জেনারেলও অনুরূপভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর দরবারে হাজির হ'য়ে এক-শো গিনির নজর পেশ করতেন। বিনিময়ে সম্রাট তাঁকে খেলাত ও পদবী দিতেন এবং এ উপাধিগুলি সমস্তরকম দলিলপত্রে ব্যবহৃত হত। এভাবে কোম্পানী সম্রাটের সার্বভৌমত্ব আপাতদৃষ্টিতে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। ফলে, বণিকের মানদণ্ড কেমন ক'রে ধীরে ধীরে রাজদণ্ডে পরিণত হলো, দেশের লোকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা বুঝতে পারেনি।

বণিকের মানদণ্ডের রাজদণ্ডে পরিণতির প্রক্রিয়া উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত

অব্যাহত ছিল। ততদিনে কোম্পানীর অধিকার শতদ্রু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। লর্ড হেস্টিংস তখন গভর্নর-জেনারেল। তাঁর বিশ্বাস হলো যে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ক'রে সম্রাটকে অস্বীকার করবার সময় এসেছে। সম্রাটের সামনে তখন কারোর বসবার অধিকার ছিল না, তাই তিনি সম্রাটকে প্রথম অনুরোধ করলেন যে দরবারের সময় তাঁকে বসবার অনুমতি দেওয়া হোক এবং সেই সঙ্গে নজর দেওয়ার প্রথাটাও মকুব করা হোক। সম্রাট হেস্টিংসের এই সমস্ত অনুরোধ নামঞ্জুর ক'রে দিলেন এবং হেস্টিংসও তখন এই নিয়ে আর বেশি কিছু বললেন না।

কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা হ্রাসের জন্য ছোটখাট রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য উৎসাহ দিতে লাগল। নিজেকে স্বাধীন রাজা ব'লে ঘোষণা করার জন্য হায়দ্রাবাদের নিজামকে পরামর্শ দেওয়া হলো। নিজাম রাজী হলেন না। তখন অযোধ্যার নবাবকে ধরা হলো। তিনি রাজী হলেন; সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার ক'রে অযোধ্যা স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হলো।

১৮৩৫ সালে কোম্পানী সম্রাটের নাম বাদ দিয়ে নিজের নামে মুদ্রা অঙ্কন করতে সাহসী হলো। দেশের বহু লোক কোম্পানীর এই দুঃসাহসে আহত ও স্তম্ভিত হলো। এবার তারা বুঝলো যে বাণিজ্যের নাম ক'রে বা সম্রাটের প্রতিনিধির ছদ্মবেশে কোম্পানী এতদিনে ভারতবর্ষের এক বিরাট অংশের মালিক হ'য়ে বসেছে। ঐ বছরেই কোম্পানী আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এই সমস্ত ব্যাপার দেখে দেশের লোক কোম্পানীর প্রকৃতির রূপান্তর উপলব্ধি করলো। এই উপলব্ধিতে তাদের মনে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো। বিস্ময় আসন্ন হ'য়ে এলো এবং তার প্রতিক্রিয়া শুধু সাধারণ লোক নয়, সৈন্যদের মনকেও স্পর্শ করলো। তখনকার দিনের জনৈক প্রখ্যাত উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীর লেখা থেকে আমরা উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি। এই রাজকর্মচারী হলেন ফ্রেডারিক জন শোর। তিনি ছিলেন সার জন শোরের পুত্র। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তিনি পুলিশ, রাজস্ব এবং বিচার-বিভাগের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' নামে তখনকার দিনের কলকাতার অন্যতম একটি সংবাদপত্রে তিনি বেনামে ধারাবাহিক বহু প্রবন্ধ লেখেন। পরে ১৮৩৭ সালে সেগুলি একত্র ক'রে 'নোটস অন্ ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জনসাধারণের মনোভাবের যে বর্ণনা শোর দিয়েছেন, তাতে একটি কথাই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। শোর ঘুরে-ফিরে বারবার এই কথাই বলেছেন যে, বাইরে থেকে অবশ্য শান্ত মনে হ'লেও আসলে ভারতবর্ষ সেদিন বারুদের স্তূপ হ'য়ে ছিল, একটুখানি স্ফুলিঙ্গ লাগলেই প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। জনগণের এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষই ১৮৫৭ সালের বিস্ফোরণে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল।

জনসাধারণের এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ দুটি নয়া ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে আরো বেড়ে যায়। সে ব্যবস্থা দুটিকে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের আশু কারণ বলা চলে। প্রথম ব্যবস্থাটির জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (পরে আগ্রা এবং অযোধ্যা নামে অভিহিত) লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নর মিস্টার টমসন দায়ী। প্রথমদিকে কোম্পানী নিজের স্বাভাবিক মিত্র-স্বরূপ একদল জমিদার সৃষ্টি ও প্রতিপালন করতে আগ্রহশীল ছিল। টমসন এ ব্যাপারে ভিন্নমত হলেন। তিনি মনে করলেন, এই অভিজাত ও জমিদারসম্প্রদায় পরে কোম্পানীর পক্ষে বিপদের কারণ হ'তে পারে। তিনি তাই শ্রেণী হিসাবে জমিদারদের বিলোপ ও

রায়তদের সঙ্গে সরকারের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইলেন। তাঁর এই নতুন নীতি প্রবর্তনের ফলে কোম্পানী যে কোনো অজুহাত দেখিয়েই অভিজাত এবং জমিদারদের জমিদারী ও সম্পত্তি কেড়ে নিতে লাগল এবং তাঁদের প্রজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে লাগল।

দ্বিতীয় এবং বোধ হয় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতি। এই নীতি অনুযায়ী ডালহৌসী একের পর এক ভারতীয় রাজ্য ইংরেজ অধিকারভুক্ত ক'রে নিতে লাগলেন। ভারতবর্ষে সে সময় সামন্ততন্ত্রের অবসান আসন্ন হ'য়ে এসেছে। কিন্তু তখনও জনসাধারণ সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সামন্ততন্ত্রে রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ক্ষীণ; ঠিক উপরের জমিদার বা অভিজাতের কাছে প্রজা আনুগত্য স্বীকার করে। দেশভক্তি বা স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় সামন্ততন্ত্রে বড় একটা মেলে না। ভারতের জনসাধারণ যখন দেখলো যে ইংরেজরা একের পর এক রাজ্য দখল ক'রে নিচ্ছে এবং জমিদার ও অভিজাতসম্প্রদায় বিলুপ্ত হ'তে চলেছে, তখন তারা অত্যন্ত মর্মাহত হলো। তারা উপলব্ধি করলো যে এতদিনে কোম্পানী তার আসল রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বনিয়াদ ভাঙবার ব্যবস্থা করছে। ইংরেজের অযোধ্যা অধিকারের ফলে এই অসন্তোষ চরমে উঠল। সত্তর বৎসর ধরে অযোধ্যা কোম্পানীর বিশ্বস্ত মিত্ররাজ্য ছিল। এই সত্তর বৎসরের মধ্যে একবারও অযোধ্যা কোম্পানীর স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করেনি। তবু যখন অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত এবং রাজ্য ইংরেজ শাসনভুক্ত করা হলো, তখন স্বভাবতঃই দেশের লোক ক্ষুব্ধ হলো।

বাংলার সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল অযোধ্যা অঞ্চলের অধিবাসী। তাই কোম্পানীর অযোধ্যাগ্রাসের ফল আরো মারাত্মক হ'য়ে দাঁড়াল। এই সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগতভাবে কোম্পানীর সেবা করেছে এবং তাদের সাহায্যেই কোম্পানী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের অধিকার প্রসার করতে পেরেছিল। এখন তাদের হঠাৎ মনে হলো যে তাদের কর্মনিষ্ঠা এবং ত্যাগের ফলে কোম্পানী যে শক্তি অর্জন করেছিল, সেই শক্তি আজ তাদের নিজের নবাবকেই সিংহাসনচ্যুত করার কাজে ব্যবহৃত হলো। যে বৎসর অযোধ্যা ইংরেজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হলো, সেই ১৮৫৬ সালেই ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং বাংলার সেনাবাহিনীর মধ্যে যে বিশেষভাবে বিদ্রোহের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, এ-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। এই সময় থেকে তারা কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য কৃতসংকল্প হয়। বিদ্রোহের সময় লরেন্স এবং অন্যান্য যে-সব ইংরেজ সাধারণ সিপাহীর মনোভাব জানবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের উক্তি থেকেই এই কথার সমর্থন মেলে। চর্বি-মেশানো টোটা সৈন্যদের মধ্যে নতুন কোনো অসন্তোষের সৃষ্টি করেনি, তাদের অন্তঃশীল পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে মূর্ত ক'রে তুলেছিল মাত্র।

৫

প্রথম প্রথম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় মনোভাবকে যথেষ্ট সমীহ ক'রে চলত। দেশবাসীর আচার-বিশ্বাস বা সংস্কারের প্রতি কখনো কোনো অশ্রদ্ধা দেখায়নি। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রতিও সেদিন কোম্পানীর কর্মচারী উপযুক্ত সম্মান দেখাত। গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের সদস্যরাও, কেবল অভিজাত ব'লে নয়, যে কোনো ভদ্রঘরের ভারতীয়কে

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে আসতেন ও বিদায় দিতেন। কোম্পানীর ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে লাগল। ভারতীয় মনোভাবের প্রতি কোম্পানীর কর্মচারীর শ্রদ্ধাও ক্রমশ কমে আসল। শুধু তাই নয়, ভারতীয়দের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে, সে বিষয় চিন্তা না ক'রেই নতুন নতুন আইন চালু হ'তে লাগল। অবশ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইচ্ছায় অবজ্ঞা বা অবহেলা প্রকাশ ক'রে যে কোম্পানী এইসব আইন প্রণয়ন করেছে, তা নয়। ভারতীয় মনোভাব সম্বন্ধে অজ্ঞতাই বহুক্ষেত্রে এ রকম আইন প্রণয়নের কারণ। বড়লাট এবং তাঁর শাসনপরিষদের সমস্ত সদস্যই তখন ইংরেজ, এবং বস্তুত কোনো ভারতীয় যে পরিষদের সদস্য হ'তে পারেন, এ কথা কোম্পানীর কর্তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। এমন কোনো প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানও ছিল না, যার সাহায্যে তাঁরা দেশের লোকের মনোভাব জানতে পারতেন। এ অবস্থায় জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তা বোঝবার বা জানবার কোনোরকম সুযোগ শাসকবর্গের ছিল না। ফলে, কোম্পানী এবং তার প্রজার মধ্যে ব্যবধান যে ক্রমশ দুস্তর হ'য়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্য কি?

৬

১৮৫৭-র বিভিন্ন বিবরণ পাঠ করলে কতকগুলি সিদ্ধান্ত অনিবার্য হ'য়ে পড়ে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, এই বিদ্রোহ কি শুধুমাত্র জাতীয় জাগরণের ফলে ঘটেছিল? 'জাতীয়তা' কথাটা যদি আধুনিক অর্থে ব্যবহার করি, তবে এ প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর দিতে গিয়ে থামতে হবে। যাঁরা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে দেশ-প্রেমিক ছিলেন এ-কথা সত্য, কিন্তু শুধু দেশপ্রেমের টানে বিদ্রোহ করবেন, তাঁদের দেশভক্তি ততখানি গভীর বা শক্তিশালী ছিল না। চর্বি-মেশানো টোটার কথা এর একটি দৃষ্টান্ত। অন্যভাবেও, সৈন্যদের ধর্মসংস্কারকে আঘাত করবার পরেই তারা বিদেশী প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।

ফোর্ট উইলিয়মের কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে চর্বি-মেশানো টোটা সম্পর্কিত অভিযোগের মূলে সত্য ছিল। কিন্তু ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয়দের ধর্মে হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত অন্যান্য অভিযোগের অনেকগুলিই ভিত্তিহীন। তখন জোর গুজব রটানো হয়েছিল যে হিন্দুবিদ্বেষ থেকেই ইংরেজরা সতীদাহ প্রথা রদ করেছেন। কিন্তু এই ধরনের অভিযোগ অর্থহীন। কেবল ইংরেজ শাসকরা নন, তখনকার দিনে রামমোহন রায় প্রমুখ ভারতীয় বহু মনীষীবৃন্দও এই বর্বর প্রথা রহিত করতে চেয়েছিলেন ব'লেই সতীদাহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। কোনো সভ্য সরকার-ই মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মতো নিষ্ঠুর ব্যাপার সহ্য করতে পারেন না। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে উত্তেজনা এখন আর নেই, সুতরাং সতীদাহ প্রথা নিবারণকে আজ আর কেউ সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম সংগত কারণ ব'লে মনে করবে না।

হিন্দু সৈন্যদের জাত নষ্ট করার জন্য তাদের ময়দার সঙ্গে গরুর হাড় গুঁড়ো ক'রে মিশিয়ে দেবার যে গুজব উঠেছিল, তাও সমান ভিত্তিহীন। সাধারণ বুদ্ধির কোনো লোকই এখন এ-ধরনের অভিযোগ মেনে নেবে না, কিন্তু সেই সময় এই গুজব বহু জায়গায় রটেছিল, এবং সৈন্যদের মধ্যে অনেকে তাই বিশ্বাস ক'রে কোম্পানীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বহু কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। প্রধানত ভারতীয় মনীষীদের আগ্রহ ও অনুরোধেই কোম্পানী এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু দেশের সাধারণ লোক মনে করেছিল যে ইংরেজদের এসব করার উদ্দেশ্য তাদের ধর্ম নষ্ট করা। ইংরেজিনবীশ স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের তারা 'কালা পাদ্রী' ব'লে ডাকত এবং অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখত। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংরেজদের এসব প্রচেষ্টাকে আজ আর কেউ তাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংগত কারণ মনে করবে না।

৭

১৮৫৭ সালের ইতিবৃত্ত যখন পড়ি, তখন দুঃখের সঙ্গে এই কথাই স্বীকার করতে হয় যে এই সময় ভারতবাসীদের জাতীয় চরিত্রের অত্যন্ত অবনতি ঘটেছিল। বিদ্রোহের নেতারা কখনো কোনো ব্যাপারে একমত হ'তে পারেননি। তাঁরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাকাতর ছিলেন এবং প্রায় সব সময়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেন। আভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং গোলমালের ফল যে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরিপন্থী, এ ধারণা তাঁদের ছিল ব'লে মনে হয় না। এই পারস্পরিক ঈর্ষাবোধ এবং ষড়যন্ত্রই ভারতীয় বিপ্লবের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে দিল্লীর সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন বখত খাঁ। তিনি সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন এবং জয়লাভের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর একার চেষ্টায় কি হবে? অন্যান্য সামরিক নেতারা সে সময় তাঁর পরাজয়ের জন্য ষড়যন্ত্র করতেও পিছু-পা হননি। তিনি যখন লড়াই করতে এগিয়ে গেছেন, অন্যান্য সামরিক নেতারা, বলতে গেলে, তাঁকে কোনোরকম সাহায্যই করেননি।

এই একই ধরনের ব্যাপার লক্ষ্ণৌর বেলাতেও ঘটেছিল। লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি যখন ভারতীয় সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হলো, তখন এ-কথাই তাদের মনে হ'তে লাগলো যে রেসিডেন্সি দখল হ'লেই তাদের কাজেরও শেষ হবে। তখন আর অযোধ্যার বেগম বা সরকার তাদের ডাকবে না। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত-ই তাদের কদর ব'লে তারাও কখনো চূড়ান্ত জয়লাভের চেষ্টা করেনি।

অন্যপক্ষে, ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের রানীর প্রতি পরম আনুগত্যে জীবনপণ ক'রে যুদ্ধ করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ইংরেজ জাতীয় সংকট ব'লে গ্রহণ করেছিল এবং সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে লড়াই করেছে।

এ প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলাও প্রয়োজন। বিপ্লবের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে এসেছিল, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরেই, যতদিন নিজের স্বার্থে ঘা পড়েনি, ততদিন তাঁরা প্রায় কেউ-ই ইংরেজের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করেননি। এ-কথার ব্যতিক্রমও অবশ্য মিলবে। যাঁরা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের আহ্বানে যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আহমদউল্লা এবং তাঁতিয়া টোপীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। অধিকাংশ নেতাই কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থকে বড় ক'রে দেখেছেন। এমন কি সংগ্রাম সুরু হবার পরেও নানাসাহেব বলেছিলেন যে ডালহৌসীর সিদ্ধান্ত পালটে যদি নানাসাহেবের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হয়, তবে তখনো তিনি লড়াই বন্ধ ক'রে ইংরেজের সঙ্গে মিটমাট করতে রাজী

আছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে ঝাঁসীর রানীরও অনেক ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল, এবং তাই তিনি যুদ্ধে নামেন, কিন্তু যুদ্ধে নামবার পর তিনি আর দোমনা করেননি। জীবনপণ ক'রে লক্ষ্য সাধনের চেষ্টা করেছেন।

এই যদি বিদ্রোহের নেতাদের মনোভাবের পরিচয় হয়, তবে সাধারণ লোকের মানসিক অবস্থা কি ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই সাধারণ লোকেরা ছিল বিদ্রোহের দর্শকমাত্র। যখন যে পক্ষ শক্তিশালী হয়েছে, তখন তাকেই সমর্থন করেছে। তাঁতিয়া টোপীর দুর্ভাগ্যের করুণ কাহিনী থেকে তাদের এই মনোভাব ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবার পর তিনি স্থির করলেন যে কোনোরকমে নর্মদা পার হ'য়ে মধ্য প্রদেশে পেঁছবেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে একবার মারাঠা অঞ্চলে পেঁছাতে পারলেই লোকেরা তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। প্রায় অতিমানবিক সাহস এবং একাগ্রতায় তিনি তাঁর পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুদের ছলনা ক'রে নর্মদা পার হ'য়েছিলেন, কিন্তু নর্মদার অপর তীরে গিয়ে দেখলেন যে যুদ্ধে সাহায্য তো দূরের কথা, তাঁকে আশ্রয় দেবার মতো একটি গ্রামও সেখানে নেই। সেখানে সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে, সুতরাং তাঁকে আবার পালাতে হলো, বনে-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো। শেষ পর্যন্ত তাঁর এক নিকট বন্ধুই, যখন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন, তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেয়।

৮

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের হত্যাকাণ্ড নৃশংসতা ইত্যাদি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে হয়। ভারতীয় সৈন্য এবং বিদ্রোহের নায়কদের নৃশংসতার কথা ইংরেজ লেখক ও ঐতিহাসিকরা বিশদভাবে ফলাও ক'রে লিখে গেছেন। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নৃশংসতার এ সমস্ত অভিযোগ যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্য এ কথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। দিল্লী, কানপুর এবং লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে ইংরেজ নারী এবং ক্ষেত্রবিশেষে শিশুদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তা সমর্থন করার মতো কোনো যুক্তি নেই। জেনারেল হুইলারকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি ব'লে নানাসাহেবকে হয়তো সম্পূর্ণ দায়ী করা চলে না। তাঁর সৈন্যদের উপর তাঁর নিজেরই তখন কর্তৃত্ব ছিল না, তারাই সমস্ত জিনিসটা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন যে নদীতে শিশুর মৃতদেহ ভাসতে দেখে তিনি আহত ও অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু এ জাতীয় নিষ্ঠুরতার জন্য যারা দায়ী, তারা তাঁরই সেনাদলের অন্তর্গত ছিল। এ কথাও মানতে হবে যে হ্যাভলক ঘটনাস্থলে এসে পেঁছাবার ঠিক আগে ইংরেজ বন্দীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য নানাসাহেব-ই প্রধানত দায়ী। তাঁর সমর্থনে বলা হয় যে এলাহাবাদের ব্রিটিশদের নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ-ই তিনি এই ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিয়েছিলেন। এটা কোনো যুক্তি নয়। একটা অন্যায় দিয়ে আরেকটি অন্যায় সমর্থন করা যায় না। এই অসহায় হতভাগ্য বন্দীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য নানাসাহেবকেই প্রধানত দায়ী করতে হয়।

কিন্তু নিষ্ঠুরতায় ভারতীয়দের চাইতে ইংরেজরাও কোনো অংশে কম যায়নি। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সাধারণত ইংরেজদের কথা চাপা দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিশোধের নামে যে সব অমানুষিক কাণ্ড ঘটেছিল, তাতে তাঁদের মনে যে বিক্ষোভ ও বিরক্তি সৃষ্টি হয়েছিল, সে কথাও অনেকে লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। সীমাহীন নির্মমতার জন্য

হড্‌সন্‌ কুখ্যাত হ'য়ে উঠেছিল। নীল গর্ব ক'রে বলত যে, বিনা বিচারে শত শত ভারতীয়কে ফাঁসি দিয়ে মেরেছে। এলাহাবাদ অঞ্চলে এমন কোনো গাছ ছিল না, যেখানে একজন-না-একজন হতভাগ্য ভারতীয়কে ফাঁসি দিয়ে মারা হয়নি। প্রতিশোধের জন্যই ইংরেজরা এই সমস্ত নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু ভারতীয়রাও তো এই একই কারণে নির্মম হয়েছিল। ভারতীয়দের প্রতিশোধমূলক ব্যবহার ও অনুষ্ঠান যদি ক্ষমার অযোগ্য হয়, তবে ইংরেজদের অনুরূপ আচার-ব্যবহারও কোনো কারণেই সমর্থন পেতে পারে না। মুসলমান অভিজাতদের শূয়োরের চামড়ায় জীবন্ত সেলাই ক'রে জোর ক'রে তাদের শূয়োরের মাংস খাওয়ানো হয়েছে। মৃত্যুভয় দেখিয়ে হিন্দুদের গোমাংস খেতে বাধ্য করা হয়েছে। আহত বন্দীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ইংরেজ সৈন্যরা অসহায় হতভাগ্য গ্রামবাসীদের ধরবার জন্য গ্রামে গ্রামে হানা দিত এবং তাদের উপর এমন অকথ্য অত্যাচার করত যে শেষে মৃত্যুকে বরণ ক'রে তারা শান্তি পেয়েছে। ভারতীয়-ই হোক আর ইংরেজ-ই হোক, এরকম নৃশংস ব্যবহার যারা করেছে, তারা কি ক'রে নিজেদের সভ্য ব'লে দাবি করবে?

৯

১৮৫৭-র ঘটনাজটিল ইতিবৃত্তে দু'টি জিনিস খুব স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয়। প্রথমটি হলো সে সময়কার ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিবিড় ঐক্যবোধ। দ্বিতীয়টি হলো মোগল সম্রাটের প্রতি জনগণের গভীর আনুগত্য।

১৮৫৭ সালের ১০ই মে জনজাগরণ সুরু হয় এবং দু'বছর কাল তা স্থায়ী ছিল। এই দু'বছরে বিবদমান উভয়পক্ষের লোক-ই প্রশংসাযোগ্য ও নিন্দনীয় অনেক কাজই করেছিলেন। উভয়পক্ষের কর্মকৃতির মধ্যে উজ্জ্বল শৌর্যের পাশেই অবিশ্বাস্য নৃশংসতার উদাহরণ বিরল নয়। দেশময় আলোড়ন এবং দ্বন্দ্ববিবাদ সত্ত্বেও কিন্তু এই দীর্ঘ দু'বছরের মধ্যে আমরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতামূলক দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের একটি ঘটনার-ও উল্লেখ পাই না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীই একই দৃষ্টিকোণ থেকে তখনকার সমস্যাকে দেখেছেন এবং একই মানদণ্ডে বিভিন্ন ঘটনার বিচার করেছেন। তখনকার লোকেদের পক্ষে এরকম অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি স্বাভাবিক ছিল, সেজন্য বিদ্রোহের নেতাদের কোনো বিশেষ চেষ্টা করতে হয়নি। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ-নায়কেরা সচেতনভাবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের চেষ্টা করেছিলেন, তারও কোনো ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না। বহু শতাব্দী ধরে একই ধরনের জীবনচর্যার ফলে হিন্দু-মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যের জন্য তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার্থে তাই স্বতন্ত্র কোনো আবেদন জানানোর প্রয়োজন হয়নি। বিপ্লবের যুগে স্বভাবতঃই চারিদিকে উত্তেজনার আবহাওয়া, সেই অশান্তি ও আন্দোলনের সময়েও যে কোথাও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধেনি, তা থেকেই সে যুগে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির কথা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। নিঃসন্দেহে তাই বলা যায় যে ইংরেজ আসবার আগে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ব'লে কোনো সমস্যা ছিল না।

১৮৫৭-র আগে থেকেই ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতি প্রচারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজরাজ স্বয়ং ভারতবর্ষ শাসনের দায়িত্ব নেননি, একথা সত্য, কিন্তু এক-শো বছর আগে পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই ধীরে ধীরে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী ভারতবর্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হ'য়ে উঠেছিল। এই এক-শো বছর ধরে ইংরেজ কর্মচারীরা অনেক সময়েই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যের উপর-ই বেশি জোর দিয়েছে। কোম্পানীর পরিচালকবর্গের শাসনসংক্রান্ত কাগজপত্রের মধ্যেও বারবার বলা হয়েছে যে হিন্দু এবং মুসলমানকে তফাৎ ক'রে দেখতে হবে। মুসলমানেরা ইংরেজ রাজত্বকে স্বীকার করেনি, তাই কোনো ব্যাপারেই তাদের উপর নির্ভর করা চলবে না, এই ছিল কোম্পানীর ধারণা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের উপর জোর দিতে চেয়েছিল, টডের 'রাজপুত কাহিনী' বা 'অ্যানালস অব রাজস্থান' এবং এলিয়টের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বা 'হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া'র ভূমিকায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। এঁরা দু'জনেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। যে সব হিন্দু ঐতিহাসিক মুসলমান রাজাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ক'রে গেছেন, এঁরা দু'জনেই তাঁদের অবজ্ঞা বা নিন্দা করতে কসুর করেননি। একজন হিন্দু ঐতিহাসিক কি ক'রে মুসলমান রাজার বিচারবোধ ও ন্যায়-পরায়ণতার প্রশংসা করতে পারে, তা ভেবেও তাঁরা আশ্চর্য হয়েছেন।

হিন্দু মুসলমানের প্রীতির সম্পর্ক বিষাক্ত করতে পারার মতো ক্ষমতার অভাব টডের কলমের ছিল না। মধ্যযুগের ইতিহাস তাঁর কলমে কী আশ্চর্যভাবে বিকৃত হয়েছে, তার পরিচয় তাঁর 'অ্যানালসে'র প্রতি পাতায় মিলবে। যেখানেই কোনো ঘটনার বিষয়ে দু'রকমের মত বা কিংবদন্তী রয়েছে, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক মলিন করার পক্ষে যেটি প্রশস্ত, সেটিকেই টড স্বীকার ও প্রচার করেছেন। ১৮৫৭-র ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ নষ্ট করতে তখনো তারা কৃতকার্য হয়নি। একই সুখদুঃখের অংশীদার হওয়াতে বা একই ধরনের জীবনচর্যার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে সৌভ্রাত্র গড়ে উঠেছিল, সেই ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সহানুভূতিই ইংরেজদের শতবর্ষব্যাপী ভেদনীতি প্রচারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছিল। এই কারণেই ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক চরিত্র না নিয়ে জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় রূপ গ্রহণ করেছিল। হিন্দু এবং মুসলমান এই বিদ্রোহে কাঁধে কাঁধ এবং হাতে হাত মিলিয়ে একই ভূমির উপর দাঁড়িয়ে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল, মাতৃভূমি থেকে বিদেশী শত্রুর উচ্ছেদ।

কেবল সৈন্যদের মধ্যে নয়, দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যেও তখন এই ঐক্যবোধ জাগ্রত ছিল। ইংরেজ কর্মচারীরা সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের উপর জোর দিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একবারও কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটেনি।

ভারতের হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে ১৮৫৭-র মহাপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে বিপ্লবের উত্তেজনার মধ্যেও যখন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দেখা দেয়নি, তখন বিপ্লব অবসানের কয়েক দশকের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি ভারতের জাতীয়তার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াল কেন? এটা নিদারুণ দুঃখের কথা যে, ১৮৫৭-র পর থেকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দিন-দিন এমন গুরুতর হ'য়ে উঠল যে শেষে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগ ক'রে সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হলো।

১৮৫৭ সালের পরবর্তী ইংরেজ শাসননীতির মধ্যেই এ মর্মান্তিক পরিণতির কারণ খুঁজতে হবে। বিপ্লবের সময় হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল। ইংরেজ

বুঝল যে ভারতবর্ষে রাজত্ব কায়েম করতে হ'লে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজদের শাসনসংক্রান্ত সমসাময়িক কাগজপত্র দেখলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তাদের এই মনোভাবের পরিচয় বিদ্রোহ-উত্তর যুগে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের মধ্যেও পাওয়া যায়। সেনাবাহিনীতে সামরিক এবং বে-সামরিক জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হলো, সাম্প্রদায়িক এবং আঞ্চলিক প্রতিরোধ-প্রতিসাম্যের (চেকস্ এণ্ড ব্যালান্সেস) ভিত্তিতে সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত হলো। এক কথায় এমন ব্যবস্থা করা হলো যে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন যেন হিন্দু এবং মুসলমান একসঙ্গে সমবেতভাবে যুদ্ধ করতে না পারে। জনসাধারণের জন্য এমন শাসননীতি প্রবর্তিত হলো, যার ফলে ক্রমশ হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সুরু করলো। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করার যখন যে সুযোগ এসেছে, ইংরেজরা তার পুরো সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনি। সৈন্যবাহিনীর সংগঠনে এই সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কিভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল, লর্ড রবার্টসের আত্মজীবনীতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১০

সিপাহী বিপ্লবের যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে ভাবে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে দিল্লীর দিকে ঝুঁকেছিল, বাহাদুর শাহের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল, তাও সমান উল্লেখযোগ্য। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই স্বীকার করেছিল যে ভারতের সম্রাট হবার অধিকার একমাত্র বাহাদুর শাহের-ই আছে। এ প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে প্রথমদিকে বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশ-ই ছিল হিন্দু। ১০-ই মে যখন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, তখন তাদের মুখে একমাত্র ধ্বনি : দিল্লী চলো। নিজেদের মধ্যে বিতর্ক-বিচার বা আলোচনা ক'রে তারা যে এই আওয়াজ তুলেছিল, তা নয়। সাধারণ সৈন্যের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক আবেগ থেকেই এই আওয়াজ উৎসারিত হয়েছিল। যখন-ই কোনো সেনাবাসে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে, তখন-ই সৈন্যরা এই একই আওয়াজ তুলে হাতিয়ার গ্রহণ করেছে। যেখানে সৈন্যরা দিল্লী পৌঁছাতে পারেনি, সেখানেও তারা সমস্বরে দিল্লীর মোগল সম্রাটের আনুগত্য ঘোষণা করেছে।

নানাসাহেব কানপুরের বিরুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নিজেকে তিনি পেশোয়া বলে ঘোষণাও করেছিলেন। মারাঠা এবং মোগলদের সংঘর্ষের পুরোনো কাহিনী কিন্তু বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে গেল। নানাসাহেব নিজেকে মোগল সম্রাটের সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করতে এক মুহূর্তও ইতঃস্তত করেননি। দিল্লীর সম্রাট-ই দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা, মুক্তকণ্ঠে তিনি একথা বলেছিলেন। সম্রাটের নামেই তিনি মুদ্রা উৎকীর্ণ এবং সমস্ত আদেশ-ফর্মান জারী করতেন। নানাসাহেবের এই সমস্ত আদেশের কিছু কিছু হায়দ্রাবাদের দপ্তরাবেজখানায় সংরক্ষিত আছে। তাদের প্রত্যেকটিই দিল্লীর সম্রাটের নামে উৎকীর্ণ। মোগল দরবারের প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী এই আদেশগুলিতেও প্রথমে হিজরী এবং তারপর সংবতের উল্লেখ রয়েছে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহ্ কেবল নামকে-ওয়াস্তে বাদশাহ ছিলেন। দিল্লী দুর্গের বাইরে তাঁর হুকুম চলত না। এমন কি খাস দিল্লী শহরেও তাঁর পুরোপুরি প্রভুত্ব ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়া মাসিক এক লক্ষ টাকা

বরাদ্দের উপর তিনি জীবনধারণ করছিলেন। শুধু তিনি নন, তাঁর ঠিক আগের পূর্ব-পুরুষরাও কেবলমাত্র নামেই সম্রাট ছিলেন। সৈন্যবল বা অর্থবল, বাহাদুর শাহের কোনোটিই ছিল না। তাঁর পক্ষে বলার মতো একমাত্র জিনিস ছিল যে, তিনি আকবর এবং শাহজাহানের বংশধর। ব্যক্তি বাহাদুর শাহের জন্য নয়, শ্রুতকীর্তি মোগল সম্রাটদের বংশধর বাহাদুর শাহের জন্যই সেদিন ভারতবাসীদের আনুগত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল। ভারতীয় মনের উপর মোগল দরবারের প্রভাব যে কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী, এই একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। আন্দোলনের সময় যখন প্রশ্ন উঠল ব্রিটিশদের কাছ থেকে হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার ক'রে কে তা পুনর্গ্রহণ করবেন, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তখন বাহাদুর শাহ্‌কেই নির্বাচিত করলো। বাবর যে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপন করেন, আকবর কায়েমীভাবে ভারতবর্ষের হৃদয়ে তার স্থান পাকা ক'রে দেন। সেই সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য যে ভারতীয় চিত্তে কতখানি দৃঢ়মূল হয়েছিল, বাহাদুর শাহের প্রতি ভারতীয় জনগণের মনোভাব থেকেই তা বোঝা যায়। মোগল সম্রাটকে যে ভারতবাসী বিদেশী শাসক বলে মনে করেনি, নিজেদের সম্রাট বলে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা যে রাজশক্তির প্রতীক হবার যোগ্যতাও বাহাদুর শাহের ছিল না। সৈন্য অথবা অভিজাতবর্গ কাউকেই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত এত ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও কিন্তু সিংহাসনের অধিকারী হিসাবে স্থিতীয় কোনো লোকের কথা কেউ ভাবেনি, ভাবতে পারেনি। শেষ দিন পর্যন্তও সৈন্যদল এবং জনসাধারণ বাহাদুর শাহকেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ব'লে মনে করেছে। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজরা যখন দিল্লী পুনরধিকার করলো বখত খাঁ বাহাদুর শাহকে শহরের বাইরে সৈন্য সমাবেশ করতে অনুরোধ করলেন। সম্রাটকে তিনি বোঝালেন যে, হতাশ হবার কারণ এখনও আসেনি; রোহিলখণ্ড এবং অযোধ্যা এখনও বিদ্রোহীদের করতলগত। বাহাদুর শাহ্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অক্ষমতার পরিচয় দিলেন; একবারও অস্ত্রহাতে দাঁড়াতে চাইলেন না। তা ছাড়া, এসময় ইংরেজরা ইলাহি বক্‌স্ নামে একজন বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য পেয়েছিলেন। ইলাহি বক্‌সের পরামর্শে বাহাদুর শাহ্ দিল্লীতেই রয়ে গেলেন। ফলে শেষে ইংরেজদের হাতে তিনি বন্দী হলেন। সেই সঙ্গে সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত জাতীয় সংগ্রামেরও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

শত বর্ষ আগে

অন্নদাশঙ্কর রায়

পলাশীর শত বর্ষ পরে ভারতের দিকে দিকে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে আরো একশো বছর পরে আমরা তার স্মৃতি পালন করছি। আমাদের রাজনীতিকরা ধরে নিয়েছেন যে সেটা ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সমর, কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকরা সকলে একমত নন। তাঁদের কারো কারো প্রতিবাদ শুনে মনে হয় স্বাধীনতা সমর কথাটা অতিবাদ।

তা হলে ওটা কী? মিউটিনি? মিউটিনি তো স্থলসৈন্য বা জলসৈন্যরা করে বলে জানি। দিল্লীর বাদশা, ঝাঁসীর রানী, নানাসাহেব, কুঁওর সিং—এঁরা কোন দুঃখে মিউটিনি করবেন? তবে কি ওটা বিদ্রোহ? বিদ্রোহ তো রাজাদের বিরুদ্ধে প্রজারা করে, প্রভুদের বিরুদ্ধে ভৃত্যরা করে। দিল্লীশ্বর কি কারো প্রজা ছিলেন? কার প্রজা? ইংলণ্ডেশ্বরের বা ইংলণ্ডেশ্বরীর? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর? গভর্নর জেনারেলের? সিপাহীরাও কি এঁদের কারো প্রজা ছিল? হিন্দুস্থানের জনসাধারণও কি ছিল এঁদের কারো প্রজা?

এসব প্রশ্নের উত্তর এই যে, দিল্লীশ্বর ছিলেন হিন্দুস্থানের আইন-অনুসারে রাজা। রাজার কাছে দেওয়ানী নিয়ে এক বিদেশী সওদাগরী প্রতিষ্ঠান কার্যত রাজার কাজ করছিল। সেই প্রতিষ্ঠানেরই এক কর্মচারী গবর্নর জেনারেল। কোম্পানী ও তার বিদেশী কর্মচারীরা ছিল ব্রিটিশ সাবজেক্ট বা ব্রিটিশ রাজের প্রজা। আর কোম্পানীর দেশী কর্মচারীরা ছিল হিন্দুস্থানের বাদশার প্রজা। সিপাহীরাও যে ব্রিটিশ সাবজেক্ট ছিল তা নয়। ইংলণ্ডেশ্বর বা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি তাদের লয়ালটি থাকার কথা ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা ও ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য এক জিনিস নয়। প্রভুভক্তি ও রাজভক্তি দুই স্বতন্ত্র ভক্তি। গুর্খারা ইংরেজের চাকরি করে। তারা প্রভুভক্ত, কিন্তু তাদের রাজভক্তির পাত্র ব্রিটিশ রাজ নন, নেপাল রাজ। নেপালের সঙ্গে ব্রিটিশের দ্বন্দ্ব বাধলে তারা নেপালের দিকে ঝুঁকবে।

সিপাহীরা যদি জানত যে তারা ব্রিটিশ রাজের প্রজা তা হলে তারা রাজদ্রোহী হতো কি না সন্দেহ। তাদের জ্ঞানত তারা রাজদ্রোহী হয়নি। হয়েছে প্রভুদ্রোহী। তাও অনেক দিন সহ্য করার পর। আর তাদের এই প্রভুদ্রোহ ছিল তাদের প্রকৃত রাজা ও রাজন্যদেরকে বিদেশী দেওয়ান প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে উদ্ধার করার আশায়। যে প্রভু সে রাজা নয়। যে রাজা সে প্রভু নয়। এই যে anomaly সিপাহীরা চেয়েছিল এর একটা হেস্তনেস্ত। তাদের বিচারে হেস্তনেস্তটা হবে প্রভুকে রাজা না করে রাজাকে প্রভু করে। তাদের চ্যালেঞ্জের ফলে একটা হেস্তনেস্ত হলো বইকি। প্রভু রাজা হলো না, রাজা প্রভু হলো না, প্রভুত্ব গেল, রাজত্ব গেল, মুঘল বাদশা বাহাদুর শা'র স্থলে ভারতের সিংহাসনে বসলেন ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া। দেশশুদ্ধ লোক হয়ে গেল ব্রিটিশ সাবজেক্ট। "প্রথম স্বাধীনতা সমরে"র পরিণাম হলো প্রথম পরাধীনতা।

খুব অদ্ভুত! না? রানী ভিক্টোরিয়া যখন আমাদের মহারানী ছিলেন না তখন আমরা তাঁর প্রজা ছিলুম না। আমরা যে তাঁর দেশের একটি বণিক প্রতিষ্ঠানের প্রজা ছিলুম তাও নয়। কিংবা ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী গবর্নর-জেনারেলের প্রজা ছিলুম তাও নয়। প্রজা

ছিলুম আমরা হিন্দুস্থানের বাদশার। যারা বাদশাকে অস্বীকার করেছিল তারা ছিল কার প্রজা জানিনে, কারণ তত দিনে পঞ্জাব ও মরাঠা রাজ্যগুলি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন হয়েছে। সেটাও একটা anomaly. বাদশাকে যারা মানে না, কাকে যে তারা রাজা বলে মানবে তাও বোঝা দায়। ব্রিটিশ রাজকে নয় নিশ্চয়ই। এই anomaly'র হেস্তনেস্ত হলো মুঘল মরাঠা শিখ রাজপুত রাজা বাদশাকে রাজভক্তির পাত্র না করে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে রাজভক্তির একমাত্র আধার করে। ইনি ইংলণ্ডের রানী। সেইসূত্রে ইংলণ্ড আমাদের রাজার দেশ। আর ভারতবর্ষ ও দেশের রাজার সাম্রাজ্য। আইন-অনুসারে আমরা সম্রাজ্ঞীর প্রজা হলুম। আমাদের দেশ হলো পরাধীন।

তার আগে যে পরাধীনতা সেটা কার্যত পরাধীনতা হলেও আইনত নয়। ভারতেশ্বর বলতে একজনকেই বোঝাত। তিনি দিল্লীর বাদশা। কেউ তাঁকে অস্বীকার করেনি, সিংহাসনচ্যুতও করেনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও না, ইংলণ্ডের রাজাও না। তাঁকে তাঁর স্বস্থানে রেখে তাঁর ক্ষমতা হস্তগত করার নাম রাজার রাজত্ব কেড়ে নেওয়া নয়। নেপালের সেনাপতি রাজার ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন। তা বলে রাণা বংশ রাজ বংশ হয়ে যায়নি। প্রজারা রাজার প্রজা না হয়ে রাণার প্রজা হয়ে যায়নি। পরে একদিন রাণাবংশকে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন রাজাই আবার রাজ ক্ষমতা ফিরে পেলেন। সেইরকম একটা ব্যাপার ঘটত ১৮৫৭এর বিক্ষোভ সফল হলে। বাদশাই রাজক্ষমতা ফিরে পেতেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মরাঠা রাজারা।

সে বিক্ষোভ যে সফল হলো না এর একটা বড় কারণ সেটা নেপালের মতো গণবিক্ষোভ বা প্রজাবিক্ষোভ নয়। সেটা নিতান্তই একটা প্রভুভৃত্যের ব্যাপার হিসাবে শুরু হলো। তার পরে পর্যবসিত হলো রাজা রাজড়াদের লুপ্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টায়। সে চেষ্টা বিদেশীর বিপক্ষে বলে যে স্বদেশীয়দের স্বপক্ষে এ ধারণা সাধারণের ছিল না। কারণ রাজারা ক্ষমতা ফিরে পেলে প্রজারা যে সে ক্ষমতার শরিক হবে এ রকম কোনো অঙ্গীকার বা আশ্বাস কেউ তাদের দেয়নি। নেপালে সেটা ধরে নেওয়া হয়েছিল। সেটা ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাই প্রোডাক্ট।

জনগণের লাভবান হবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা অত্যধিক। কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক হাতে শোষণ করলেও অন্য হাতে শাসন যা করছিল তা অপেক্ষাকৃত সুশাসন। ভারতের লোক হাজার হাজার বছর পরে সেই প্রথম "rule of law" কাকে বলে তার স্বাদ পায়। ভারতের ইতিহাসে বহু সদাশয় রাজা প্রজারঞ্জন করেছেন, কিন্তু তার ফলে খেয়ালখুশির শাসন গিয়ে আইনের শাসন প্রবর্তিত হয়নি। প্রজাদের পঞ্চায়তরা হয়তো সুবিচার করেছে, কিন্তু অবিচার করলে তার উপর কোনো আপীল ছিল না। ভারতের জনসাধারণ শুনে অবাক হলো যে ক্লাইভকেও সামান্য কয়েক লাখ টাকার জন্য জবাবদিহি করতে হচ্ছে, অথচ কোটি কোটি টাকার জন্য কেউ কোনো দিন স্বদেশীয় শাসকদের কাছে জবাবদিহি চায়নি বা চাইতে সাহস করেনি। আরো অবাক হলো যখন শুনল ওয়ারেন হেস্টিংসকে পার্লামেণ্টের সভারা impeach করছেন। তা হলে সর্বশক্তিমান নন ভারত-ভাগ্যবিধাতা গবর্নর জেনারেল। পরে যখন খবর পেলো যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা ইংলণ্ডেশ্বরও সর্বশক্তিমান নন, তিনিও পার্লামেণ্টের দাপটে একবার মুণ্ড হারিয়েছিলেন ও তাঁর সিংহাসনে প্রজানায়ক ক্রমওয়েল বসেছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারীরা পরবর্তী কালে "constitutional monarch" হয়ে প্রজার ইচ্ছায় রাজ্য চালান—তখন তাদের বিস্ময়

চরমে ঠেকল। তারা "ধন্য ধন্য" করল। এমন নিয়মের রাজত্ব যে দেশে সে দেশের কাছে আবেদন নিবেদন করলে সুবিচার পাওয়া যাবেই এ বিশ্বাস দীর্ঘ এক শত বর্ষ ধরে দৃঢ়মূল হয়েছিল, তাই সিপাহীরা কেন সুবিচারের জন্যে পার্লামেণ্টের স্থাবস্থ না হয়ে তরবারির সাহায্য নিয়েছিল সাধারণ লোক তা বুঝতে পারেনি। আর পার্লামেণ্ট না থাকলে রাজা বাদশাদের হাতে ক্ষমতা ফিরে আসার পর কার কাছে তাঁদের অবিচারের বিরুদ্ধে দরবার করবে তাও বুঝে উঠতে পারেনি তারা।

নিয়মের রাজত্বে যাদের বাস তারা যে নিতান্ত নিরাশ ও মোহমুক্ত না হলে অরাজকতা ডেকে আনবে না এটা সিপাহীদের বা তাদের পিছনে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের খেয়াল ছিল না। তা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নৌবলে বলবান ব্রিটিশ রাজশক্তি পিছনে থাকতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে লড়ে জিতবে কে? লোকে এ প্রশ্নের উত্তর পায়নি বা পেলেও বিশ্বাস করেনি। একটু আগেই তো ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার সর্বশক্তিমান জার পর্যন্ত হেরে গেলেন। কোম্পানীর পিছনে ছিল সেকালের দুনিয়ার-সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য। যে ঘোড়া হারবেই তাকে বাজী ধরবে কে?

শুধু "military sanctions" নয়, "moral sanctions" ছিল বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে। তারা ধর্মে নিরপেক্ষ তো ছিলই, তাদের হাতে লোকের ধন প্রাণ ও ইজ্জৎ নিরাপদ ছিল। পলাশীর একশো বছরের মধ্যে ইংরেজরা সবশুদ্ধ ক'জন ভারতীয় বধ করেছিল? বড় জোর বিশ হাজার। তাও যুদ্ধকালে বা আদালতের বিচারে। মানুষ মেরে আইনের আমলে আসেনি, আইনের ঊর্ধ্বে রয়েছে, এমন একজনও ইংরেজ ছিল না। তেমনি নারীনিগ্রহ করলে ইংরেজেরও বিচার ছিল, দণ্ড ছিল। জাতির নামে যাতে কলঙ্ক না লাগে তার জন্যে গোরা সিপাহীদেরও সামরিক আদালতে পাঠানো হতো, খুব কম সাজা হলেও দেশান্তরিত করা হতো। একটা না একটা প্রতিকার এখানে না হোক বিলেতে পাওয়া যাবেই, এ বিশ্বাস যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর ছিল। অন্যায়কে রাজপুরুষরা প্রশ্রয় দেবেন না, সমর্থন করবেন না, রাজপুরুষরা অন্ধ হলেও রাজা স্বয়ং অন্ধ হবেন না, দুর্যোধনের দুষ্কর্মে ধৃতরাষ্ট্রের মতো সহায় হবেন না, এ বিশ্বাস শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের অন্তরে অবিচল ছিল। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের আগে দু'চার জনের বিশ্বাস হয়তো টলেছিল, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস টলেনি। "Moral sanctions" অদৃশ্য হতে আরম্ভ করল তখন থেকেই।

সিপাহী বিক্ষোভে ইংরেজরা কম অত্যাচার করেনি, কিন্তু সেটা যুদ্ধকালে ঘাত প্রতি-ঘাতের সামিল। সেটা প্রতিশোধ বলে গণ্য হবার যোগ্য। তার জন্যে তারাও পরে লজ্জিত হয়েছিল। তাদের অনুতাপ হতে এলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার অপসারণ, সেকালের শাসক সম্প্রদায়ের পরিবর্তে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রবর্তন, ইণ্ডিয়ান আর্মির রদবদল, রাজাদের উপর খোদকারী বন্ধ। অপর পক্ষে সমাজসংস্কার কার্যে সরকারের উৎসাহ রইল না, রক্ষণশীলদের তোয়াজ করাই হলো শাসকদের আত্মরক্ষার উপায়। ক্রমে ক্রমে এলো ভেদনীতি (divide and rule)। ইংরেজ শাসনের প্রকৃতি বদলে গেল।

মহারানী ভিক্টোরিয়া বাহাদুর শা'কে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের লোক রাতারাতি ব্রিটিশ সাবজেক্ট বনে যায়। পরাধীনতার এই জাজ্বল্যমান উপলব্ধি থেকে এলো ভারতীয় জাতীয়তার চেতনা। এর থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। স্বাধীনতার বাসনা জাগল। বাসনা থেকে এলো সংগ্রাম। সংগ্রাম থেকে এলো স্বাধীনতা।

প্রথম স্বাধীনতা সমর ১৮৫৭ সালে ঘটেনি, কেননা তৎপূর্বে পরাধীনতাই আইনসম্মত হয়নি, পরাধীনতাবোধই উপজাত হয়নি, স্বাধীনতার বাসনাই জাগরিত হয়নি। ১৮৫৭ সালে যা ঘটেছিল তাকে যদি মিউটিনি বা বিদ্রোহ বলতে আপত্তি থাকে তবে বলব বিক্ষোভ বা সংঘর্ষ বা যুদ্ধ। "সিপাহীযুদ্ধ" কথাটা অপ্রযুক্ত নয়।

সেটার হেতু নিশ্চয়ই ছিল। সেটা অগৌরবেরও নয়। তার স্মৃতি পালন করাও সঙ্গত। যে যুদ্ধ সফল হলে স্মরণীয় হতো তা বিফল হয়েছে বলে বিস্মরণীয় নয়। কিন্তু তাকে স্বাধীনতা সমর বলা সত্যের অপলাপ। সুতরাং প্রথম স্বাধীনতা সমর বলা অযথা। তা যদি স্বাধীনতা সমর হয়ে থাকে তবে মুঘল ও মরাঠা রাজশক্তির শেষ স্বাধীনতা সমর। বাহাদুর শা'র সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান বাহাদুরেও পদচ্যুত হলেন। সুতরাং ওটা কোম্পানী বাহাদুরেরও শেষ স্বাধীনতা সমর।

কবিতা

ট্রেনের জানলা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

উড়ো হরিয়াল-ঝাঁক বাবলা-বন সবুজ বিদ্যুতে
ছুঁয়ে গেল। দুদিনের গলদ্ঘর্ম ট্রেনের ধকল
উসুল হয়নি তাতে। তবু যেন দুরন্ত দুপুর
একটি চোরাই সুখে নীলপদ্মে করে টলমল।

সব-ই জানলার দেখা। তাই দিয়ে সব চাওয়া পাওয়া,—
জীবিকা, জনন, জপ। জানলার ধারে দিন গোনা।
আরো যদি বাতায়ন থাকে, খোঁজা বুঝি পণ্ডশ্রম।
এক জানলার-ই মাপে গড়া চোখ কান ও চেতনা।

তবু বেগ দিয়ে যদি হতে পারি কখনো বিবাগী,
অচলেরা চমকায়। বহুদূর চক্রবালে স্থির
ধ্রুব পাহাড়েরা নড়ে। ট্রেনের কামরায় চোখেচোখি,—
মানে নেই, নেই পরিণাম, তবু মুহূর্ত মদির।

পাথুরে প্রান্তরে, নয় ফসলের ক্ষেত আগলানো,
কিম্বা কারখানার সাক্ষী, যার যার নিজের স্টেশন।
চেনা রাস্তা, চেনা বাড়ি, ঘড়ি ঠিক, কিছু ভুল চুক।
কখনো ঝলকে শুধু আচমকা অন্য অন্বেষণ।

সনেট

বিষ্ণু দে

নিঃসঙ্গতা ভাসে নির্নিমেষ,
নীল ঘুমে তার স্বয়ম্বর,
সমুদ্রের নিস্তব্ধ প্রহর
নিস্তরঙ্গ, নাকি এ আবেশে
অন্তরঙ্গে নিঃসঙ্গতা মেশে?

মনে শুধু ঘনিষ্ঠ আখর
জপ করে যায় মৌনস্বর
শূন্যের শীতল বুক ঘেঁষে
সাধনা কি শ্বেতের উদ্দেশে?

অন্ধকারে ডুবেছে ফস্ফর,
অগোচর সজল শিখর।
রুদ্ধশ্বাস কে টানে আশ্লেষে
স্বেদ ঘন শিলার নিষ্পেষে?

মৃত্যু খোঁজে প্রেমে রূপান্তর॥

আমেরিকার চিঠি

হুমায়ুন কবির

নানা দেশের নানা জাতির নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে এক ধাঁচে ফেলে যে ভাবে আধুনিক কালের আমেরিকান গড়ে উঠেছে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বোধ হয় এক ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে মানুষের এত পাঁচমিশেলী পরিচয় মিলবে না। এ দেশে আর্য-অনার্য-মঙ্গোল-দ্রাবিড় বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ তো ঘটেছেই, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে ধর্ম, দর্শন ও চিন্তার অপরূপ বৈচিত্র্য। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতবাসীর চরিত্র ও জীবনদর্শনে এক নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয় মেলে। বস্তুতপক্ষে ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় আমেরিকার মতন এত বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সমন্বয়ের এমন পরিচয় মিলবে না।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা দুই দেশেই মেলে, কিন্তু এ সমন্বয়ের প্রকৃতি দুই দেশে পৃথক। ইতিহাসই বোধ হয় প্রধানত তার জন্য দায়ী। ভৌগোলিক সংস্থানে দুই দেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। নানা রকমের আবহাওয়া দুই দেশেই মিলবে। তবে আমেরিকায় বোধ হয় ঋতুর চক্রাবর্তন আরো বেশি সুস্পষ্ট। হিমালয় পাহাড়ের জন্য উত্তর এশিয়ার তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা হাওয়া ভারতবর্ষে পৌঁছয় না, কয়েকমাসের জন্য উত্তর ভারতে শীতের পরিচয় মিললেও ভারতবর্ষকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলাই সঙ্গত। আমেরিকায় বহু সহর গ্রাম গ্রীষ্মকালে হয়তো ভারতবর্ষের মতোই গরম। কিন্তু শীতকালে আমেরিকার প্রায় সকল অঞ্চলেই বরফ পড়ে। আমেরিকাকে তাই শীতপ্রধান দেশ বললে অন্যায় হবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ ও আমেরিকার জীবনদর্শনের পার্থক্যের জন্য আবহাওয়া যতখানি দায়ী, দুই দেশের ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে দায়ী।

ভারতবর্ষে যে সভ্যতার সমন্বয়, তা হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে। কবে কোন আদিম যুগে এ দেশে দ্রাবিড় এসেছিল, তার হিসাবও ইতিহাস ভুলে গিয়েছে। পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বেও এদেশে সভ্যতার যে বিকাশ তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তখন থেকে যুগের পরে যুগে নানা জাতি সভ্যতার নানা স্তরে নানা অবদান এদেশে এনেছে, এবং তাদের দীর্ঘকালব্যাপী আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে আজকালকার ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় সভ্যতায় বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের দানকে পৃথক ক'রে দেখাও কঠিন। শুধু তাই নয়, এই দীর্ঘকালব্যাপী সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে অবলুপ্ত। এখানে-ওখানে আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য হয়তো এখনো অব্যাহত, পরবর্তীকালে আগত বিদেশী অভিযাত্রীও কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে ও করে, কিন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণের বিপুল অংশ এমন ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে যে বর্তমানে তাদের মধ্যে জাতি বা বর্ণের বিশুদ্ধতার সন্ধান ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। তার খুব একটা মোটা উদাহরণ দিলেই চলবে। এককালে জাতিভেদ হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ সে বর্ণবৈষম্য একেবারে লুপ্ত। ঘনকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বা উজ্জ্বল-শ্যাম শূদ্রের পরিচয় দেদার মেলে ও মিলবে। বস্তুতপক্ষে একই পরিবারে

ভাই-বোনদের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাস ও সংগঠনের বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে স্বাধীন ভারতবর্ষে আইন ক'রে অস্পৃশ্যতা দূর করলেও আজও এদেশে জাতিভেদের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বর্ণবৈষম্যের সমাধান ভারতবর্ষ বহুদিন পূর্বেই বহুল পরিমাণে সম্পন্ন করেছে।

তিন-চার হাজার বছরের সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে ভারতবর্ষে যা সম্ভব হয়েছে, আমেরিকায় তিনশো বছরের ইতিহাসে তা যে পুরোপুরি সম্ভব হয়নি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বরং যে পরিমাণ সমন্বয় আমেরিকায় ঘটেছে তাই বিস্ময়কর। এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে যে সমস্ত অভিযাত্রী এসেছে তারা সবাই দলবেঁধে এক সঙ্গে আসেনি। সাধারণত এক এক দল অভিযাত্রী আসবার পরে দু-চারশো বছরের মধ্যে আর নতুন অভিযাত্রীর দল দেখা দেয়নি। ফলে প্রথমাগত অভিযাত্রীর দল এ-দেশের জনসমুদ্রে মিশে যাবার সুযোগ পেয়েছে। পরে যারা এসেছে, তাদের বেলায়ও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আমেরিকার ইতিহাসে তা ঘটেনি। প্রায় তিনশো সাড়ে-তিনশো বছর আগে ইউরোপীয় অভিযাত্রীর আগমন সুরু হ'লেও বস্তুতপক্ষে বিগত একশো বছরেই আমেরিকার জনসাধারণের বিপুল অংশ সে দেশে পৌঁছেছে। বছরের পর বছর নতুন অভিযাত্রীর দল নতুন নতুন দেশ থেকে এসেছে। ইংরেজি ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রথমে বেশী ছিল, এবং ইংরেজি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার ক'রে বসেছিল ব'লে ভাষা-বিভ্রাট ঘটেনি, কিন্তু একমাত্র ভাষার ঐক্যকে বাদ দিলে জীবনের প্রায় অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেই আমেরিকায় যে বিরাট বৈচিত্র্য, আমেরিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাসই তার জন্য প্রধানত দায়ী। এত বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও আমেরিকায় একটি মহাজাতি গড়ে উঠেছে, যে কোন দেশে আমেরিকানের সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে আমেরিকান ব'লে চেনা যায়। এ বিস্ময়কর পরিণতির জন্য আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী যে কিভাবে দায়ী, সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে বহু জাতি ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছে ব'লে আমেরিকায় যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তা গভীরভাবে জাতির জীবনে দানা বাঁধেনি। পূর্বেও বলেছি যে আমেরিকার মানুষ নিত্য নূতনের পূজারী। পুরাতন ঐতিহ্য ও সভ্যতাকে যারা পুরোপুরি স্বীকার করতে পারেনি, বহু ক্ষেত্রে তারাই অভিযাত্রী হ'য়ে আমেরিকায় এসেছে। নানা দেশের মানুষের মেলামেশার ফলে কোন দেশের ঐতিহ্যই ধ্রুপদী ব'লে স্বীকৃত হয়নি, তার ফলেও তারা নূতনকে সহজে গ্রহণ করেছে। বস্তু-সভ্যতার যে বিস্ময়কর বিকাশ আমেরিকায় দেখা দিয়েছে, ধ্রুপদীকে অস্বীকার এবং নূতনকে সাগ্রহে গ্রহণ তার অন্যতম কারণ।

জাতির সভ্যতা ও ঐতিহ্য তেমনভাবে দানা বাঁধেনি ব'লে আমেরিকার সমাজ-জীবনে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সমাজ ও পরিবার বন্ধন সমস্ত পৃথিবীতেই আজকাল পূর্বের তুলনায় খানিকটা শিথিল—এ শিথিলতা আমেরিকায় যত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে, অন্যত্র বোধ হয় তার নজির মিলবে না। সিনেমা বা সস্তা সাহিত্যে যে সব বিবরণ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু তবু এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমেরিকার সমাজ-জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ বর্তমানে গুরুতর সমস্যা হ'য়ে উঠেছে। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন সমাজ-আদর্শ, বিভিন্ন ঐতিহ্যের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে চিরাচরিত সমাজব্যবস্থার ভিত্তি টলে

গিয়েছে—আজও আমেরিকার সমাজ তার পরিবর্তে সর্বজনগ্রাহ্য নতুন আদর্শ, নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

বস্তুতপক্ষে সাম্প্রতিক আমেরিকাকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের বিরাট লেবরেটরী মনে করলে অন্যায় হবে না। সেখানে পুরাতন সমাজব্যবস্থা, সমাজদর্শন বদলে যাচ্ছে, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিও আমূল রূপান্তরিত হচ্ছে। মার্কস উৎপাদন-পদ্ধতির বিকাশ এবং সমাজের উৎপাদনী শক্তি কার দখলে তাই দিয়ে মানুষের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের বিচার করতে গিয়েছিলেন। নতুন তথ্য আবিষ্কারের মোহে মার্কস সমাজ-জীবনের অন্য বহু আবশ্যকীয় তথ্যের উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কার যে যুগান্তকারী সে কথা অস্বীকার করা চলে না। আমেরিকার বিকাশ কিন্তু মার্কসের দু-একটি মূল সূত্রকেই পালটে দিয়েছে। ধনতন্ত্রের যে স্বরূপ মার্কসের কল্পনায় ধরা দিয়েছিল, আমেরিকান ধনতন্ত্রের তার সঙ্গে খুব বেশি মিল নেই। মার্কস ভেবেছিলেন যে ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধনিকের ধনবৃদ্ধি ও শ্রমিকের শ্রম ও ক্লেশবৃদ্ধি সমানভাবে চলবে। আমেরিকায় ধনিকের ধনবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু শ্রমিকও সমানভাবে লাভবান হয়েছে। তার শ্রমের পরিমাণ কমেছে, মূল্য বেড়েছে। আজ আমেরিকায় সাধারণ শ্রমিক যে আরাম ও আয়াসে জীবন কাটায়, অনেক দেশে ধনিকের ভাগ্যেও ততখানি আরাম আয়াস জোটে না। আমেরিকার শ্রমিকমহলে এ প্রসঙ্গে নানা গল্প লোকমুখে বহুল প্রচারিত। ভালো বাড়ি, ঘর-দোর শীতকালে গরম, গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা, খাদ্যপানীয় রাখবার মতো ফ্রিজিডেয়ার বা বরফের কল এবং অন্তত একখানি মোটরগাড়ি নেই— এ রকম কর্মী বা মজুরের পরিচয় সাম্প্রতিক আমেরিকায় মেলা কঠিন। বস্তুতপক্ষে আমেরিকায় সাধারণ পরিবারের মানুষ যে আরামে থাকে, আমাদের দেশে বড়লোকের ভাগ্যেও তা বহুক্ষেত্রে জোটে না। অবশ্য জিনিসপত্তর বাড়লে মনের আনন্দ বাড়ে কি না, সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকলে চিত্তের শান্তি মেলে কি না, সে প্রশ্ন আলাদা।

আমেরিকায় যে সর্বসাধারণের জন্য সমস্ত জিনিসের প্রাচুর্য, তার অন্যতম কারণ এই যে আমেরিকার অভিজ্ঞতায় অর্থনীতির পুরানো নিয়ম অনেকখানি বদলে গিয়েছে। প্রাচীন অর্থনীতি শেখাতো যে পৃথিবীর কতকগুলি দেশ কাঁচামাল উৎপাদন করে, সেগুলি শিল্পপ্রধান দেশে রপ্তানি হ'য়ে নানা রকম ব্যবহারের জিনিস তৈরি হয় এবং সেই তৈরি জিনিস আবার কাঁচা মালের দেশে ফিরে আসে। কাঁচা মালের প্রয়োজনে শিল্পপ্রধান দেশগুলি অন্য দেশকে দখল ক'রে রাখে, উপনিবেশ ব'লে গণ্য করে। তাতে শিল্পপ্রধান দেশের লাভ হয় দু'ভাবে। রাষ্ট্রীয়শক্তি ব্যবহার ক'রে কাঁচা মাল কম দামে কেনে এবং কাঁচা মাল পাবে সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি জিনিস নিজের উপনিবেশে বেশি দামে বিক্রয় করে—অন্য দেশের তৈরি জিনিস সেখানে আনতে দেয় না। এমনিভাবে প্রধানত বাণিজ্যের প্রয়োজনে উনবিংশ শতকের সাম্রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল এবং তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রেই মার্কস সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ধনতন্ত্রের বিকাশের ফলে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব, এবং ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য সব রকমে বেড়ে যাবে।

ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্লেষণ মার্কস করেছিলেন, তাকে যদি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায়, তবে মার্কসপন্থীর হিসাবে আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী বলা চলে না। আমেরিকা উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল আমদানী করে না, তৈরি জিনিস উপনিবেশে ফেরৎ পাঠায় না। আমেরিকা বোধ হয় বর্তমানে পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখান থেকে কাঁচামাল এবং তৈরি

জিনিস সমানভাবে বিদেশে রপ্তানী হয়। আমেরিকার বিরাট স্বল্পপরিবেশে প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কাঁচামালই উৎপন্ন হয়, এবং এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে নিজের দেশের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েও বাইরে রপ্তানী করবার কোন বাধা থাকে না। কাঁচামালের উৎপাদন যেমন প্রচুর, তৈরি জিনিসের উৎপাদন বোধ হয় তার চেয়েও বেশি। এত বেশি কল-কারখানা মোটরগাড়ি যন্ত্রপাতি আর কোন দেশে তৈরি হয় না। তাই গম, তুলো এবং অন্যান্য কাঁচা মালের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রকমের তৈরি জিনিসও বাইরে চালান হয়। শুধু তাই নয়,আমেরিকার নিজের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এত বেশি, খরিদ্দারের দাবি এত প্রবল যে বাইরের পৃথিবীতে জিনিস না পাঠিয়েও আমেরিকা বিশাল শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তুলতে পারে। আমেরিকা যে উপনিবেশ শাসন বা বিদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করবার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি, এবং অতি সহজে স্পেচ্ছায় ফিলিপাইনের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে, তারও অন্যতম কারণ এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মিলবে। এমনিতেই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে আমেরিকার পত্তন হয়েছিল বলে আমেরিকাবাসী সাধারণ-ভাবে সাম্রাজ্যবিরোধী। নানা দেশের বিদ্রোহীর সমাগমে আমেরিকার জনসংগঠন গড়ে উঠেছে বলে স্বাধীনতাস্পৃহা সেখানে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তার উপর আমেরিকায় অর্থনৈতিক বিকাশের ইতিহাস যে যারা অবলম্বন করেছে, তার ফলে আমেরিকা যে অন্য দেশ জয়কে খানিকটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখবে, তাতে বিচিত্র কি?

রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্যের যে পরিচয় আমেরিকায় মেলে, তার উল্লেখ আগেই করেছি। কোন জিনিসের অভাব নেই বলে আমেরিকার সকলের ভাগেই প্রাচুর্যের পরিচয় মেলে। বরং বলা যেতে পারে যে বহুক্ষেত্রে প্রাচুর্য অপচয়ে রূপান্তরিত হয়। সত্যি যে ভাবে আমেরিকায় সব জিনিসের ছড়াছড়ি, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। হোটেলে গিয়ে খাবার অর্ডার দিলে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে, যে কোন লোকের পক্ষে তার সম্ব্যবহার করা কঠিন। যদি বলা হয় যে এত চাই না, খানিকটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও, তবে সোজা উত্তর দেবে যে যতটুকু খুশি খাও, বাকি ফেলে দিলেই চলবে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন এ দেশে বহু আমেরিকান সৈন্য এসেছিল, তখন দেশের লোক তাদের অপব্যয়ের খানিকটা পরিচয় পেয়েছে। বাংলাদেশে তখন দারুণ অন্নকষ্ট, পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে ভাবে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিয়েছে সে কথা বাঙালী কখনো ভুলবে না। সেই অনটনের দিনেও কিন্তু আমেরিকান সিপাহী কোন জিনিসের অভাব বোধ করেনি। তারা নিজেরা তো খেয়েছেই, এবং বহুক্ষেত্রে নিজেদের উদ্বৃত্ত খোরাক বিলিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে তোমাদের দেশের খোরাক আমরা একটুকুও নিইনি, আমেরিকা থেকে এ খোরাক আমরা এনেছি। অনারসের রস বা কমলালেবুর রসের মস্ত বড়ো টিন কেটে তারা এক পেয়ালা খেয়ে বাকিটা ফেলে অথবা বিলিয়ে দিয়েছে। মস্ত বড়ো রুটির একটুকরো খেয়ে বাকিটা ছুঁড়ে ফেলেছে। তারা লোকদেখানোর জন্য এ-রকম করেনি। নিজেদের দেশে প্রতিদিন যেভাবে জিনিসের অপচয় করে, এ দেশেও তার-ই জের বজায় রেখেছে। আজও আমেরিকার যে কোন শহরে গ্রামে গেলে আতিশয্যের বাড়াবাড়ি এবং খাদ্যদ্রব্যের অপচয়ের পরিচয় মেলে। কেবল খাদ্যদ্রব্য নয়, সমস্ত জিনিসই তারা যেন খানিকটা অবহেলা, খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার ব্যবহার করে ফেলে দিতে চায়। জিনিসের চেয়ে মেহনতের দাম ঢের বেশি বলে আজকাল আমেরিকায় এক বিশেষ ধরনের কাগজের সার্ট কাগজের সুট তৈরি হয়েছে; সে-রকম সার্ট বা

সুট কিনতে যত পয়সা লাগে, ধোয়াতেও প্রায় তাই লাগে বলে অনেক লোকে এ সব কাপড় একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়।

কেবল খাদ্যদ্রব্য পোষাক-আসাক বলে নয়, আমরা যে সব জিনিসকে মূল্যবান বা মহার্ঘ মনে করি, আমেরিকাবাসীর তার প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ নেই। আমরা মোটরগাড়ি কিনলে সাবধানে যত্নে তাকে আট-দশ বৎসর চালাতে চাই, কোন কোন ক্ষেত্রে একই মোটর কুড়ি বছর পর্যন্ত চলে। আমেরিকার লোক বছর ফুরোবার আগেই পুরানো মোটর নাকচ করে কেমন করে নতুন মোটর কিনবে সেই ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সেদিন পড়ছিলাম যে একজন আমেরিকান বিলেতে একখানি পুরানো মোটর বিক্রী করতে গিয়েছিল। দোকানদার গাড়ির ইঞ্জিন পরীক্ষা করে, দরজা-জানালা টেনে-টুনে দেখে দর ঠিক করল। আমেরিকায় দোকানদার এসব করে না। একবার গাড়ির নির্মাতার নাম ও তৈরির বছর দেখে দাম বলে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন বছরে কি ভালো গাড়ি বেরিয়েছে তার গুণে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। বিক্রেতার পুরানো গাড়ি নিয়ে তার বদলে নতুন গাড়ি গছাবার জন্যই তার বেশি আগ্রহ। বস্তুতপক্ষে, এ-সব ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীই একেবারে আলাদা।

ইয়োরোপে যে কোন শহরে গেলেই সেখানকার প্রাচীন কীর্তির প্রতিই প্রথম দৃষ্টি পড়ে। কোন কারখানায় গেলে কারখানার মালিক বা ম্যানেজার এক লো বছর আগে সে কারখানায় কিভাবে কাজ সুরু হয়েছিল, পুরনো কারখানার আজও যে কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে গর্বের সঙ্গে তার বিবরণ দেয়। আমেরিকার বেশিরভাগ শহরেই পুরানো কীর্তির কোন বালাই নেই। কারখানায় গেলে মালিক বা ম্যানেজার গর্বের সঙ্গে বলে যে সবই সেখানে আনকোরা নতুন, এমন কি এক টুকরো পুরানো ইঁটও বোধ হয় নেই, সমস্ত কারখানা ঢেলে সেজে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দু'চার বছর পরে বার বার করা হয়। নিউইয়র্ক শহরে বসেই প্রতিদিন আমেরিকাবাসীর নতুনের মোহ এবং স্থায়ী জিনিসের প্রতি বিরাগের পরিচয় মেলে। চোখের সামনে দামী ভারী পাকা ইমারত ভেঙে ফেলা হয়—ইয়োরোপের যে কোন দেশে বোধ হয় সে ধরনের ইমারত ভাঙবার কথা লোকে ভাবতেও পারে না—তার বদলে নতুন ধরনের নতুন আট্টালিকার পত্তন হয়। যে কোন শহরে গেলে দেখা যাবে যে শহরের ঠিক বাইরে হাজার হাজার মোটরগাড়ি পড়ে রয়েছে। আমাদের চোখে সে গাড়ির জৌলুষ, তার পরিচ্ছন্নতা লোভনীয়, কিন্তু খবর নিলে জানা যাবে যে এ সমস্ত গাড়িই পরিত্যক্ত। স্থানাটিকে মোটরগাড়ির কবরস্থান বললে অত্যুক্তি হবে না এবং বহু সহরেই এ ধরনের কবরস্থান রয়েছে।

নতুন সমাজ নতুন সভ্যতা গড়বার প্রেরণায় আমেরিকাবাসী যেন স্থায়ী সব জিনিসের প্রতিই খানিকটা বীতরাগ। তাকে সাম্যায় বলা মোটেই চলে না। আমেরিকাবাসী জীবনকে উপভোগ করতে চায়, উপভোগ করতে জানে, কিন্তু কোন জিনিসকে আঁকড়ে বসে থাকতে চায় না। জীবনের সে দেশে যে কী হুড়োহুড়ি তা না দেখলে উপলব্ধি করা কঠিন। যে যা করছে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে করছে, যখন যা হাতে নিচ্ছে, মনে হয় সে পৃথিবীতে তা ছাড়া আর বুঝি কিছু করণীয়, কিছু বরণীয় নেই। কিন্তু দু'দিন পরে যখন তার নূতনত্বের মোহ কেটে গেল, তখন আর লোকে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। আমরা বলে থাকি যে ভারতবর্ষের মানুষ খানিকটা স্বভাববৈরাগী; জীবনের নশ্বরতা, জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা মনে-প্রাণে অনুভব করেছি বলে আমরা সংসারে কিছু আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই না। সে কথা যে কতখানি সত্য, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ করা চলে। হয়তো বৈরাগ্য মনোভাব

তার জন্য যতখানি দায়ী, আলস্য ও স্বভাবের জড়তা ঠিক ততখানিই দায়ী। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন ভারতবর্ষের লোক যে অনেক সময় সাংসারিক সাফল্যের বিষয়ে উদাসীন, সুখ-দুঃখ দুই-ই সমানভাবে গ্রহণ করে সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। ফলে পার্থিব সুখ, এবং বিশেষ ক'রে বিলাস-ব্যসনের সামগ্রীর প্রতি ভারতবাসী বহুক্ষেত্রে বীতরাগ, এবং তাকেই আমরা আধ্যাত্মিকতা নাম দিয়েছি। আমেরিকায় সে ধরনের আধ্যাত্মিকতার পরিচয় বেশি মিলবে না। কিন্তু এ-কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে আমেরিকাবাসী বিলাস চায়, কিন্তু বিশেষ বিলাস-সামগ্রীর প্রতি তার মোহ নেই। সুখ চায়, কিন্তু সুখের উপকরণকে তাচ্ছিল্য ও অবহেলার চোখে দেখে।

জাতীয় চরিত্র যে তেমনভাবে দানা বাঁধেনি, আমেরিকার সামাজিক জীবনের আর-একটি লক্ষণ থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। নতুনের প্রতি মোহের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে আবেগ বা উচ্ছ্বাসের যে দমকা হাওয়ায় দেশের সমস্ত নরনারীর চিরাচরিত জীবনের ভিত্তি পর্যন্ত টলে ওঠে, অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বা জমাট সমাজে তা বোধ হয় সম্ভব হয় না। বোধ হয় বলাছি এই জন্য যে ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে, বাংলা-দেশেও মাঝে-মাঝে এ-রকম হুজুগ ওঠে, তখন মানুষ যেন বিচারবুদ্ধি হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ঠিক আগে এবং ঠিক পরে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার কালো হাওয়া সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, সাধারণত যাঁরা বিবেচক ও স্থিরবুদ্ধি তাদেরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল এবং সেই উদ্বেগ ও পাগলামির মুহূর্তে ভালো লোকেরও যেভাবে বুদ্ধিভ্রম ও স্খলন ঘটেছিল, তা দেখার পরে আমেরিকাকে এ-বিষয়ে বেশি নিন্দা করা আমাদের সাজে না। শুধু এইটুকু হয়তো বলা চলে যে বাংলাদেশের হুজুগ অতটা ব্যাপক নয় ব'লে সাধারণত ততটা ক্ষতিকর নয় এবং ১৯৪৬-৫০ সালে যা কিছু ঘটেছিল, সে-সব জিনিস বাঙালীর স্বভাবের ব্যতিক্রম। অসাধারণ উত্তেজনার মুখে অত্যন্ত বিশেষ পরিস্থিতি না হলে বোধ হয় এ-রকম ব্যাপার এ-দেশে ঘটত না। আমেরিকায় কিন্তু এ-ধরনের হুজুগ প্রায়ই ঘটে, এবং দু'দিন পরে সবাই ভুলে গেলেও যতদিন আন্দোলন প্রবল থাকে, ততদিন তার বিরুদ্ধে কেউ বড় একটা দাঁড়াতে চায় না। ধর্মের নামে যে কত আন্দোলন আমেরিকায় চলেছে এবং চলছে, তার ইয়ত্তা নেই। নিরামিষ ভোজনকে সেখানে জাতীয় আন্দোলনের পর্যায়ে তোলা যায়। আবার হয়তো ঠিক তারই পাশে আরেক আন্দোলন জমে উঠল যার লক্ষ্য যে সবাই মাংস খাবে! পোষাক-আসাকের পরিবর্তন নিয়েও নানা রকমের হুজ্জোড় লেগেই আছে। আমাদের দেশে এককালে কীর্তনসভায় সবাই ভাবাবেগে আকুল হ'য়ে নাচতে গাইতে কাঁদতে সুরু করত, তার বহু বিবরণ মেলে। আজ-কালও হয়তো এ ধরনের অভিজ্ঞতা একেবারে বিরল নয়। আমেরিকার বহু ধর্মসভায় ঠিক সেই ধরনের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বক্তা বক্তৃতা করতে করতে এমনভাবে মেতে যান যে কখনো চীৎকার, কখনো কান্না, এমনকি কখনো কখনো উল্লম্ফন সুরু ক'রে দেন। শ্রোতৃমণ্ডলী ঠিক এক সুরে বাঁধা বীণার মতন বক্তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-আবেগে উত্তেজনায় আন্দোলিত হয়।

কত সহজে যে আমেরিকার জীবন-সমুদ্রে তরঙ্গ উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে, অল্প কয়েক বছর আগেকার একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। বিভিন্ন গৃহবাসীদের মধ্যে যুদ্ধকে ভিত্তি ক'রে ওয়েলস একটি বিখ্যাত উপন্যাস এ শতাব্দীর গোড়ায় লেখেন। তখনো গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার কল্পনা কেবলমাত্র কল্পনাই ছিল, এমন কি এরোপ্লেনের সম্ভাবনার

বিষয়েও তখন বেশির ভাগ লোক সন্দিহান। সম্প্রতি গ্রহান্তরে যাবার অনেক পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে এবং বলাবাহুল্য এ-সব ব্যাপারে আমেরিকাই অগ্রণী! বস্তুতপক্ষে চন্দ্রালোকে যাবার জন্য সেখানে টিকিট বিক্রী পর্যন্ত সুরু হ'য়ে গেছে! আজ কয়েক বছর হলো একটি রেডিও কোম্পানী ওয়েলসের উপন্যাসের ধাঁচে একটি প্রোগ্রাম তৈরী করে এবং একদিন ঘোষণা ক'রে বসে যে মঙ্গল গ্রহবাসী অতি-বুদ্ধিমান জীব পৃথিবীকে আক্রমণ করেছে। তার ফলে কেবল নিউইয়র্ক নয়, সমস্ত আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনে যে বিরাট আলোড়ন এসেছিল, প্রত্যহের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হ'য়ে যেভাবে সমগ্র দেশে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সে কথা স্মরণ ক'রে আমেরিকার সুধীবৃন্দ এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ এখনো আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন। এত সহজে দেশে যদি আন্দোলন, উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করা যায়, তবে জাতির জীবনযাত্রার সহজ প্রবাহকে বন্ধ বা ব্যর্থ করতে শত্রুকে বেশি বেগ পেতে হবে না। জাতীয় জীবনের জন্য এ-রকম সম্ভাবনা বিপজ্জনক। ইয়োরোপে এ-ধরনের রেডিও প্রোগ্রামের ফলে এতখানি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো না ব'লে মনে হয়। এমনকি ভারতবর্ষেও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসের ফলে উত্তেজনার পরিমাণ যে বহুল পরিমাণে কম হতো, সে কথা খানিকটা জোর ক'রে বলা চলে।

পূর্বেই বলেছি যে বহু ব্যাপারে আমেরিকা সমস্ত পৃথিবীর জন্য নতুন জীবনের অভিজ্ঞতার এক বিরাট লেবরেটরী। নরনারীর সামাজিক সম্বন্ধের বিষয়েও এ-কথা সত্য। প্রথম যখন আমেরিকায় ইয়োরোপীয় মানুষের বসতি সুরু হলো, স্বভাবতঃই তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশি ছিল, নারীর সংখ্যা ছিল কম। তাই আমেরিকার সমাজে নারী যে মর্যাদা ও আদর পেয়েছে, এবং আজো পাচ্ছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ হয় তার নজীর মিলবে না। অনেক সময় ঠাট্টা ক'রে বলা হয় যে নারী হ'য়ে জন্মাতে হ'লে আমেরিকার মতো দেশ নেই। পুরুষের পক্ষে বোধ হয় এশিয়া ইয়োরোপ আফ্রিকার সমস্ত দেশই প্রশস্ত। বিশেষ ক'রে জাপান চীন ভারতবর্ষে যত সুবিধা, অন্য কোথাও ততটা নয়! সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য নানা কারণে আমেরিকার নারী প্রথম থেকেই সমাদর পেয়েছে, এবং সমাজবিকাশে তার পরিশ্রম ও দানের ফলে দিন দিন সে সমাদর বেড়েই গেছে। আমেরিকায় প্রথম যুগে নারী পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে বন-জঙ্গল সাফ করেছে, ক্ষেত-খামারের কাজ করেছে, প্রয়োজন হ'লে বন্দুক পিস্তল নিয়ে লড়াই করেছে। কালক্রমে যখন বন-জঙ্গল সাফ হ'য়ে গেল, শত্রুভাবাপন্ন ভিন্ন জাতির মানুষ রইলো না বা বশ্যতা স্বীকার করলো, ধীরে ধীরে নারীর সংখ্যা পুরুষের সমান হ'য়ে কালক্রমে পুরুষের চেয়ে বেশি হ'য়ে দাঁড়ালো, তখনো কিন্তু পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গী সহজে বদলালো না। একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে সাধারণভাবে ইয়োরোপ এবং এশিয়ায় পুরুষ-ই কর্তৃত্ব করেছে। সমাজ একান্তভাবে পুরুষ-পরিচালিত। আমেরিকায় এ পুরোনো মনোভঙ্গী ধাক্কা খেয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশও তার জন্য অনেকটা দায়ী।

পূর্বেই বলেছি যে আমেরিকায় নানা ধরনের যন্ত্রপাতির যেভাবে ব্যবহার হয়, অন্য কোথাও আজ পর্যন্ত তা হয়নি। সব দেশেই যন্ত্রের ব্যবহার প্রধানত কারখানার কাজে, সমাজের প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনের তাগিদে। আমেরিকাতেই প্রথম যন্ত্রকে মানুষের গৃহদাস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যন্ত্রের ডাকে ভোরে ঘুম ভাঙে, যন্ত্রের সাহায্যে প্রাতরাশ তৈরী হয়, যন্ত্র দিয়ে ঘরদোর সাফ করা হয়, পোষাক তৈরী ক'রে ধোয়ানো শুকানো হয়, যন্ত্রের সাহায্যে বাসন-কোসণ ধোওয়ার ব্যবস্থা হয়। এককথায়, ঘর-বাড়ির সমস্ত

কাজে যন্ত্র যেভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে, তার নিদর্শন অন্য দেশে মেলে না। যন্ত্রের ব্যবহারে ঘরের কাজের বোঝা লাঘব হয়েছে, সারাদিন ঘরের কাজে আটক থাকার প্রয়োজন নেই। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে শারীরিক শ্রমও কমে গিয়েছে। শারীরিক শক্তিরও আগেকার মতো অতখানি কদর নেই। তাই কলকারখানায় স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে কাজ করে, একই ধরনের উপার্জন করতে পারে। দু'ভাবে তাতে নারীর স্বাধীনতা বেড়ে গিয়েছে। ঘরের কাজ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে, এবং স্বোপার্জিত অর্থের ভরসায় আর পূর্বের মতো পুরুষ-নির্ভর হ'য়ে থাকে না। নানা ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় অবলম্বনের ফলে নারীর এ স্বাধীনতা আরো বেশি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে আমেরিকার সমাজে সকলের অগোচরে এক নীরব রূপান্তর ঘটে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ বিপ্লবের সুরু হয়েছে, কিন্তু আমেরিকায় তা যতখানি পরিণত, অন্যত্র কোথাও তা হয়নি। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ তাতে বদলে যাচ্ছে। পুরানো সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। আমেরিকাতেই নারী সর্বপ্রথম সর্ব-ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দাবী করেছে। যুক্তি দিয়ে নরনারীর সাম্যকে গ্রহণ করা যত সহজ, প্রতিদিনের জীবনে তাকে কার্যকরী করা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। মানব ইতিহাসের প্রথম থেকেই নরনারীর যে শ্রমবিভাগ ঘটেছে, তার ফলে পুরুষ বাইরের কাজ এবং নারী গৃহস্থালীর কাজ করবে এই ধারণা প্রায় নৈসর্গিক নিয়ম ব'লে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে। মানুষের বংশরক্ষার দায়িত্বও প্রধানত নারী গ্রহণ করেছে এবং তার দৈহিক ও সামাজিক যে সব আনুষঙ্গিক, তার ফলেও নারী অধিক পরিমাণে গৃহনির্ভর হ'য়ে পড়েছে। ফলে আর্থিক ব্যাপারেও নারী কালক্রমে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করেছে। সহস্র বৎসরের এই সমস্ত প্রথা, রীতি ও বিশ্বাসের ছাপ যে কেবল নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায়, তা নয়, নরনারীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোবৃত্তির উপরেও তার প্রভাব সমান স্পষ্ট। যন্ত্রসভ্যতার বিবর্তনে আজ সেই বহুযুগে প্রচলিত সংস্কার বদলাতে সুরু করেছে। তার ফলে প্রথম প্রথম যে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। এককালে দুশ্চরিত্র অত্যাচারী রোগজীর্ণ স্বামীর অবহেলা ও অনাদর সহ্য ক'রেও নারীকে গৃহধর্ম পালন করতে হতো, এবং যে স্ত্রী এ ধরনের অবজ্ঞা ও অপমান যত বেশি সহ্য করতে পারত, তাকে তত বড় সতী বলা হতো। প্রতিক্রিয়ায় আজ যদি স্বামীর বাস্তব অথবা কল্পিত সামান্য ত্রুটির জন্য স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ করে, তবে তাতে দুঃখিত ও চিন্তিত হবার কারণ আছে, কিন্তু বিস্মিত হওয়া সাজে না। পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে এক কথায় বর্জন করতে পারত, আজকাল সমাজের কোন কোন স্তরে স্ত্রী স্বামীকে বিনা কথায় বর্জন করতে চায়।

স্ত্রী-পুরুষের সাম্যপ্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে যে এ ধরনের বাড়াবাড়ি হবে তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। আমেরিকায় এ সাম্যব্যবস্থার প্রথম পরিচয় ব'লে তাই সে দেশেই বিবাহবন্ধনছেদের দৃষ্টান্ত বেশি মেলে। এ প্রসঙ্গে কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আমেরিকায় নারী ও পুরুষ দুই পক্ষ থেকেই স্বাধীনতার দাবী প্রবল, তাই সে দেশে অনেক বেশি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে তালাক দেয় বা বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করে। অন্য দেশের থেকে তালাকের অনুপাত তাই স্বভাবতঃই বেশি। কিন্তু তাই ব'লে সব স্বামী বা স্ত্রী-ই যে বিচ্ছেদের জন্য উন্মুখ হ'য়ে বসে আছে, এ কথা ভাবলে গুরুতর অন্যায় হবে। বস্তুতপক্ষে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমেরিকাতেও সাধারণ গৃহস্থ

ঘরের স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া-কোন্দল ক'রেও মিলে-মিশে থাকে, সহজে বিবাহবন্ধন ছেদ করতে চায় না। বিচ্ছেদের অনুপাত যে অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি তার একটি প্রধান কারণ যে সমাজের একটি বিশেষ স্তরে মুষ্টিমেয় নরনারী বারবার বিবাহ করে, বিবাহবন্ধন বিচ্ছেদ করে। অনেক সময় খবরের কাগজে দেখা যায় যে জনৈক পুরুষ পঞ্চমবারে যাকে বিবাহ করল, সেই নারীর পক্ষেও সেটি ষষ্ঠ বা সপ্তম বিবাহ। হিসাবে কিন্তু এ ধরনের বিবাহ বা বিচ্ছেদকে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বিবাহ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গে তফাৎ ক'রে দেখা হয় না। সমাজে যদি শতকরা নব্বইজন স্ত্রী পুরুষও সারাজীবন একসঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করে, বাকি শতকরা দশজন স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকে সাত আটবার ক'রে বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ করলে হিসাবে দাঁড়াবে যে সমাজ ভেঙে পড়ছে, কারণ শতকরা চাল্লিশ পঞ্চাশটি বিবাহই অসার্থক, অল্পদিনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন নতুন জীবন-সঙ্গী খুঁজছে। আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে সজাগ হ'য়ে উঠেছেন, এবং আশা করা যায় যে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীনতা ও সাম্য যখন দুই পক্ষেই সহজ হ'য়ে উঠবে, তখন বিবাহ-অনুষ্ঠানও পুরাতন মর্যাদা ফিরে পাবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের যখন প্রথম পত্তন হয়েছিল, তখন সে দেশে একখানি পোস্টকার্ড লিখেই বিবাহবন্ধন ছেদ করা যেত, কিন্তু আজকাল বোধ হয় ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রেই বিবাহচ্ছেদ করা বেশি কঠিন। সে দেশে আইন ক'রে এবং সামাজিক আবহাওয়া বদলিয়ে পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদ দিন দিন আরো মজবুত করবার চেষ্টা স্পষ্ট।

যন্ত্রের ব্যবহারে আমেরিকায় যে কেবল পারিবারিক সম্বন্ধের পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্ত সম্বন্ধই তার ফলে বদলে যাচ্ছে। ভূগোল ও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণার যে কি পরিবর্তন হয়েছে, সামান্য একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। একবার একজন আমেরিকান বন্ধুর গাড়িতে আমি যাচ্ছিলাম। আমার জন্য হোটেল আগেই ঠিক করা ছিল। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে হোটেলে যদি তাঁর জন্য জায়গা পাওয়া না যায়, তবে কাছেই তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি আছে, সেখানে রাত্রি যাপন করবেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে হোটেলে যখন জায়গা মিলল না, তখন জানা গেল যে, যে বন্ধুর বাড়িতে রাত্রিযাপন করতে চান, হোটেল থেকে তা মাত্র একশো মাইল দূরে! টেকসাস বা কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে স্বামী-স্ত্রী একশো দেড়শো মাইল গাড়ি চালিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ডিনার খেতে যাট সত্তর মাইল যেতে হ'লে তা নিয়ে একবার দ্বিরুক্তিও করে না! আমেরিকায় মোটরগাড়ির যেভাবে প্রচলন হয়েছে এবং যেভাবে আমেরিকাবাসী মোটরগাড়ির ব্যবহার ক'রে তা অন্য দেশবাসীর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। তিন চারশো মাইলের পথকে তারা পথ-ই মনে করে না—প্রতি বছর গরমের ছুটিতে সপরিবারে বেরিয়ে দু'তিন হাজার মাইলের চক্কর দিয়ে আসে। তার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের দূরত্ব ও বৈশিষ্ট্য দিন দিন লোপ পাচ্ছে, নানা দেশের নানা অঞ্চলের মানুষের দেহে-মনে আমেরিকান ছাপ দিন-দিন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

আমেরিকায় মানুষ যন্ত্রকে দাস হিসাবে ব্যবহার করে, এবং বোধ হয় সেজন্যই আনুষ্ঠানিকভাবে দাসত্বপ্রথা আমেরিকাতেই লোপ পায়। যন্ত্র হাতে পেলে আমেরিকান ছেলে বুড়োর আনন্দও দেখবার জিনিস। বহুবার দেখেছি যে বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা অতিথি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বৈঠকখানায় বসে গল্প করতে করতে আমার মনে হয়েছে যে এত স্থবির লোক নিজের বাড়ি ছেড়ে কিভাবে এলো? সেই বৃদ্ধই যখন গাড়ি চেপে

বসল, তখন যেন এক অপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তার দেহ তাজা হ'য়ে উঠল। যেভাবে তারা মরীয়া হ'য়ে গাড়ি চালায়, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। মোটরগাড়ির জন্য যে রাস্তা তৈরি হয়েছে, তাও অপরূপ। প্রথমে জার্মানীতেই আউটোবান বা মোটররাস্তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকায় পার্ক-ওয়ে, থ্রু-ওয়ে, হাই-ওয়ে প্রভৃতি তার নানা রূপান্তর ঘটেছে। হাজার মাইল রাস্তা চলে গেছে, কোথাও এক পথ অন্য পথকে কাটে না, ফলে কোথাও চৌমাথা নেই, ডাইনে বাঁয়ে থেকে গাড়ি আসবার সম্ভাবনা নেই। বিপরীতদিকের গাড়ি সমান্তরাল ভিন্ন পথে চলে, ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘোরবার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা। সহজ কেবলমাত্র সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ। কোনদিকে মোড় ঘুরতে চাইলে বড় রাস্তা ছেড়ে পাশের রাস্তায় নামতে হবে। উল্টো মুখে যেতে হলে তার জন্য তিনবার রাস্তা বদলাতে হবে। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের শোভা, বিরাট দেশের সৌন্দর্য—সব কিছু উপেক্ষা ক'রে সোজাপথে মোটরগাড়ির দল ছুটে চলেছে। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে চলেও তৃপ্তি নেই। সত্তর আশি নব্বই মাইল বেগে গাড়ির পরে গাড়ি চলেছে। আমেরিকান এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তোমাদের দেশে এত রাস্তাঘাট, চারিদিকে এত প্রকৃতির শোভা, শুধু সে পথে পায়ে হেঁটে চলবার লোক নেই। সে শোভা দেখবে ব'লে দু'দণ্ড কোথাও থামবে, হাই-ওয়ে, থ্রু-ওয়ে, পার্ক-ওয়ে প্রভৃতি রাস্তায় তার স্থান কই? গল্প শোনা যায় যে এক অশীতিপর আমেরিকান বৃদ্ধা তাঁর নাতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আজকাল রাস্তাঘাট এত ভালো, মোটর এত বেগে চলে, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে তোমরা করো কি?

আমেরিকার সমাজে যন্ত্রের অবাধ ব্যবহার, কিন্তু তার ফলে মানুষও যে যন্ত্রের দাস হ'য়ে পড়েছে, সে কথা সব সময় চোখে পড়ে না। নিউইয়র্কের বড় বড় হোটেলে কখনো কখনো সে কথা মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়। সব কাজ যন্ত্রের মারফৎ হয়, সব কিছু যন্ত্রের মতো ঘড়ির কাঁটা ধরে সম্পন্ন হবার কথা। কিন্তু যন্ত্র যদি একবার বিগড়ালো তো মানুষ একেবারে অসহায়। হোটেলের দালান ত্রিশতলা চল্লিশতলা—লিফ্‌ট্ ভিন্ন উঠা-নামা অসম্ভব। কিন্তু সময় সময় লিফ্‌টের জন্য যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাতে মনে হয় যে সিঁড়ি ভাঙতে পারলেই ভালো হতো। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় খোরাক-পোষাকের ব্যাপারেও আজকাল আমেরিকাবাসী যেভাবে যন্ত্রনির্ভর তা দেখেও মাঝে মাঝে ভাবনা হয়, আশঙ্কা হয়। ভিড়ের সময় পথ চলতেও একথা বারবার মনে হয়। আমেরিকার জনসংখ্যা প্রায় পনেরো ষোল কোটি, কিন্তু সেদেশে মোটর গাড়ির সংখ্যা হবে প্রায় আট নয় কোটি, বাস লরী ট্রাক আরো আট নয় কোটি। অর্থাৎ যত মানুষ, বিভিন্ন ধরনের যানযান তার চেয়ে ঢের বেশি! বড় বড় মোটরের কারখানা বিজ্ঞাপন দেয় যে পরিবারে একখানি মোটর থাকলে চলবে কি ক'রে? কর্তা বা গিন্নী কাজে বেরোলে বাড়ির অন্য লোকের জন্য অন্তত আর একখানি গাড়ি চাই। দু'খানি ফোর্ড বা শেভ্রোলে না থাকলে পরিবারের সম্ভ্রম থাকে কি ভাবে? অগুন্তি গাড়ি বাড়বার ফলে শহরে গাড়ি রাখবে কোথায় তা-ও এক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের নিজেদের গাড়ি আছে, তারাও নিউইয়র্কে সহজে গাড়ি আনতে চায় না। শহরের কাছে পৌঁছে কোন শহরতলী বা পল্লীতে গাড়ি রেখে হয় বাসে ট্রামে আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে চলে, নয়তো ট্যাক্সী নেয়। ভিড়ের সময় নিজেই দেখেছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ে হেঁটে গেলে মোটরের চেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়। গাড়ি রাখবার জায়গা নেই ব'লে স্বামী খালি গাড়ি চালাতে থাকে, ততক্ষণে স্ত্রী গিয়ে বাজার সওদা শেষ করে এবং যদি স্ত্রী যখন দোকান থেকে বেরিয়ে এলো, ঠিক সেই সময় স্বামী গাড়ি নিয়ে পৌঁছাতে না পারে তবে

স্বামীকে আবার চক্কর দিতে হয় আর স্ত্রী পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকে! গত মহাযুদ্ধের সময় ঠাট্টা ক'রে বলা হতো যে কলকাতা শহরে কাউকে টেলিফোন করতে যত সময় লাগে, ট্যাক্সী ক'রে তার সঙ্গে তার চেয়ে আগে দেখা ক'রে আসা যায়। নিউইয়র্কের বেলায় বলা চলে যে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশে আজ শহর এমন জায়গায় পৌঁছিয়েছে যে বহুক্ষেত্রে যন্ত্রকে বাদ দিয়ে আদিম কালের পায়ে-হাঁটা পথেই গন্তব্যস্থানে বেশি তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যায়।

যন্ত্রসভ্যতার বিড়ম্বনার আরো অনেক নিদর্শন দেওয়া চলে। আমেরিকায় রান্নাঘরের যে উৎকর্ষ হয়েছে তাতে জড়োয়া গয়না এবং বেনারসী শাড়ি পরে রান্না করলেও বোধ হয় কাপড়ের ভাঁজ ভাঙবে না। গয়নাতেও বিন্দুমাত্র কালি লাগবে না। শাক-সব্জি সব যন্ত্র দিয়ে কাটা চলে, ধোয়া হয়। মাছ-মাংস তো দোকান থেকেই অর্ধেক রান্না হ'য়ে এসেছে। বাড়িতে যেটুকু করতে হয়, তার জন্যও হাত ময়লা করবার কোন প্রয়োজন নেই। রেকাবী বাসন ধোয়ার জন্যও কল রয়েছে। রান্নার ব্যাপারেও গৃহিণীকে বেশি ভাবতে হয় না, বিজলীর এমনি সুব্যবস্থা যে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ক মিনিট সিদ্ধ হবে, ক মিনিট ভাজা হবে সব যন্ত্রই ঠিক ক'রে নেয়। গিন্নির খালি মনস্থির করা প্রয়োজন। কিন্তু সব সময় সেইটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ। এক আমেরিকান তরুণীর কাছে গল্প শুনেছি যে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বান্ধবীকে রান্নাঘরের সমস্ত যন্ত্রপাতির বর্ণনা দিয়ে শেষে ক্লান্ত হ'য়ে বললেন যে,—চল, এবার হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসা যাক! আমেরিকায় বহু নরনারীই বাড়িতে রান্নাবান্না ক'রে যতবার খায়, হোটেলে রেস্তরাতে নগদ পয়সায় তৈরী খাবার খায় তার চেয়ে বেশি।

বিরাট দেশের বিচিত্র মানুষের পুরোপুরি পরিচয় দেওয়া সহজ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে তার নিজের সুখ দুঃখ যে ব্যাকুলতা নিয়ে আসে, অন্য লোকে তাকে কেমন ক'রে বুঝবে? স্বদেশের লোককেই যেখানে সহজে বোঝা যায় না, সাধারণভাবে কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তির প্রতি অবিচার করবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে ভিন্ন দেশের নরনারীর সম্বন্ধে সাধারণ-ভাবে কথা বলায় যে ভুলভ্রান্তির অবকাশ কত বেশি, তা সহজেই বোঝা যায়। আমেরিকা সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছি, তার নমুনা সে দেশে নিশ্চয়ই মিলবে। কিন্তু খুঁজে দেখলে তার ব্যতিক্রম পেতেও মুস্কিল হবে না। আর কত কথা যে না-বলা রয়ে গেল, তার হিসাব কে দেবে? তাই শেষ কথা এই বলতে চাই যে নতুন পৃথিবীতে আজ সেখানে যে নতুন দেশ গড়ে উঠেছে, তার প্রাণপ্রাচুর্যকে স্বীকার ক'রে যদি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে তাকে বুঝতে চাই, তবে তাতে আমাদের এবং তাদের উভয়েরই লাভ। আমেরিকাবাসীর সহৃদয়তা ও অতিথিবাৎসল্যের কথা আগেও বলেছি। সে আতিথ্য ও সহৃদয়তা কেবলমাত্র মানুষের জন্য নয়, বিভিন্ন ভাবনা চিন্তাকেও তারা সমান আগ্রহে বরণ করে। বস্তুতপক্ষে তারা সর্বদা যেভাবে নিজেদের সমালোচনা করে, অন্যের মুখে নিজেদের সমালোচনা শুনতে চায়, তার পরিচয় অন্যত্র এত ব্যাপকভাবে মেলে না। ব্যক্তি ও সমাজের কিসে উন্নতি হয়, কিভাবে বস্তু ও চিন্তার জগতে প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা যায়, সে ভাবনা আমেরিকায় অতি স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। অন্যদেশের মানুষ বোধ হয় এসব বিষয়ে খানিকটা চাপা, আমেরিকার মানুষ আজো তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে উচ্ছল ব'লে ঢাকাঢাকির কথা তাদের মনেই আসে না। বক্তৃতা করতে এবং বক্তৃতা শুনতে, আলোচনার ব্যবস্থা করতে ও আলোচনায় যোগ দিতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত। কাউকে নিমন্ত্রণ করা হলো, খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে না হতে কেউ ব'লে বসবে যে অতিথি-অভ্যাগত স্বদেশ বা আমেরিকা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলুন। দু'চার কথা কিন্তু দু' মিনিটে শেষ হ'য়ে যায় না, কথার জের শেষে দীর্ঘ হ'য়ে যায়—আমার

এ চিঠিগুলি যেমন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় দীর্ঘ হ'য়ে পড়েছে।

সব দেশের মানুষে মানুষে মিলের অংশই বেশি। পার্থক্যগুলি ভৌগোলিক ঐতিহাসিক সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণের ফলেই প্রকট হ'য়ে ওঠে। আমেরিকার বহু জিনিস প্রথম দৃষ্টিতে বিচিত্র বা কোন কোন ক্ষেত্রে বিসদৃশও লেগেছে। নতুনের ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে সময়ও লেগেছে। কিন্তু যেখানেই আমরিকাবাসীর সঙ্গে ভালোভাবে পরিচয়লাভের সুযোগ পেয়েছি, তাদের প্রাণপ্রাচুর্য তাদের যৌবন-উচ্ছলতা, তাদের সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাদের গুণগুলি যৌবনের গুণ, তাদের যা দোষ-ত্রুটি সেগুলিও প্রধানত যৌবনধর্মের দোষ। পৃথিবীর কাছে তারা অনেক পেয়েছে, সমস্ত মহাদেশের সমস্ত জাতির ঐতিহ্যের তারা উত্তরাধিকারী। প্রকৃতিও তাদের বিপুল ঐশ্বর্য দিয়েছে। পৃথিবী তাই প্রত্যাশা করে যে বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার ও প্রকৃতির বিরাট দানের প্রতিদানে তারাও একদিন বিশ্বমানবকে বিরাট দান এনে দেবে।

চীনে লণ্ঠন

লীলা মজুমদার

আগ্রা থেকে মল্লিকার মা লিখেছেন, ".....ওখানে তোমার না থাকাই ভালো। মিমির আর যাই গুণ থাকুক না কেন, বিনুদিদিদের কাছে যেরকম শুনলাম, নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদটিই সে হারিয়েছে। তুমি পত্রপাঠ অন্য কোথাও ব্যবস্থা করে উঠে যাবে।" তারপর চিঠির নীচে পুনশ্চ লিখেছেন, "মনের উদ্বেগে আসল কথাই লিখতে ভুলে যাচ্ছিলাম। এতদিনে পলাশ কলকাতায় গিয়েছে। ওর সেই বন্ধু শম্ভু সরকারের বাড়ীতে উঠেছে, টালীগঞ্জের ওদিকে তুমি আর সেখানে দেখা করতে যেও না যেন। শুনেছি যে লোকটি সুবিধের নয়, থিয়েটার দেখে, ঘোড়দৌড়ে যায়। তাছাড়া কলকাতার বাঙালী সমাজ এখানকার মতো নয়, একটু বুঝেসুঝে চলতে হয়। P.T.O."

পাতা উল্টোতে হলো, মার আদৎ চিঠির চাইতে পুনশ্চটি সর্বদাই বড় হয়। মনোরমও হয়।

"কলকাতার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তো এতকাল পলাশের চেনাজানার কোনো উপায় ছিল না, হয়তো গোড়ায় খানিকটা মন খারাপ লাগতে পারে, তাই একটু খোঁজখবর নেবার চেষ্টা কোরো। আর অধিক কি লিখব, পত্রপাঠ তোমার থাকার অন্য ব্যবস্থা করবো।" মিমিদি মাটিতে উবু হ'য়ে বসে বেড়ালদের দুধ রুটি খাওয়াচ্ছিলেন, গোড়ালি-তোলা চটি থেকে পা দুখানি একটু সরে গেছে, পাড়হীন ফিকে গোলাপী ভয়েল আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, ঘাড়ের কাছে আধ-পাকা কোঁকড়া চুলের গুছি বাতাসে নড়ছে। মল্লিকা সেইদিকে চেয়ে রইল।

সোমনাথবাবু খবরের কাগজ নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কিছু হয়েছে, না, মল্লিকা? তাই শুনে মিমিদিও উঠে এলেন, এখনো দৈনন্দিন প্রসাধন হয়নি, মুখখানিকে বাসী গোলাপের মতো লাগছে।

কোনো খারাপ খবর নয়তো, মল্লিকা?

মল্লিকা মাথা নেড়ে বললে,—না মিমিদি, মা লিখেছেন পলাশ আসছে কোলকাতায়।

সোমনাথবাবু হেসে বললেন,—সেতো ভালো খবর, মল্লিকা। জ্যাঠার অত সম্পত্তি পেলো, এবার লেগে যাও।

মল্লিকা নিরুত্তর। মিমিদি কাছে এসে বসেন,—আরো আছে, না, মল্লিকা?

নিতান্ত গোপনীয় যা' তাকেও মল্লিকা গোপন রাখতে পারে না। মনের কথাগুলি চারিদিকে উছলিয়ে উঠে। চিঠিখানি মিমিদির হাতে ধরে দিলে। চিঠি পড়ে মিমিদি অন্যমনস্ক ভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। গঙ্গার ধারের সরু পথটা এঁকে বেঁকে রামকৃষ্ণপুরের ঘাটের দিকে চলে গেছে, মোড়ের মাথায় বাবলা গাছের হলদে ফুল ঝরে মাটিতে পড়ছে।

সোমনাথবাবু কাগজ নামিয়ে মিমিদির হাত থেকে চিঠিখানি নিয়ে পড়লেন। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রেখে বললেন,—এ তোমার মায়ের কি রকম অবুঝের মত কথা, মল্লিকা? ওর জলজ্যান্ত একটা স্বামী থাকতে কি করে ওকে আমি বিয়ে করতে পারি তুমিই বলো সে ব্যাটা কিছুতেই মরবে না। মিমি, আর একটু কফি দেবে নাকি?

ঐখানেই যেন কথাটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল এইরকম ভাবে সোমনাথবাবু কাগজটা আবার তুলে নিলেন। তবু মিমিদিকে এমনিভাবে বসে থাকতে দেখে মল্লিকাই উঠে গিয়ে কফি ঢেলে দিল। সোমনাথবাবু আবার কাগজটা নামালেন।

মল্লিকা বললে,—আমি এইখানেই থাকব মিমিদি।

সোমনাথবাবু ডাকলেন,—মিমি।

মিমিদের মন আবার কুলায়ে ফিরে এল। ঘোরানো সিঁড়ির উপরকার জায়গাটিতে চাপা গুঞ্জন শোনা যায়, রোজকার মত আজো সব ওষুধ নিতে এসেছে।

মিমিদি বলেন,—আজ তোরা যা, আমার ওষুধের বাক্স খালি হয়ে গেছে, দুদিন বাদে আসিস।

তারা কিছুতেই যাবে না, পেটে ব্যথা, কানে ব্যথা, সে-সবতো আর কবে ওষুধ আসবে বলে বসে থাকবে না। যা ওষুধ আছে তাই থেকে দিয়ে দিন বড়দি।

শ্যামলী সব চাইতে অবুঝ, কাঁচপোকার টিপ পরে সবুজ জোলার শাড়ি পরে, সেজে-গুজে তৈরী হয়ে এসেছে, সে ছাড়বে কেন?—তা বললে তো হবে না, বড়দিদি, কাল থেকে আমার কান কটকট করছে, সারাটা রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারলুম না; এখন ও বললে তো হবে না। দাও তোমার চুনের জলই একটু দাও না হয়, মাছের নৌকোয় বেরুব এখুনি।

মল্লিকা রেগে যায়।—কান-ব্যথা নিয়েও তোকে মাছের নৌকোয় বেরুতে হবে। ঐ লক্ষ্মীছাড়াটাও যাচ্ছে নিশ্চয়? ভালো চাস তো বাড়ি ফিরে কানে নুনের পুঁটলীর সেঁক দেগে যা। ও যেখানে যাবে তোকেও সেখানে যেতে হবে, এ আবার কি রকম আদেখলেপনা বল দিকিনি।

শ্যামলী বলে,—তুমি আর বকাবকি কোরো না দিদি। আমি নৌকোয় না গেলে ওদের ভাত রেঁধে দেবে কে? যাক বড়দিদি, আমি গেলুম। রাগ করে শ্যামলী চলে যায়। বাকীরা কিন্তু সিঁড়ির মাথায় ভীড় করে থাকে, হাতে বাটি, ট্যাঁকে ছেলে। যা হয় একটা ওষুধ তাদের দিতেই হয়। সোমনাথবাবু এতক্ষণ পরে আবার কথা বলেন,—আমার জোয়ানের জলের শিশিটি খালি করে ছাড়লে, মিমি? বরং আমার সঙ্গে তোমার ওষুধের বাক্সটা দিও, যাবার পথে দোকানে দিয়ে যাব।

প্রতিদিন এমনি ধারা হয়, ওরাও ওষুধ নিতে আসে, শ্যামলী মোহনের নৌকো ধরে, সোমনাথবাবু খবরের কাগজে প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি পড়েন, কফির পাত্র ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শুধু পলাশের আগমনের খবর রোজ আসে না। মল্লিকা চেয়ে দেখে, গঙ্গার জল সকালবেলার রোদে ঝিলমিল ঝলমল করছে, জোয়ার এসেছে, নদীতে কানায় কানায় জল।

—সত্যি তুমি থাকবে মল্লিকা?

—থাকব, মিমিদি, থাকব।

—তোমার মা যে লিখেছেন।

—মো তো কত কি লেখেন।

—কথাটা কিন্তু সত্যি?

—তা হোক? মল্লিকা উঠে মিমিদিকে একটু আদর করে স্নান করতে চলে যায়, দশটা না বাজতেই আপিশের দরজা খোলে।

—কখন ফিরবে?

—দেরী হবে, মিমিদি, রাত্রে, মিনামাসিমা নেমন্তন্ন করেছেন, রাঙা দিদিমণির জন্মদিন। ওখান থেকেই চলে যায়। তাই শুনে মিমিদিও ছলছলিয়ে ওঠেন,—বাঃ বেশ তো? কি দেবে ওকে? কি করবে তুমি, মল্লিকা? আমার আপন মুক্তোর মালাটা নিও, কেমন? কিন্তু অত রাত্রে ফিরবে কি করে? ওরা পৌঁছে দেবেন তো?

মিমিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাওয়া যায়?

দুই

সন্ধ্যাবেলা মিনামাসিমাদের বাড়িতে অন্য রকম হাওয়া বয়। রুমাকে প্রথমে দেখা যায় না। মল্লিকা ভাবলে, রুমার কখনো ভুল হয় না। ঠিক কোন মুহূর্তটিতে দেখা দিতে হয়, বাগানের সিঁড়ির মাথায়, উঁচু বারান্দার বড় আলোর নিচে কেমন করে এসে দাঁড়াতে হয় সবই রুমার জানা আছে।

বাগানের এক ধারে কৃষ্ণচূড়ার দীর্ঘ পল্লবিত ঘন ছায়ার অন্তরালে দাঁড়িয়ে মল্লিকা দেখলে রুমার সর্বাঙ্গ থেকে মাধুরী ঝরে পড়ছে। কোঁকড়া চুলের রাশি থেকে, ধনুকের মতো বাঁকা ভুরু থেকে, পদ্মপলাশ চোখ থেকে, রাঙা ঠোঁট দুটি থেকে—প্রকৃতি যাকে বিনা সাহায্যে অতখানি রাঙা করতে পারত না। দীর্ঘ দেহলতার প্রত্যেকটি বঙ্কিম রেখা থেকে, চাঁপা ফুলের মতো হাত দুখানি থেকে, গলার মুক্তোর ছড়া থেকে, কানের দুটি হীরে থেকে, সমুদ্রের ফেনার মতো শাদা সিফনের শাড়ি থেকে, ফুলের মতো দুটি চরণ থেকে—সবখান থেকে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মল্লিকা ভাবলে, কি করে মানুষ এত সুন্দর হয়। একজনার এত রূপ, এত গুণ, বাপের এত টাকা কেন থাকে?

কার সঙ্গে যেন রুমা কথা বলছিল, কি বলছিল, শোনা যাচ্ছিল না, শুধু ভাঙা ভাঙা টুকরো বাতাসে ভেসে আসছিল, কি মধুর সে কথা, কি মিষ্টি সে স্বর। এমন স্বরকে মর্মরধ্বনি বলা চলে। এরকম মানুষকে কখনো হিংসে করা যায়? হিংসা হয় সমানে সমানে, যেমন যুদ্ধও হয় সমানে সমানে, যেখানে তুলনা করার কথা উঠতে পারে। কি আছে মল্লিকার যে হিংসে করবে? কিংবা যুদ্ধ করবে? ওর রূপ দেখে মল্লিকার চিত্ত আপনা থেকেই অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ফেলে। রুমাকে ওর ভালো লাগে। পার্থিব অপার্থিব যে সমস্ত সম্পদে মল্লিকা বঞ্চিত সে সবই রুমার আছে। রুমার জন্য মল্লিকার ভয় হয়, মায়া হয়। হারাবার মতো এত ধন রুমার আছে, ছিনিয়ে নেবার মতো এত সঙ্ঘ আছে।

সিঁড়ির মাথায় নিয়ন্ বাতি, তার তলায় দাঁড়িয়ে রুমা। পলাশ এসেই তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। মল্লিকার চোখের সামনে। আগেও মল্লিকা জানত যে এমনি করেই দেখবামাত্র ভালবাসা যায়, এমনি করেই একটা প্রবল প্রেমের স্রোত এসে, সারা জীবন ধরে তিলে তিলে জমানো আর সব ভালবাসাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জানত সবই, তবে চোখের সামনে ঘটতে কখনো দেখেনি। পলাশকে কখনো কারও সঙ্গে প্রেমে পড়তে দেখেনি। পলাশ যে আবার হঠাৎ কাউকে ভালবেসে ফেলতে পারে, একথা কখনো মনেও হয়নি।

আগ্রার ছেলে পলাশ, মল্লিকাদের প্রতিবেশী। আগ্রায় জন্ম, সেখানেই মানুষ। দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ ঘুরে এসেছে, কিন্তু ওর দাদামশাই কখনো ওকে কোলকাতায় আসতে দেননি। মাথায় লম্বা চুলগুলি ঢেউ-খেলানো, গায়ের রং শামলা। একটু রুক্ষ, একটু রূঢ়, একটু সাদাসিধে, কলকাতার ছেলেদের মতো নয় মল্লিকার বন্ধু পলাশ। চোখের কোলে, ঠোঁটের

কোণে কেমন একটা অসহায় ভাব, মায়া লাগে।

মিনামাসিমা কাছেই কোথাও ছিলেন, চিলের মতো মিনামাসিমা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ধারালো ঠোঁট। গলার স্বরটি কানের মধ্যে ঝনঝন করে।—তুমিই নাকি পলাশ! রাণার ছেলে পলাশ! রুমা, এই দেখ পলাশ। রুমা আমার মেয়ে, পলাশ।

এতক্ষণ পরে রুমা পলাশের দিকে চাইলো। রুমার চোখ দুটির গড়ন মাছের মতো, কোণা দুটি টানাটানা, ঈষৎ বাঁকানো, সোয়ালো পাখির ল্যাজের মতো। মল্লিকা অবশ্যি সোয়ালো পাখি দেখেনি, কিন্তু চোখে দেখা কোনো জিনিসের সঙ্গেই রুমার চোখের তুলনা হয় না।

রুমাকে কি বলবে পলাশ? মল্লিকা ব্যাকুল হয়ে উঠে, পলাশের নিশ্চয় গলা শুকিয়ে গেছে, মুখে কথা সরছে না। ততক্ষণে মিনামাসীমার কথা শুনে আরো পাঁচজন এসে জুটেছেন, সিঁড়ির মাথায় আধবয়সী পাখিদের যেন হাট বসেছে। কোথায় রাণার ছেলে পলাশ? যাকে ছাব্বিশ বছর ধরে গোকুল চাটুয্যে এমনি করেই লুকিয়ে রেখেছিল যে কেউ তার নাগাল পায়নি!

মল্লিকা হোলে হকচকিয়ে যেত। পলাশ ধীরে ধীরে চোখ ফিরিয়ে, তাদের সবাইকে এক পলক দেখে নিল। তারপর আবার রুমার দিকে চাইল। রুমার ভুরু দুটিও সোয়ালো পাখির ডানার মতো। এবার মল্লিকার মনে পড়ল মিমিদির ঘরের দেয়ালে ঝোলানো জাপানী শিল্পীর আঁকা সোয়ালো পাখির ছবির সঙ্গে রুমার সাদৃশ্য আছে। সোয়ালো পাখির ডানার মতো ভুরু কপালে তুলে রুমা পলাশকে বললে,—তোমার বিষয় শুনতে আমার ভালো লাগে, তোমার কথা বলো। কি করে রাগ করবে মল্লিকা? মল্লিকা যদি পলাশ হতো, সে-ও রুমার সঙ্গে প্রেমে পড়ত। মল্লিকা আর পলাশ ছোটবেলা থেকে একই কথায় হেসে কেঁদে এসেছে। চার বছরের বড় পলাশ; মল্লিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনে পড়লো বহুকাল আগে আগ্রায় যখন মল্লিকার দাঁত তোলা হয়েছিল, পলাশ এমনি কাঁদাকাটি লাগিয়েছিল যে বুড়ো ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ভুল করে ওরই দাঁতের গোড়ায় লবঙ্গের তেল লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

রাঙা দিদিমণিও এলেন; কালের গতির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন তিনি, কোন কিছু থেকে বাদ পড়তে চান না। কি রূপ রাঙা দিদিমণির; বিরাশী বছর বয়স, তবুও রূপ আর ধরে না। তাঁরের মতো সোজা দেহ, বিদ্যুতের মতো দৃষ্টি। মিনামাসিমার মা। এত বয়সেও সখের আর অন্ত নেই। বসন্তকালে দার্জিলিং-এ যে আইরিস ফুল ফোটে, সেইরকম লঘু, সেইরকম শুভ্র, একটুখানি বাতাসের দোলা লাগলে সেইরকম দুলে ওঠেন। ধারালো ছুরির মতো কথা।

—দেখি, দেখি, তোরা একটু সর্ দিকিনি, রাণার বৌ সীমা কেমনধারা ছেলে পয়দা করেছিল দেখি।

রাঙা দিদিমণি পলাশের সামনে এসে দাঁড়ান। এককালে দীর্ঘাঙ্গী ব'লে খ্যাতি ছিল, এখন মাথাটি পড়ে পলাশের বুকের উপর। কি একটা সুগন্ধ পলাশের নাকে আসে, কি একটা অশান্তি পলাশের মনের মধ্যে জমতে থাকে। বিরাশী বছরের এমন মেয়ে পলাশ কখনো চোখে দেখেনি। সর্বাঙ্গে জড়ানো কোমল সাদা রেশমী কাপড়, কোথাও কোন অলঙ্কারের বালাই নেই, হাতে শুধু একটি বিশাল হাঁরের আংটি, ভয় হয় তারই ভারে আঙুলটি ভেঙে না যায়। গায়ের রঙ হাতির দাঁতের মতো কোমল মসৃণ সুন্দর। পলাশের সেকেলে মন এই বয়সে এমন এক ডালি নিরলঙ্কার রূপের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু খুঁজে

বেড়ায়, আংটির হাঁরেতে নিয়ন্ আলো পড়ে, চোখে ঝলসে যায়, স্পষ্ট ক'রে কিছু ঠাহর হয় না।

রাঙা দিদিমণি বলেন,—দেখি, পলাশ, তোমার মুখখানি দেখি। রাণা আমার রূপসী মিনার দিকে ফিরেও তাকায়নি। কালো মেয়ে বিয়ে ক'রে শুনি নাকি পরম সুখে দশটা বছর কাটিয়েছিল। মরেছিলও একসঙ্গে।

রাঙা দিদিমণি বেশিক্ষণ একদিকে তাকাতে পারেন না, পাখির মতো চোখ দুখানি চারিদিকে উড়ে বেড়ায়। এক বিষয়ে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারেন না। অস্থিরভাবে বাগানের আধো অন্ধকারে কি যেন খোঁজেন। ডাক দিয়ে বলেন, ও কে ও ছায়ায় দাঁড়িয়ে? মল্লিকা না? ইঁদিকে আয় মল্লিকা, গোকুল চাটুয্যের লুকোনো নাতিকে দেখে যা।

কাছে এসে মল্লিকা বলে,—ওকে আমি খুব চিনি যে রাঙা দিদিমণি, আগ্রায় আমরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি।

মল্লিকা ফিকে নীল মাদ্রাজি সাড়ি পরে রুমার পাশে দাঁড়ায়। জন্ম থেকে মল্লিকাকে জানে পলাশ, রুমার সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখবার কথা মনেও হয় না। পলাশের বন্ধু মল্লিকা, নারী নয়। তাকে দেখে পলাশ ভারী খুশি হয়।

—আরে, তুমি আবার কখন এলে? অকূল পাথারে কূল পেলাম, মল্লিকা, কত লোককে যে আমি চিনি না তাই ভেবে অবাক লাগে! এখানে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে সে কথা মনেই ছিল না।

মল্লিকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে,—তা ছাড়া আরো সব মনে ছিল না নিশ্চয়ই। আজ রাঙা দিদিমণির জন্মদিন, উপহার এনেছ?

তাই তো। পলাশ খানিকটা অপ্রস্তুত হ'য়ে যায়।—তুমি কী এনেছ?

মল্লিকার হাতে ছোট গোল খোলা সবুজ রঙের শিশি, তার সোনালি মুখের চারিদিকে বেগুনী রঙের রেশমী ফিতে বাঁধা।

—কি আছে ওতে?

—ল্যাভেণ্ডার।

—কি হবে তাই দিয়ে?

—কিছু না। ভালোবাসার মানুষদের কাজের জিনিষ না দিয়ে বাজে জিনিষ দিতে হয় তাও জান না?

তাই শুনে পলাশ আরো খুশি হয়।—বাঃ, বেশ তো। ওর অর্ধেকটা তাহ'লে আমি দিলাম।

মল্লিকার অন্তরঙ্গ বন্ধু পলাশ।

আর কারো দিকে বেশিক্ষণ নজর দিলে রাঙা দিদিমণির সহ্য হয় না। বেশি বয়স হ'লে সুখী সুন্দরী মেয়েরা কিশোরী কুমারীদের মতো হ'য়ে যায়। তেমনি কথায় কথায় মান অভিমান, ছলা-কলা, তেমনি একটা অনায়াত মাধুরী। তেমনি হৃদয়ের দাবী।

মল্লিকা সবুজ শিশিটা তাঁর হাতে দেয়। গালে একটা হাল্কা চুমো খায়। সত্যই আইরিস্ ফুলের মতো, শুভ্র, সুকোমল, সৌরভময়, যেন এখুনি বাতাসে উড়ে যাবে।

রাঙা দিদিমণি পলাশকেও ছাড়েন না, সেও তাঁর গালে চুমো খেতে বাধ্য হয়। ঘেমে নেয়ে ওঠে পলাশ, কান দুটি লাল হ'য়ে ওঠে। আগ্রায় ওদের বাড়িতে কেউ কাকেও অন্তত প্রকাশ্যে চুমো খায় না। কোনরকম সাহেবিয়ানা সেখানে ঘেঁষতে পায় না। টেবিলে চা

দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ভাত খায় ওরা মাটিতে পিঁড়েয় বসে।

শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো শান্ত রুমা। মাথায় কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ, সাদা সিফনের সাড়ির একটি ভাঁজ ইদিক-উদিক হয় না। যেমনটি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, পাঁচ ঘণ্টা পরেও ঠিক তেমনটি ফিরে আসে। এ কেমন ক'রে সম্ভব হয় মল্লিকা ভেবে পায় না। এক ঘণ্টা না যেতেই মল্লিকার কানের কাছের চুলগুলি ছাড়া পায়, সাড়ি লাট হ'য়ে যায়, নাক চকচক করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রুমা কোন কথা না ব'লে, নিজের মহিমায় বিরাজ করে; দেখে মল্লিকার শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু মল্লিকা নিজে পাঁচরকমের অবান্তর কথা ব'লে কান ঝালাপালা ক'রে দেয়। তবে আজ অন্যে আগে কথা না বললে মল্লিকা কথা বলে না। পলাশ এক আধবার আড় চোখে তার দিকে চাইল, ওর আবার কি হলো!

রাঙা দিদিমণি রাত জাগতে পারেন না। হেসে বলেন,—চিরদিন এমনধারা ছিলাম না। বুড়ো মহারানী ম'লে পর এড্‌ওয়ার্ড যেদিন রাজা হলো সেদিন কি ধুমধাম। সবাই একরকম আশাই ছেড়ে দিয়েছিল কি না। তা সারাটা রাত আমাদের এই বাড়িতেই কেউ ঘুমালো না। এই বাগানের প্রত্যেকটা গাছের ডালে হাজার হাজার চীনে লণ্ঠন ঝোলানো হলো, তার কি বাহার! ঐ কোণাটাতে একটা জাপানী চেরিগাছ ছিল, কেউ লাগায়নি, আপনি হয়েছিল—পাখিতে নিয়ে বিচি না ফেললে ও গাছ হয় না জানো—এখন মরে গেছে গাছটা—কি আশ্চর্য, চেরিগাছটা কবে মরে গেল তা-ও লক্ষ্য করলাম না—কোথায় তলিয়ে গেল রাঙা দিদিমণি।

মল্লিকা বলে,—তারপর কি হয়েছিল সেদিন, বলো।

—ও হ্যাঁ, ভোর অবধি গান-বাজনা হয়েছিল। চা আর মাফিন খেয়ে সব বাড়ি গেছিল—মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা—জানিস্ পাঁচরকমের আইসক্রীমই হয়েছিল, পাঁচ রঙের, তোদের বরফপেটির ইঁট-জমানো আইসক্রীম নয়, সত্যিকার ননীর মতো নরম, তার স্বাদ আমার মুখে লেগে আছে—তোরা সে সব—

—বলো, তারপর কি হয়েছিল?

—তারপর শেষরাত্রে চীনে লণ্ঠনের ভিতরকার মোমবাতিগুলো পুড়ে পুড়ে নিভে গেল, কতকগুলোতে আগুন ধরে গেল। আমাদের বেঁটে হিমালয়ান ঝাউগাছের ঝুলগুলো পাতা ঝলসে গেল—আমার শাশুড়ীর সে কি রাগ!

রাঙা দিদিমণি একবার গল্প শুরু করলে আর কিছুতেই থামতে পারেন না। মুহূর্তের মধ্যে একটা বিশাল জটিল অতীতকাল, তার সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁকে গ্রাস ক'রে ফেলে। মিনামাসিমা বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন,—তোমার গল্প কি আর কখনো থামবে না, মা? চলো, খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।

তৎক্ষণে রাঙা দিদিমণি বর্তমানের খেই হারিয়ে ফেলেছেন, অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকান। পলাশ এগিয়ে এসে তাঁর কনুই-এর নীচে আস্তে একটা হাত রেখে বলে,—চলুন। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আবার শান্ত হ'য়ে আসে, ছোট একটা ঝড়ে-ওড়া পাখির মতো রাঙা দিদিমণির হাতখানি পলাশের বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয় খোঁজে।

নিদারুণ মমতায় মল্লিকার বুক ভরে যায়। পনেরো বছর আগে রাঙা দিদিমণির মরে যাওয়া উচিত ছিল। কোন বিষয়েই ওঁর মাত্রাজ্ঞান নেই।

তবু কথা শেষ হয় না, প্রসন্নকণ্ঠে পলাশকে বলেন,—সেইদিনই এই হীরের আংটি দিয়েছিল আমাকে তোমার ঠাকুরদা। না, তোমার ঠাকুরদা নয় পলাশ, ভুল বলছি;

দিয়েছিল মিনার বাবা। তোমার ঠাকুরদা কোনোদিনও কিছু দেয়নি। দেয় তো নি-ই, নেয়ওনি কিছু।

তিন

এতক্ষণে মিমিদিদেরও খাবার সময় হ'য়ে এসেছে। গঙ্গার দিকের বারান্দায় দাঁড়ানো আলোর তলায় সোমনাথবাবু নিশ্চয় কার একটা নতুন বইয়ের প্রুফ দেখছেন, খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে, মিমিদি বারে বারে তাগাদা দিচ্ছেন। ওঁদের বাড়িতে কোনো নিয়মকানুন নেই, খাবার ঘর বসবার ঘর ব'লে আলাদা কিছু নেই, গঙ্গার উপরে দোতলার ঐ বারান্দাটিকেই আশ্রয় ক'রে দিব্যি ওঁদের দিন কেটে যায়। পলাশকে একদিন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনতে হবে। নইলে ওঁরা দুঃখিত হবেন। পরের ব্যাপারে নাক ঢোকাতে পারলেই দু'জনে মহাখুশি। পলাশেরও হয়তো ভালো লাগতে পারে। অন্তত সোমনাথবাবুর পুরোন বই-এর সংগ্রহ দেখতে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

মিনামাসিমাদের কেমন লাগছে পলাশকে? ভারী সাহেবী ধরনধারন এদের। গাছতলায় লম্বা টেবিল পাতা, তার উপর সত্যিকার সাদা ড্যামাস্কের চাদর বিছানো। খাবার ঘরের বিশাল কাঁচের আলমারিতে তিন পুরুষ ধরে জমিয়ে রাখা, খাঁটি রুপোর চাইতেও দামী রুপোর পাতে মোড়া বিশাল সব পাত্র, সত্যিকার স্ফটিকের ফুলদানি, বোহিমিয়ার কাটা-কাঁচের বাসনকোসন মিনামাসিমা আজ বের করেছেন। তিন বাড়ির বাবুর্চিরা এসে সারাদিন মিনামাসিমার তদারকে রাঁধাবাড়া করেছে। গাছের ডালে ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠনের বিজুলি আলোতে টেবিলের সাজসজ্জা ঝলমল করছে।

কিন্তু বসবার জায়গা নেই। অবাক হ'য়ে পলাশ চারিদিকে খোঁজে, কোথাও একটা চেয়ার কিংবা টুল পর্যন্ত নেই। দেখতে দেখতে টেবিল ঘিরে এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো মেয়েরা এসে জোটে। মল্লিকা একটু দূরে একটা নীচু টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের হাতে একটা সোনালি পাড়-দেওয়া প্লেট, একটা রুপোর কাঁটা আর একটা ফুল-কাটা কাগজের রুমাল গুঁজে দেয়।

রাঙা দিদিমণির জন্য কে যেন একটা লাল মখমলের গদী-আঁটা আরামকেদারা এনে দেয়। ছোট একটা ফুলের মতো দেখতে প্লেটে একটুখানি ফল মিষ্টি তুলে, তাঁর কোলের উপর কাগজের রুমাল পেতে, তাতে বসিয়ে দেয়। হাতে ছুরি-কাঁটা ধরিয়ে দেয়। এরা ছুরি-কাঁটা দিয়ে ফল খায়।

পলাশ চারিদিকে বিপন্নভাবে চেয়ে দেখে। তাই তো, পুরুষমানুষও আছে তো, তবে কেমন যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন নিয়ে, মেয়েদের জন্য আসন ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। তাদের সঙ্গে মিনামাসিমা পলাশের আলাপ করিয়ে দেন, এই দেখ, রাণার ছেলে পলাশ। আলাদা ক'রে পলাশ এতজনাকে চিনতে পারে না, তাদের নাম গুলিয়ে যায়।

রাঙা দিদিমণি কিছু খেতে পারেন না, শুধু কাঁটা দিয়ে নাড়াচাড়া করেন, রুমাকে পলাশকে কাছে ডাকেন। পলাশও খেতে পারে না, নিজের হাতে তুলে নিতে লজ্জা করে, যদি পড়ে যায় ভেঙে যায় ভয় করে, এক হাতে প্লেট আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে শুধু একটা কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে খেতে অসুবিধা লাগে। মল্লিকার দিকে বিপন্নভাবে তাকায় পলাশ,

মল্লিকা কাছে আসে না, সাহায্য করে না।

কিন্তু মিনামাসিমাদের কে যেন হয় সব,—রিনি, টিটি, ডলি, মোমোরা চারধারে ভিড় ক'রে আসে। ওদেরও বিশেষ কিছু খেতে দেখা যায় না, শোনা যায় ওদের নানারকম এলার্জি আছে, ডার্লিং কি নিউস্যান্স্, জানো না! কোনো ভালো জিনিষ এন্‌জয় করা যায় না, তারপর কাগজের রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোণা-গড়ানো রঙটুকু যত্ন ক'রে মুছে নিয়ে ওরা আরো বলে, কিন্তু খাওয়াই তো জীবনের একমাত্র আনন্দ নয়, ডার্লিং।

মাংস খেলে কারো দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে আসে, কারো চিংড়িমাছ দেখলেই হাঁপানি ধরে, সব্‌জ তরকারি একটুখানি মুখে দিলেই কারো কান মাথা গরম হ'য়ে ওঠে। এমনিধারা কত কি! বেঁচে থাকলে এর চাইতেও কত বেশি সইতে হয়। মিন-হোয়াইল—

টিটি এসে পলাশের সঙ্গে ভাব করে।—তুমি আসল ব্যাপার কিছুই জানো না, তাই রুমাদের কাছে কাছে থাকছ, ভালো চাও তো চলে এসো আমাদের সঙ্গে।

শুনে পলাশ অবাক মানে।—কেন, ওঁরা আপনাদের আত্মীয় হন না?

মোমো বলে,—তাতে কি হয়েছে? ওরা তিন পুরুষ ধরে তোমাদের পিছু নিয়েছে, এসো, তোমাকে আত্মরক্ষার কায়দাকানুন শিখিয়ে দিই।

ডলি বলে,—তবে কি জানো, একটা সুবিধে হলো ওরা যতই না তোড়জোড় করুক, ঠিক ছাদনাতলা অবধি একবারো ভাগিয়ে আনতে পারেনি!

রিণি বলে,—কিন্তু খবরদার! রুমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে গিয়ে ইতিহাসের ধারা বদলাতে পাবে না। তা ছাড়া, যে দেখে সেই ওর সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায়, তার মধ্যে নতুন কিছু নেই। তার চেয়ে এসো, আমরা অনেক বেশি ইন্‌টারেস্টিং!

পলাশকে ওরা কথা বলবার সুযোগ দেয় না। টিটি অন্যদের ডেকে বলে,—ডার্লিং, এমনি এমনি ঠেকাতে পারবে না, ওকে বরং আমাদের চারুচিত্রকলামন্দিরমে নিয়ে যাই। রুমার কাছ থেকে সরাতে হ'লে তার চাইতে কম জোরালো কিছুতে তো হবে না। যাবে পলাশ, কাল?

মোমো জানতে চাইলে, কখন। টিটি অবাক হ'য়ে বললে,—কখন? বেলা আড়াইটার সময় নিশ্চয়। যখন দুপুর শেষ হ'য়ে গেছে, কিন্তু বিকেল সুরু হয়নি, তখন ছাড়া আবার সময় কখন? শিল্পকলার আবার অন্য কোনো সময় আছে নাকি? যাবে, পলাশ?

আগ্রায় বেলা আড়াইটার সময় পলাশদের বাড়ির মেয়েরা হে'সেল তুলে, হাত-পা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, ঘরে দোর দিয়ে ঘুম লাগায়।

পলাশ বললে,—বেশ যাবো, ব'লে রুমার দিকে তাকায়। মোমো কঠিন স্বরে বলে,—না ও-সব চলবে না। সব সময় রুমা না। বুঝছ না, তোমাকে ওর কাছ থেকে সরাবার জন্যই এত সব ব্যবস্থা হচ্ছে, এখন ওকে সুদ্ধ টেনে আনলে কি ক'রে চলে?

রিণিও বললে,—সব জিনিষের একটা যোগ্যতা অযোগ্যতা আছে তো। তিন পুরুষ ধরে ওরা তোমাদের পিছনে ধাওয়া করেছে। ওদের কাছ থেকে না পালিয়ে উপায় নেই, এইটুকু শিখে রাখো। তোমার ঠাকুরদাও পালিয়েছিলেন, তোমার বাবাও পালিয়ে বেঁচেছিলেন, তুমিও পালাও।

মিনামাসিমা শ্লেট হাতে, শুষ্ক কণ্ঠে বললেন,—ওর বাবা বাঁচেনি, মরেছিল।

রাঙা দিদিমণিও রাগ ক'রে শ্লেট নামিয়ে বলেন,—আমি আর কিছু খাব না। কক্ষণো পালামনি ওর ঠাকুরদা। তার বাবা ভাঁওতা দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কি রূপ ছিল তার!

তারপর পলাশের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন,—তার কপার কণাও পাওনি। টাকা ছাড়া আর কিছুই পাওনি, পলাশ, শুধু টাকাই পেয়েছ অঢেল। অত ঘটা ক'রে যাকে বিয়ে করেছিল, সেই বা কোন্ দিক দিয়ে তার যোগ্য ছিল? যোগ্যতে যোগ্যতে আবার বিয়ে হয় নাকি? মিনার বাবাও মস্ত চাকরি করত, তা ছাড়া আর কী ছিল তার? আর আমাকে সে কি বলতো জানো? বলতো, প্রেমের রাজ্যে আবার যোগ্য অযোগ্য কি! একবার, অনেকদিন পরে—

মিনামাসিমা বললেন,—মা উঠবে? চাঁদ ডুবে যাচ্ছে, চল, শোবে চল।

রাঙা দিদিমণির চোখের দৃষ্টি কোনো নিশানা খুঁজে পায় না, কি যেন খোঁজে কিন্তু দিশা পায় না। মিনামাসিমা তাঁকে ধরে নিয়ে যান।

মাঝরাতে সবাই সবার কাছে বিদায় নেয়। মল্লিকা পলাশ শহরের দুই প্রান্তে থাকে, মিনামাসিমাদের গাড়ি দুজনাকেই নামিয়ে দেয়।

—আমি আগে নামি, মল্লিকা, তাহলে অনেকক্ষণ গল্প করা যাবে। পলাশ ওকে জেরা করে।—রুমার কথা তো আগ্রায় কখনো বলোনি, মল্লিকা? আচ্ছা, মল্লিকা, ঐ ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েদের কারো বিয়ে হয়নি?

—হয়েছে বই কি, কতকের হয়েছে, কতকের হয়নি, টিটির দু'-দু'বার বিয়ে হয়েছে।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য আবার কি? কপালে বিয়ে-হওয়া সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে না বেড়ালে বিয়ে হয় না নাকি? তুমি বড় সেকেলে পলাশ।

সেকেলে তো আমি বরাবর-ই মল্লিকা, দেখ না, আমাদের বাড়িটাই কেমন সেকেলে। নিজেদের স্বামীদের সঙ্গেই মেয়েরা বেরোয় না।

—নিজেদের স্বামীদের সঙ্গে এরাও অনেকে বেরোয় না।

পলাশ ভারী অবাক হয়। মল্লিকার কথায় কি একটু ঝাঁজ শোনা যায়? কি জানি। তবু জিজ্ঞাসা না ক'রে পারে না।—আচ্ছা গাছতলার ঐ সাদা-কালো পোষাক-পরারাই বোধ হয় ওদের স্বামীরা? ওরা ওদের কিছু বলে না?

মল্লিকা আস্তে আস্তে পলাশের দিকে ফিরে বসে।—কিসের জন্য বলবে, পলাশ? তোমার গোঁড়া হিন্দুবাড়িতে তৈরি মন, তাই দোষ দেখছ।

—দোষ দেখছি কোথায়? এরকম আগে কখনো দেখিনি, তাই আশ্চর্য লাগছে। আচ্ছা, ওদের জামার পিঠে সব তিনকোণা চারকোণা জানলা কাটা দেখেছ?

মল্লিকার হাসি পায়।—তাহ'লে কাল ওদের চারুচিত্রকলামন্দিরমে গিয়ে কিছু কিছু শিখে এসো। দুচারবার যাবার পর আর অবাক লাগবে না। বিলিতী ফ্যাশানে দিশী শিল্পকলা কত যে মনোরম হয়, তাই প্রমাণ ক'রে দেবে। নিশ্চয় যেও, পলাশ।

অন্ধকারে পলাশ মল্লিকার মুখখানি দেখতে চেষ্টা করে। ওকে কেমন অন্য রকম লাগে। চিরকালের মতো আজ সব কথা খুলে বলতে পারে না, রুমার কথা কণ্ঠের কাছে এসে বেধে যায়, ওর নাম মুখে আনতে পারে না। কিন্তু মল্লিকা নিজে থেকেই বলে,—তুমি কাল নিভ'য়ে ওদের সঙ্গে যেও। রুমা আর আমি আলাদা গিয়ে মজা দেখব। রক্ষী দরকার হ'লে একটা ডাক দিও। কাল আমার ছুটি আছে। রুমাকে তোমার ভালো লেগেছে, না পলাশ?

পলাশের বন্ধু মল্লিকা, না বললেও মনের কথা বুঝতে পারে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস

ফেলে পলাশ বলে,—মানুষ যে এমন সুন্দর হ'তে পারে, এ আমার ধারণাই ছিলো না, মল্লিকা। ওকে দেখে আমার কথা ফুরিয়ে গেল, জানো? কি যে বলব ভেবেই পেলাম না। আচ্ছা মল্লিকা, ঐ মোমোরা কি বলছিল? আমার বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে ওদের কি সম্বন্ধ?

মল্লিকা এবার অবাক হয়।—এসব পুরোনো কাহিনী, পলাশ। মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছি, কোনো রসের কথা সেখানে উঠোন পার হ'য়ে অন্দরমহল অবধি পৌঁছায় না। মোট কথা রাঙা দিদিমণি আর তোমার ঠাকুরদা প্রেমে পড়েছিলেন, পাকে-চক্রে বিয়ে হয়নি। তারপর মিনামাসিমা আর তোমার বাবা প্রেমে পড়েছিলেন, আবার পাকেচক্রে বিয়ে হয়নি। এখন ওরা বলতে চায় যে তুমিও যেন আবার রুমার সঙ্গে প্রেমে না পড়, কারণ পাকেচক্রে বিয়ে হবে না।

মল্লিকা খুব হাসে। পলাশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে, তাহ'লে ওদের বলে দিও যে আমি যদি রুমার সঙ্গে প্রেমে পড়ি, এক রুমা ছাড়া আর কেউ বাধা দিতে পারবে না।

শীত শেষ হ'য়ে গেছে, কিন্তু নিঃশব্দ রজনীতে কেমন শীত-শীত বোধ হয়। শিরশির ক'রে একটা নৈশ হাওয়া বয়, কয়েকটা গাছের পাতা খসে পড়ে গাড়ির আলোতে ঘূর্ণি-বাতাসে উড়ে চলে। মল্লিকার ক্লান্ত চোখ তাদের পিছন পিছন ধাওয়া করে। কোথায় যেন পড়েছিল মল্লিকা ডাইনীবুড়ী ঝাঁটা দিয়ে ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে ঝরা পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়। মল্লিকার মনের মাঝে ডাইনীবুড়ীর ঝাঁটা লেগে রাশি রাশি ঝরা পাতা উড়তে থাকে।

—ঘুমোলে, মল্লিকা? পথ বলে দেবে না? অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে পলাশ মল্লিকার হাতে আস্তে একটু ঝাঁকানি দেয়।

মল্লিকা চকিত হ'য়ে ওঠে,—মোড় ছেড়ে এলাম যে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে হবে।

পলাশ বলে,—অন্যরকম হ'য়ে গেছ কেন, মল্লিকা? আমার যে কত কি বলবার ছিল বুঝতে পারছ না?

—কাল বোলো। টিলিরা তোমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, যাতে পথ ভুল না কর। কিন্তু কি জানো, পলাশ, কলকাতা শহরের সব চাইতে বড় হতাশার কারণ হলো এখানে পথ হারানো অসম্ভব। অন্ধকারে একটা অজানা গলির মধ্যে একবার ঢুকে পড়বে, আর দিশা পাবে না, সে এখানে হয় না, পলাশ।

পরীরাও আর আসে না, রামধনুর মাথায় মাটি খুঁড়ে সোনার ঘড়াও বেরোয় না, হারিয়ে যাবারও যো নেই। দিন তাহ'লে কাটে কেমন ক'রে? মিমিদিদের দিন কি ক'রে কাটে? মিমিদি কুড়ি বছর গণ্ডা পার হ'য়ে রামকৃষ্ণপুর থেকে কলকাতায় আসেননি। মল্লিকা বলে,—জানো পলাশ, আমি যাদের সঙ্গে থাকি, তাদের বিয়ে হয়নি। ব'লে পলাশের উত্তরের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে, যেন তার উপর কত কি নির্ভর করছে।

—তাতে কি হয়েছে। বিয়ে-না-হওয়া লোক দিয়েই তো পৃথিবীটা ভর্তি। তোমার আমারো তো বিয়ে হয়নি। আর তুমি দিনে দিনে যেরকম ঝাঁঝালো হ'য়ে উঠছ, তোমার হয়তো হবেও না কোনোকালে।

—না না, তা বলছি না। মিমিদির সঙ্গে সোমনাথবাবুর বিয়ে হয়নি, মা আজ লিখেছেন। আমাকে অন্য জায়গায় চলে যেতে বলেছেন।

—ও, খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পলাশ আবার বললে,—কোথায় যাবে?

—ওখানেই থাকবো। মিমিদিরা নইলে দুঃখিত হবেন, পলাশ।

পলাশ হেসে ফেলে, অমনি মল্লিকার মনটাও হাল্‌কা হ'য়ে যায়।—আসবে একদিন? দারুণ ভালো রান্না হয় ওদের বাড়ির। মিমিদি নিজে জীবনে কখনো খুন্তি ধরেননি, কিন্তু একটা কালো নোটবই দেখে গফুরকে যা ব'লে দেন, সেই খেতে হয় অমৃত। আসবে একদিন? খুব খুশি হবেন।

—নিশ্চয় যাবো।

চার

মিমিদি কিছুতেই কথা শোনেন না, হাতে একটা লেস্-বোনা নিয়ে দাঁড়ানো আলোর নীচে আরামকেদারায় বসে থাকেন। মল্লিকা ফিরলে তবে দরজা বন্ধ ক'রে আলো নিভিয়ে শুতে যান। সে যত রাতই হোক না কেন। মল্লিকার নিজেকে অপরাধী মনে হয়, লজ্জিত হ'য়ে বলে, দরজাতে ইয়েল লক্ লাগানো হয়েছে, কেন তুমি আমার জন্য রাত জাগো?

ভালোবাসার লোকের জন্য রাত জাগার সুখ বুঝিয়ে বলার সাধ্য নেই মিমিদির। মল্লিকা আসতেই উঠে পড়েন, চোখ দুখানি বাতির আলোতে উজ্জ্বল মনে হয়। কে কি পড়েছিল, কে কি বলেছিল, কেমনধারা ব্যবস্থা হয়েছিল খুঁটিয়ে বলতে হয়। মনে হয় মিমিদির চোখের কোণে কালি পড়েছে, কিছু না ক'রে মিমিদি বোধ হয় ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছেন।

কি একটা উপলক্ষ্যে পরদিন মল্লিকার আপিসে ছুটি, তবু একবার যেতে হয়, দু-একটা আলগা সুতো বেঁধে দিয়ে আসতে হয়। বেলা আড়াইটায় রুমার সঙ্গে চারুচিত্রকলামন্দিরমে যাবার কথা। রুমা তখনো তৈরি হয়নি, রুমার কোনো কিছুতে তাড়া নেই। মল্লিকা বুঝতে পারে না। মল্লিকার পায়ে অষ্টপ্রহর চাকা বাঁধা থাকে, মন পাখা মেলে ওড়ে।

রুমা যতক্ষণ সাজসজ্জা করছে, মিনামাসিমা মল্লিকাকে চেপে ধরেন, পলাশদের বাড়ির নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নেন।—ওঃ, এত গোঁড়া ওরা? তোদের সঙ্গে তাহ'লে এত ভাব হ'লো কি ক'রে? তোর সঙ্গে পলাশকে যে বড় মিশতে দেয়? নিন্দা করে না?

মল্লিকা বলে,—মার সঙ্গে পলাশের বড়মামীর গভীর বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব থাকলে অনেক অন্তরায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়, ছোটবেলা থেকে পলাশদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা এদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলো মারপিঠ ক'রে মানুষ হয়েছে, তার মধ্যে নিন্দার অবকাশ কোথায়? একবার কি নিয়ে যেন দু'বাড়ির ছেলেমেয়েদের ঝগড়াঝাঁটি হ'য়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছিল। তিন দিন কথা বন্ধ ছিল। তৃতীয় দিন এ-বাড়ির ছেলেমেয়েরা ও-বাড়িমুখো রওনা হলো, আর ও-বাড়ি ছেলেমেয়েরা এ-বাড়িমুখো রওনা হলো। মাঝপথে খেলার মাঠে—মুখোমুখি দেখা হওয়াতে, আবার একচোট দারুণ ঝগড়াঝাঁটি, কান্নাকাটি হ'য়ে, ভাব হ'য়ে গেল।

ছেলেপিলের ব্যাপার শুনবার মিনামাসিমার সময়ও নেই, ইচ্ছাও নেই। এখনকার কথাই বল্ না। দাদামশাই-এর কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়েছে, শুনেছি, আবার জ্যাঠার সম্পত্তিও পেল। তুই নিশ্চয়ই সব জানিস? শুনেছি, ওর দাদামশাই প্রতিজ্ঞা করেছিলো নাতিকে এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে দেবে না, এখন এত সম্পত্তি পাচ্ছে, তাই বুঝি সেসব প্রতিজ্ঞা ভেঙে-চুরে গেল?

কেন জানি মল্লিকার অসহিষ্ণু লাগে। সংক্ষেপে বলে,—দাদামশাই-র টাকা পায়নি

পলাশ, পেয়েছিল ওর মার নামে লেখা তাঁর মার কাছ থেকে পাওয়া টাকা। কত তা মল্লিকা জানে না, পঞ্চাশ ষাট হাজার হবে, মল্লিকার ঠিক জানা নেই, হ্যাঁ, লাখও হ'তে পারে। প্রতিজ্ঞার কথাও মল্লিকা শোনেনি, তবে বুড়ো গোকুল চাটুয্যে ছিলেন কলকাতার এবং কলকাতার বাসিন্দাদের উপর হাড়ে-চটা, নাতিকে তাই আসতে দিতেন না। তিনিও গত হয়েছেন তিন বছর হলো, এখন বাধা দেবার কেউ নেই। মামারা? হ্যাঁ, মামারা আছেন বটে, তবে তাঁরা অন্য ধরনের মানুষ, নিজেদের ধান্দায় ঘোরেন, পলাশের গতিবিধির উপর তেমন হস্তক্ষেপ করেন না। মামীরা? না, মামীরা লেখাপড়া জানেন না, সেকেলেও বটে, কিন্তু খুব ভালো, পলাশকে খুব ভালোবাসেন।

মিনামাসিমা হতাশ হ'য়ে যান।—তোর কাছ থেকে কোনো কথা বের করাই দায়। পলাশ কি এখন কলকাতাতেই থাকবে? ওর জ্যাঠার নিজের ছেলেপুলেও নেই, আবার বুড়ো গোকুল চাটুজ্যের উপর এক হাত নেবার ইচ্ছেও ছিল বোধ করি, তাই নাকি এই সর্তে বালিগঞ্জের ঐ বাড়িটাড়ি পলাশকে দিয়ে গেছে যে ওকে এখানে এসে বাস করতে হবে। জানিস্ নাকি?

এসব কথা মল্লিকা কিছুই জানে না, শুধু শুনেছে সম্পত্তির অধিকার নিতে হবে, কি সব লেখাপড়া করতে হবে, তাই এসেছে। বন্ধুর বাড়িতে উঠেছে, দু'মাস থাকবার ইচ্ছা।

—ঐ শম্ভু সরকারটি শুনেছি মহা ধড়িবাজ, এত আত্মীয় থাকতে ওখানে কেন উঠেছে?

—একসঙ্গে আগ্রায় পড়ত যে, খুব বন্ধুত্ব ছিল, আর আত্মীয়দের তো চোখেও দেখেনি।

তারপর রুমা এসে পড়ে, কথাবার্তা চাপা পড়ে যায়। কি সুন্দর রুমা, ফিকে ছাই রঙের হাল্কা একটা মেঘের টুকরোর মতো। ছোট একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে মল্লিকা উঠে পড়ে।

চারুচিত্রকলামন্দিরমের সদর দরজার দুই ধারে শক্ত ক'রে চাটাই আঁটা, তাতে গেরিমাটি দিয়ে নক্‌শা তোলা; দোরগোড়ায় ঘট বসানো, তাতে খড়ি দিয়ে সিঁদুর দিয়ে চিত্র করা, গাঁয়ে যেমন হয়। তবে এসব গাঁয়ের লোকের হাতের কাজ নয়, তাদের এখানে আনার নানান ফ্যাচাং, এঁদের নিজেদের শিল্পীরা গাঁয়ে গিয়ে শিখে এসে, নিজেদের হাতে এসব করেছে। খরচাও পড়ে গেছে মেলা, মল্লিকাকে কে যেন বলেছিল, প্রায় হাজারখানেক লেগেছে। তাই নিয়ে হাঙ্গামাও কম হয়নি। কে না জানে একজনার ভালো কাজ দেখলেই আর পাঁচজনের চোখ টাটায়। ঐ সদর দরজার হিসেব মেলানো নিয়ে এত ঝামেলা হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত অমন অভিজ্ঞ পুরোনো সেক্রেটারিটি অপমান বোধ ক'রে পদত্যাগ করলেন। তারপর নতুন সেক্রেটারি এলেন। এখন আবার সুখে শান্তিতে কাজ চলছে। টিলি আরো বললে,—তবে সত্যি কথা বলতে কি এ সেক্রেটারির পায়ের কাছে দাঁড়াবারও যোগ্য ছিল না সে ভদ্রমহিলা। আর এখানকার বেয়ারারা তো অষ্টপ্রহর তার বাড়ির ফাই-ফরমায়েস খাটতেই ব্যস্ত থাকত, এ মহিলাটি ঢের ভালো, শুধু ঐ সুকোমলের উপর একটু নজর আছে, এই যা। তবে সুকোমলও কিছু কাঁচা ছেলে নয়, সাত ঘাটে জল খেয়ে এসেছে।

এমন সাদাসিধে ঘরোয়া ব্যবস্থা দেখে পলাশের ভালো লাগছে না? মাথার উপর কেমন আমপাতার মালা ঝুলছে, একটু শুকিয়ে গেলেও, দেখলেই মনটা ভালো হ'য়ে যায় না?

সত্যি, আমাদের দেশ ছেড়ে কেন যে লোকে বিদেশে যায় আর্টের সন্ধানে? তবে ইয়োরোপের লোকরা কিন্তু একটুও এরকম নয়, তারা আমাদের আর্টের কদর বোঝে। ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা! পলাশ হয় তো জানে না, কিন্তু একদল আমেরিকান শিল্পী এসেছেন—এখুনি এইখানেই আসবার কথাও আছে তাঁদের—তাঁরা হাজার হাজার টাকা খরচ ক'রে কালী-ঘাটের পট, রং-করা পুতুল, মাটির ঘড়া ইত্যাদি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যি, সৌন্দর্যের আদর জানে ওরা। কি একটা জাত। এখন তো আমরাও স্বাধীন হয়েছি, এখন আর সে কথা বলতে বাধা নেই। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় এদেশটা ছেড়ে ওখানে বসবাস করি। ছ্যা, এদেশে মানুষ থাকে? বেঁচে থাকবার একটা কোন ছিরি-ছাঁদ আছে এখানে!

পলাশ ওদের সব কথার খেই ধরতে পারে কি না সে বিষয় কারো কারো যথেষ্ট সন্দেহ থাকে। তবে সে খুশি হ'য়ে বলে,—বাঃ, এই তো আমাদের নিজেদের শিল্পকলা!

মোমো তাই শুনে বললে,—দেখেছ তো আমরা কেমন আধুনিক শিল্পকলার খোসা ছাড়িয়ে ফেলে ভেতরকার সৌন্দর্যের আদিম রূপটাকে টেনে বের ক'রে এনেছি, তাই না অনুরাধা? ওঃ পলাশ, তুমি অনুরাধাকে চেনো না? অনুরাধা একটা জীনিয়াস, পলাশ, ও আমাদের শিল্পের আর সাহিত্যের—বলো না কি লেখো, অনুরাধা, আমি বোঝাতে পারবো না।

অনুরাধা। ছোট্ট পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি, শ্যামলা রঙ, ভ্রমরকৃষ্ণ সোজা সোজা চুলগুলি কপাল থেকে তুলে, কানের উপর দিয়ে উঁচু ক'রে, বাঁকা একটা বিড়ে খোঁপা বেঁধেছে; হাতে-ছাপা রং-চঙা একটা সুতির শাড়ি পরনে; একটি কাঁধ খালি, জামা-টামা কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না; দু'কানে লম্বা রূপোর ঘট দুলছে; দীর্ঘ পল্লবিত চোখ দুটি সুর্মা দিয়ে কান পর্যন্ত টানা। গলার স্বরটি একটু কর্কশ, একটু নাঁচু, কিন্তু কি যে মধুর, একেবারে মর্ম ভেদ ক'রে যায়, অন্তত মোমোদের তো তাই মনে হয়।—কিন্তু, এমন মেয়ের স্বামীটা একটা অসভ্য জানোয়ার, ব্যবসা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না, অনুরাধার লেখা পড়ে হাসে। তুমি পড়নি ওর লেখা, পলাশ?

পলাশ সহানুভূতির স্বরে বললে,—কোন কাগজে লেখেন আপনি, জোগাড় ক'রে পড়বো।

—দিও ডার্লিং, দিও এক কপি। কিন্তু ও যে বাংলায় লিখতে পারে না, পলাশ। এদেশের লোকরা এসব লেখার আদরই জানে না, বোঝেই না কিছু। তবে লণ্ডন থেকে "ক্যামিনিয়ন" ব'লে একটা কাগজ বেরোয়, তারা ওর লেখা পেলে বর্তে যায়। দিও, ডার্লিং, ওকে একবার পড়তে। এসব না পড়লে নিজের দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয়-ই হয় না। জানো, ওর লেখা আমাদের কলামন্দিরমের শিল্পীদের ছবির মতো, ষ্টার্ক, ভিরাইল। আরো কি কি আছে সব আমাদের কাগজে লেখা, পড়ে দেখো।

মোমোকে এত কথা বলতে দেখে ডলির বিরক্ত লাগে, কে না জানে মোমোটা দু'বার চেষ্টা ক'রেও সীনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করতে পারেনি, তবু কথা। একজন একটু পার্সোনেবল পুরুষ দেখলেই হলো। ডলিও এগিয়ে আসে,—হ্যাঁ, আমরা কোনোরকম কৃত্রিমতা দেখতে পারি না পলাশ।—মোমো, আমার নতুন লিপ্‌স্টিকটি দেখ একবারটি—এসো, পলাশ, সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

মোমোর কোমল দু'টি হাতের নখের বেগনী পালিশ ঘরের ভিতরকার বিজলী আলোতে ঝকমক্ করে, পলাশের চোখে ধাঁধা লাগে। মোমোর চোখ দু'টিও হঠাৎ ঝকমক ক'রে ওঠে।

যারা বসেছিল তাদের তিন ভাগের এক ভাগকে পাশ্চাত্যদেশীয় বলে মনে হলো, আরেক

ভাগও ঐ জাতের কি না পলাশের প্রথমটা গোলমাল লাগছিল। শেষে শাড়ি-পরা দেখে তাদের সুরুচিসম্পন্না আধুনিকা বাঙালী মেয়ে ব'লেই ঠাহর হলো। তবে দু'একজনা শাড়ি-পরা মেমও হ'তে পারে, বলা যায় না। একসঙ্গে এত মেম পলাশ জন্মে দেখেনি। ওর ধারণাই ছিল না যে মেমদের দেহের যতটুকু দেখা যায় তারও এক এক জায়গায় এক এক রকম রঙ হয়। ভারী আশ্চর্য তো!

আসল মেমদের অনেকেই সম্ভবত নিজেদেরই হাতে ছাপা এবং নিঃসন্দেহে নিজেদের হাতে তৈরী ঢল্‌কা পোষাক পরেছে, কোমরে একটা ক'রে নক্‌শা-করা চামড়ার বাঁধুনি, পায়ে নানা রঙের বনাতের জুতো, তার তলাটা আবার দড়ি পাকিয়ে তৈরি, মাথার চুলও মনে হলো নিজেরাই কাঁচি দিয়ে ছেঁটে নিয়েছে, নাক-মুখে একফোঁটা পাউডার লেগে নেই, শুধু ঠোঁট দুখানির ঈষৎ বেগনী রংটি অধররেখা ছাপিয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হ'য়ে আছে; মাথায় বেশ উঁচু, গড়নে বলিষ্ঠ। এমন ধারা মেয়ে পলাশ কখনো দেখেনি।

রিনি বললে,—এরা আমাদের চাইতেও আমাদের দেশকে বেশী ভালোবাসে, পলাশ, ওদের কারো কারো ইচ্ছা করে এখানে থেকে যায়, আমাদের দেশের লোকদের সৌন্দর্য কাকে বলে শিখিয়ে দেয়। কিন্তু কে ওদের কদর বুঝবে বল?

সত্যিই পলাশ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। মল্লিকার ঠোঁটের কোণে যেন একটু বিদ্রূপের হাসি লেগে আছে, মনে হলো। জনতার মধ্যে যে দু'চারজনা ঈষৎ লম্বা-চুল পুরুষ-শিল্পীও রয়েছেন, এতক্ষণ পরে সেটা পলাশের চোখে পড়ল।

রিনি বললে,—সুকোমল এদিকে এসো। সুকোমল আমাদের পাণ্ডা, পলাশ, ও-ই তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে দেবে।

সুকোমল একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম দর্শনে তাকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী মনে করাতে পলাশ আর সেদিকে দ্বিতীয়বার তাকায়নি। এবার নজর ক'রে দেখে খুশি না হ'য়ে পারলো না। কি সাদাসিধা সাজপোষাক। এমন কি সাদাসিধা বললে কম বলা হয়। দাড়ি কামায়নি, নখ কাটেনি, কর্ডুরয়ের পেণ্টেলুন কাচেনি, পায়ের শম্বরের চামড়ার চপ্পলে লাল-নীল রঙ লেগেছে। সুকোমল হাতের সিগারেটটা জ্বলন্ত অবস্থাতেই তখুনি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে,—বেশ, আসুন ছবি দেখাই।

ছবি? তাইতো, দেয়াল জুড়ে সারি সারি ছবি ঝুলে রয়েছে। এতক্ষণ তো চোখেই পড়েনি। কতক শিরা-বের-করা কাঁচা কাঠে বাঁধানো, কতক অ-বাঁধাই। এই ছবিগুলোকেই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, কারণ ওদের মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠতা আছে যে ফ্রেম-ট্রেম শুধু অবান্তর নয়, দস্তুরমতো আপত্তিকর হ'য়ে ওঠে। দেখে-দেখে পলাশ অবাক মানে।—তবে কি এ-সবই আপনারা এঁকেছেন?

সুকোমল হেসে বলে,—গানের ওস্তাদদের মতো আমাদের-ও যে ঘরানা আছে, সেটা চিনে ফেলেছেন দেখছি! সমস্তই আমাদের আঁকা, বাইরের লোকের ছবি রাখি না আমরা।

পাঁচ

মল্লিকা আর রুমা এসে সুকোমলের ও-পাশে দাঁড়ায়। পলাশকে দেখে রুমা একটু স্নিগ্ধ হাসলে আর মল্লিকা বললে,—আশা করি, চারুচিত্রকলামন্দিরমের শিল্পকলার মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছ?

সুকোমল ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠে বললে,—পৌঁছবার সময় দিলে কোথায়? দেয়ালের দিকে তাকান পলাশবাবু।

পলাশ বিস্মিত হয়। মোটা বোর্ডের উপর মনে হলো রোঁয়া-ওঠা ব্রাস দিয়ে আঁকা অদ্ভুত সব মূর্তি। সুকোমল বললে,—শিল্প সম্বন্ধে মামুলী ধারণা সব পালটে ফেলেছি আমরা। আমাদের এখানে কোনোরকম পুরানো গড়ন-পেটনও চলে না, সেটা নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছেন। বোবা প্রকৃতিকে আমরা মানুষের চাইতে নিকৃষ্ট ব'লে মনে করি, তাই তাকে অনুসরণ করা আমাদের পোষায় না। বরং আমরা প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে যাই। প্রকৃতি যা প্রকাশ করতে পারে না, তাকেও প্রকাশ করবার সাহস আমাদের আছে। আহা, ওর হাতে একটা বুকলেট দাও না, রিণি, তাহ'লেই ও সব বুঝতে পারবে। সব কি মুখে বলা যায় নাকি?

এতক্ষণে ছবিগুলির মর্ম উপলব্ধি করতে পেরে পলাশ চোখ নামিয়ে নিলে। তার কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হ'য়ে উঠল।

রিনি খুশি হ'য়ে বললে,—হলো কি, পলাশ? আমাদের শিল্পের নগ্ন সত্য সইতে পারছ না বুঝি? এবার চোখ খুলে দেখ, রূপের রাংতার মোড়ক খুলে দিলে সত্যকে কেমন দেখায়।

পলাশ একবার কপালের ঘাম মুছে, রুমা মল্লিকার দিকে তাকালে। রুমার দৃষ্টি দরজার বাইরে কাদের বাগানের একফালি সবুজ রঙের উপর নিবদ্ধ। মল্লিকা নগ্ন সত্য-গুলির দিকে চেয়ে আছে, তখনো তার চোখে-মুখে কৌতুকের হাসি।

পলাশ বললে,—তাহ'লে এই বুঝি সেই খোসা-ছাড়ানো সত্য? তার যে এ-রকম চেহারা এ-কথা সত্যি আমার কখনো মনেও হয়নি। ভারি আশ্চর্য তো?

সুকোমল এক পলক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—কিন্তু আমাদের শিল্পের উদাত্ত বাণীটা ধরতে পারলেন কি?

—কতকটা পেরেছি বই কি। কিন্তু গোরুদের চোখ কেন মুখের লাইন থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর মেয়েদের—ওরা মেয়েই তো ঠিক?—ওদের চোখ নেই কেন?

—মেয়ে বই কি ওরা। তবে কোনো একটি বিশেষ মেয়ে নয়। ওরা হলো গিয়ে নারীত্বের ভাবের রূপ। ওদের চোখ থাকবে কি ক'রে? চোখে দেখার ঢঙ পালটে ফেলুন, পলাশবাবু। চোখ এঁকে কি হবে? দৃষ্টি দিতে পারবেন চোখে? অন্ধ নারীত্বের বিরাট প্রতীককে দেখে চিনতে পারছেন না? আর গোরুদের চোখ মুখকে ছাপিয়ে উঠবে না? জীবজগতের বোবা অভিব্যক্তি আঁকবো কি ক'রে?

রুমা সহসা পলাশের দিকে ফিরে বলে,—চলো, মা বলেছেন তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরবে।

সুকোমলরা অধৈর্য হ'য়ে ওঠে।—তবে আমরাও যাবো, কিছুই তো বলা হলো না।

মোমোরা বলে,—ও-সব চালাকি চলবে না রুমা, তোমার হাত থেকে পলাশকে উদ্ধার করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গেলে চলবে না। তাহ'লে আমরাও যাবো, মেমদেরও কাউকে কাউকে নিয়ে যাবো।

রুমা স্নিগ্ধ হেসে বলে,—না ডার্লিংরা, আজ নয়। আজ মার মাথা ধরেছে। আরেকদিন ওকে উদ্ধার কোরো। মল্লিকা, তুমি আসবে না? তুমি না এলে আমার দিদিমা রাগ করবেন।

মল্লিকা বলে,—আমাকে মোড়ের মাথায় ছেড়ে দিয়ে যেও, রুমা। আমার কাজ আছে। পলাশ, পরে দেখা হবে।

—কাজ? কি কাজ, মল্লিকা? এই না তুমি বললে আজ তোমার ছুটি? তুমিও এসো।

মল্লিকা রাজী হয় না, নিউ মার্কেটের মোড়ে নেমে যায়। রুমার সঙ্গে মল্লিকার কতো তফাৎ। রুমা রাগ করতে জানে না। ক্ষুব্ধ অকারণ অভিমানে রুমার গলা ধরে আসে না। রুমা যা চায় তাই পায়। রুমা কাউকে হিংসা করে না। হিংসা করবার কোনো কারণ থাকে না। রুমা কত সুখী। অকারণে মিমিদির জন্য রাশি রাশি ফুল কিনে মল্লিকা বাড়ি ফেরে। বাসের মধ্যে তার সুগন্ধ ভুরভুর করে, বাসের লোকেরা বিরক্ত হয়। তখনো সন্ধ্যা নামেনি, মিমিদির গা ধোয়া হয়নি, লাট-করা ফিকে ছাই রঙের শাড়ি পরে মিমিদি কোল-ভরা ফুল নিয়ে মল্লিকার দিকে চেয়ে থাকেন। দিনের বেলা ঘুমিয়ে উঠেছেন, ঠোঁটের রঙ চোখের সুর্মা মুছে গেছে।—বলো মল্লিকা বলো, কি দেখলে, কি শুনলে, কে কেমন সেজেছিল। কি ক'রে তোমার দিন কেটেছে আমাকে বলো।

মল্লিকাও হাতমুখ না ধুয়ে বসে পড়ে, গপ্পার উপর দিয়ে বাতাস বয়, গফুর চা এনে দেয়। মল্লিকা বলে,—কেন তুমি যাও না মিমিদি? নিজের চোখে দেখে এসো না কেন? যাবে আমার সঙ্গে একবার? শুধু শুনে কি তৃপ্তি হয়?

মিমিদি এত জোরে মাথা নাড়েন যে দু'কানের পান্নার ফুল দুটি ঝিকঝিক ক'রে ওঠে।—আর যাবো না। কুড়ি বছর হলো ছেড়ে দিয়েছি। আমার স্বামীর চা-বাগান ছিল, শীতকালে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়ে সোমারানী ব'লে একজন নেপালী মেয়েকে এনে রাখত। সবাই জানত। কেউ কিছু বলত না। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ মিশবে না, মল্লিকা, আমাকে কেউ ডাকবে না। ভবানীপুরে আমাদের বাড়ি ছিল, আমার শাশুড়ি ছিল; দেওর ছিল, ডাক্তারি পড়ত, মড়ার খুলি নিয়ে এসে রাত্রে আমাকে ভয় দেখাত। কে জানে তারা বেঁচে আছে কিনা।

মল্লিকা কি বলবে ভেবে পায় না।—এখানেও তো সবাই তোমাকে ভালোবাসে মিমিদি। পাড়াসুদ্ধ সবাই ভালোবাসে, আমি ভালোবাসি, সোমনাথবাবু ভালোবাসেন। তোমাকে সোমনাথবাবু কি দারুণ ভালোবাসেন, একটা কড়া কথা কখনো বলতে শুনিনি।

মিমিদি কোল থেকে ফুল নামিয়ে উঠে গিয়ে, কাঁচের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গপ্পার দিকে চেয়ে থাকেন।—যাকে না পেলে মনে হয় জীবনটা বুঝি একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে গেল, সেও যখন ধরা দেয়, তখন মনে হয় এ নয়, এ নয়, এ আমি চাইনি। এসো মল্লিকা, চা খাবে এসো, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। পলাশকে একদিন আনবে বলেছিলে না?

—আজ সে রুমার সঙ্গে গেল। মিনামাসিমা বলে দিয়েছেন।

মিনামাসিমা! মিমিদির মনে পড়ে মিনামাসিমা নাম-করা সুন্দরী ছিলেন, পুরুষানুক্রমে তাঁদের রূপের খ্যাতি। মিমিদিদের সঙ্গে ওঁদের যাওয়া-আসা ছিল না অবিশ্যি। মিমিদির শাশুড়ি দিবারাত্র বিলেত-ফেরতদের নিন্দে করতেন। আর বলতেন, দেখিস্ বিলেত-ফেরতদের গুষ্ঠিতে কেবল মেয়ে জন্মায়, ছেলের মুখ দেখে না ওরা। বাস্তবিক রুমাদের বাড়িতে চার পুরুষ ধরে কারো ছেলে হয়নি। রাঙা দিদিমণি আর মিনামাসিমার অবশ্যি সেজন্য কোনো দুঃখও নেই।

অসময়ে শ্যামলী এসে হাজির হয়। চোখের কোলে ছায়া, চোখের তারায় বেদনার

কালিমা।

—সে কিরে! নৌকোয় গেলিনে যে বড়?

—কান-ব্যথায় মরে গেলাম দিদি, যা হয় করো। আর কোনো দিনও যাবো না নৌকোয়।

—যাবি না আবার। ঝগড়া করেছিস নিশ্চয়। আয় কানে ওষুধ দিয়ে দিই। চোখে অত জল যে? নিজেকে অত সস্তা ক'রে দিস বলেই তো সে পোছে না। সত্যিই যাস্ না নৌকোয় সাতদিন। দেখ্ কি করে।

জোরে মাথায় ঝাঁকি দেয় শ্যামলী, চারিদিকে চোখের জল ছিটিয়ে পড়ে।—আরে, কানব্যথায় কাঁদছি, দিদি। কিন্তু সাতদিন না গেলে, পদ্ম কি আর বসে থাকবে। পদ্মকে যে বিয়ে করবে সে ঐ কাঠগুদোমের শেয়ার পাবে। ওষুধ দাও দিদি, আর সইতে পারিনে।

মোমবাতি জেলে গিলসারিন গরম ক'রে শ্যামলীর কানে দু'ফোঁটা ঢেলে দিয়ে মল্লিকা বলে,—যা, শুয়ে থাকগে যা। রাতে আরেকবার আসিস। কাল সকালে ঠিক দেখবি নৌকোয় যেতে পারবি।

শ্যামলী বিদায় নেয়। সোমনাথবাবু ওষুধের বাক্স নিয়ে বাড়ি আসেন,—ও কি মিমি কাপড় ছাড়োনি যে? শরীর খারাপ করেনি তো? মল্লিকা?

স্নেহের প্রবল জোয়ারে দিনান্তের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। মল্লিকা হাত মুখ ধুয়ে আসে, মিমিদি নীল শাড়ি পরে সেজেগুজে আসেন,—ফুল এনেছ মল্লিকা? মিমি, ফুল জলে রেখে দাও। চা দেবে না আমাকে?

সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসে। গলির গ্যাসলাইটে বাবলা গাছের ফুলের ছড়া দুলতে থাকে।

ছয়

মল্লিকা বিনিদ্র রজনীর প্রহর গোণে। সারাজীবনের হিসাব মেলাতে বসে, চাওয়া-পাওয়ার সংখ্যা মেলে না। মিমিদির কথা মনে হয়। যা ছেড়েছেন তার মায়া কাটে না, যা পেয়েছেন তাতে বুক ভরে না। নিজের কথা ভাবে, পলাশের কথা ভাবে, রুমার কথা ভাবে। শ্যামলী হ'লে কি করত? শ্যামলীদের জীবনযাত্রায় দুটি রঙ আছে, সাদা আর কালো, তাদের মধ্যে কোনোরকম বোঝাপড়া নেই। পাড়াশুদ্ধ সবাই মোহনের কথা জানে। সকলের খুব সহানুভূতি। শ্যামলী বিধবা, পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে সে নয়। ভাই-এর বাড়ি থাকে, মোড়ের মাথায় শ্যামলীর ভাই-এর তেলের ঘানি, বৌ তার শ্যামলীর উপর হাড়ে চটা,—অমন ঘর-জ্বালানি মেয়েকে কেই বা ভালোবাসে? মোহনের দাদার পদ্মর বাবার সঙ্গে ইদানীং দহরম-মহরম, পদ্মর সঙ্গে বিয়ে হ'লে মোহন ওদের কাঠগুদোমের শেয়ার পাবে, বাপের একমাত্র সন্তান পদ্ম। ভারী অহঙ্কারী মেয়ে শ্যামলী, এত অহঙ্কারী যে কোনো ছোট কাজ তাকে দিয়ে হয় না, ঐ অতটুকু পদ্ম ওকে দেখতে পারে না, কিন্তু শ্যামলী পাড়াময় পদ্মর প্রশংসা ক'রে বেড়ায়। তিলির মেয়ে শ্যামলীর ভারী নবাবিয়ানা। কিন্তু রোজ শ্যামলী মোহনদের মাছের নৌকায় চড়ে বসবে। রাঁধেও খাসা, মশলাপাতি সঙ্গে নিয়ে আসে, মোহনরা তো মহাখুশি।

ঘুম আসে না। রাত গভীর হয়, পাড়া নীরব হ'য়ে যায়। রাঙা দিদিমণি মাত্র দু'ঘণ্টা

ঘুমোন, মিনমাসিমাও সারারাত জেগে থাকেন, ভোরের দিকে ঘুমোন, বেলা গড়িয়ে গেলে ওঠেন, চোখ দু'খানি ফুলো-ফুলো দেখায়। কি রূপ ওদের। কত টাকা। মল্লিকার মা বেহিসাবী খরচ করেন। ওদের বাড়িতে মাসের গোড়ায় রোজ লুচি-মাংস হয়, আর মাসের শেষে কিছুতেই কিছু কুলিয়ে ওঠে না। তাই নিয়ে বারোমাস বাবার সঙ্গে মার কথা কাটা-কাটি হয়। কিন্তু মল্লিকাদের বাড়িতে কেউ রাত জাগে না। এক মল্লিকা ছাড়া। ওরা ভাবে মল্লিকার মতো বুঝি কেউ হয় না, মল্লিকার গুণের বুঝি পরিসীমা নেই। মল্লিকার বাবা মা নিজেদের জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে কখনো আক্ষেপ পর্যন্ত করেন না। মাঝে মাঝে মল্লিকাদের মনে হয়, ওঁদের জীবন যে কত অসার সে কথা তাঁদের সন্দেহও হয় না। জীবন কিসে ব্যর্থ হয়? যা চাই তা না পেলেই ব্যর্থ হ'য়ে যায়? তবে কি তাই পেলেই সার্থক হয়? যেদিন এডওয়ার্ড রাজা হয়েছিল রাঙা দিদিমণিদের বাগানের গাছের ডালে ডালে হাজার হাজার চীনে লণ্ঠন ঝোলানো হয়েছিল। শেষ রাত্রে তাদের ভেতরকার মোমবাতি জ্বলে জ্বলে শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, রং-করা বাগানের খোলসে আগুন ধরে গিয়েছিল, হিমালয়ান বেঁটে ঝাউ-এর পাতা ঝলসে গিয়েছিল।

কি হ'লে জীবন সার্থক হয়? মল্লিকার চোখের পাতা ভারী হ'য়ে আসে।

দু'তিনদিন পলাশের সঙ্গে দেখা হয় না, আপিশের কাজও বেশী, আবার মিমিদির শরীরও তেমন ভালো যাচ্ছে না। সোমনাথবাবু প্রেস থেকে কাগজপত্র বাড়িতে আনিয়ে দেখাশোনা করছেন। কিছুতেই আর মন বসাতে পারছেন না।

—ওকে শোয়া দেখলে কেমন যেন লাগে, মল্লিকা। শুয়ে থাকা ওর ধাতে সয় না, সারাদিন ঘুরঘুর ক'রে বেড়ায়। ওকে সুখী করতে পারিনি, মল্লিকা। ওর স্বামীটা একটা লক্ষ্মীছাড়া, মরবেও না কিছুতেই, সারাজীবন কেবল বদমায়সী ক'রে বেড়ালো, অথচ অটুট স্বাস্থ্য। দেখি এখানে ওখানে, ভারী খাতির ওর।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করেন, তারপর আবার বলেন,—আবার বিয়ে করেছে, জানো? দু'তিনটি ছেলেমেয়ে আছে, চারাগাছের মতো বেড়ে উঠছে তারা, কলেজে-টলেজে পড়ে। মিমিকে সামান্য সুখটুকুও দিতে পারলাম না। ভেবেছিলাম সে ব্যাটার কাছ থেকে নিয়ে এলে, দুঃখ কাকে বলে ভুলিয়ে দিতে পারবো।

শেষে মল্লিকা বলে,—মিমিদির মন যে সেই জীবনে বাঁধা আছে; মিমিদি নিজে যা ছেড়ে এলেন, তারাও উল্টে ওঁকে ছেড়ে দিল ব'লে যে ওঁর ক্ষোভ হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছাড়া ওঁর বোধ হয় কষ্ট হয়।

সোমনাথবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন,—ভালোবাসা বোধ হয় কিছু নয় মল্লিকা, শুধু ভালোবাসা নিয়ে কেউ সুখী হয় না। মিমি কিছুতেই গঙ্গা পার হবে না, একটা ভালো সিনেমা পর্যন্ত এপারে আসে না। পাছে অনাদর পায় তাই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ ছেড়েছিল। দাম দিতে কষ্ট হয়, এমন জিনিস নিতে নেই, মল্লিকা। বড় বড় জিনিস দিয়ে, কই, মানুষ তো সুখী হয় না, টুকরো টুকরো সুখের সামগ্রী জুড়ে জুড়ে বোধ হয় সুখ তৈরী ক'রে নিতে হয়। আশ্চর্য।

চতুর্থ দিন অনুরাধারা দল বেঁধে আপিশ ছুটি হ'তেই মল্লিকাকে ধরে নিয়ে গেল। সে হয় না, মল্লিকা, আমাদের সাহিত্যচক্র তা হ'লে জমবে না, তা ছাড়া তুমি গা ঢাকা দিয়ে থাকলে, রুমারা তো পলাশকে একেবারে ভেড়া বানিয়ে দেবে। জানো তো ওদের।

শ্যামলীও চারদিন নৌকোয় যায়নি, খুব জ্বর এসেছে, কানে বড্ড ব্যথা, মোহনরা রোজ

রাত ক'রে ফিরেছে, কেউ ওর খোঁজ নিতেও যায়নি। এক পদ্ম ছাড়া। পদ্ম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ডেকে বলেছিল,—কি হলো গো তোমার শ্যামাপিসি? ওরা কি খাবে-দাবে না?

শ্যামলী রেগে উঠেছিল,—তুই যা গে না, ভাত রেঁধে দে। ঐ তো বোঝে ওরা।

পদ্ম খিলখিল ক'রে হেসেছিল,—যাই না কি আর এমনি এমনি। বাবা যে কিছুতেই দেবে না। ছিঃ, ভালোমানুষের মেয়েরা যায় কখনো ঐরকম ক'রে!

—তাহ'লে যা পালা, এখান থেকে, আমি মন্দ মানুষের মেয়ে, যা বলছি।

শ্যামলীর দাদার বৌ কানব্যথার ওষুধ নিতে এসে এইসব গল্প ক'রে গেছিল। ভারী যেন খুশ-খুশি মনে হলো।

কিছু শুনলো না অনুরাধা, ধরে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে। হাতে-মুখে একটু জল দিয়ে মল্লিকা রাশি-রাশি স্যাণ্ডউইচ্ তৈরী করলো। কি জানি, রুমাও আজ কেন জানি সকাল-সকাল এসেছিল।

—আমাদের বাড়ি হ'য়ে এলে পারতে মল্লিকা, স্নান ক'রে, কাপড়চোপড় ছেড়ে আসতে পারতে—

অনুরাধা বিরক্ত হ'য়ে বলে,—কাপড় তো আমিও দিতে পারি, রুমা, কিন্তু কাজগুলো তো আর তুমি ক'রে দিতে না।

কথাগুলো অযথা রূঢ় শোনায়, কিন্তু রুমা রাগ করতে জানে না এগিয়ে এসে বলে,—ডিম দিয়ে অলিভ্ দিয়ে কি সুন্দর স্যাণ্ড্উইচ হয়, মল্লিকা, জানো না। আমরা কুকিং ক্লাশে করতাম।

অনুরাধা বলে,—ওসব আমরাও করেছি। আর গাজরমটর সেদ্ধ ক'রে শিশি থেকে মেয়নেজ ঢেলে চমৎকার স্যালাডও রে'ধেছি। ওসব আমাদের কাছে বলো না। এবার ওঘরে যাও দিকিনি, পলাশ সুকোমল কেউ আসতে বাকি নেই। নিমাই নিজের কবিতা পড়বে, যাও না সেখানে।

রুমা তবুও রাগ করে না, তখনি উঠে পড়ে।—তুমি আসবে না, অনুরাধা? মল্লিকা?

মল্লিকার কাজ শেষ হয়নি। ও কি ক'রে যায় বলো? আর আমার বাড়ির ব্যাপার, আমি যাবো না? আচ্ছা, চলো তবে।

ওরা চলে গেলে মল্লিকা ক্ষিপ্রহস্তে কাজ সারে, নিমাই-এর কবিতাপাঠ না শুনলে কি ক'রে চলে? কি সুন্দর চোখ নিমাই-এর, কি সুন্দর গলার স্বর, যা পড়ে তাই ভালো লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, নিমাই পাঠ করলে কবিতার ভালোমন্দ কিছু সঠিক বিচার করা যায় না। নিমাই-এর স্বপ্ন-ভরা চোখ আর মধুর কণ্ঠস্বর আর ঐ যে মাঝখানে বোতাম না লাগিয়ে একপাশ দিয়ে বোতাম লাগায় আর প্রথম বোতামের ঘরটি সোনার বোতামসুদ্ধ ঝুলে থাকে, সমস্ত মিলে মনের মধ্যে একটা কাব্যলোক রচনা ক'রে দেয়, যে কিছু বিচার করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। শেষে স্যাণ্ডউইচটি তেল-কাগজ দিয়ে জড়িয়ে আটা কৌটোতে চেপে বন্ধ ক'রে, বৈঠকখানা ঘরের দরজার পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে মল্লিকা নিমাই-এর কবিতা শোনে।

ঘর-জোড়া শাদা ফরাস পাতা, কোথাও কোন রঙের বাহার নেই, শুধু শাদা পদ্মফুলের স্তূপ আর রজনীগন্ধার ছড়া আর ধূপের গন্ধ। পর্দার আড়ালে আরেকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঈষৎ লালচে বেঁটে বেঁটে কোঁকড়া চুল, পিঙ্গলাভ চোখে ঝোড়ো দৃষ্টি, হাল্কা একটা

পালকের মতো দেহ, নিরলঙ্কার শাদা বিধবার মতো সাজ, শুধু গোলাপের মতো রাঙা ঠোঁট দু'খানি, ঘননীল ছায়া-দেওয়া দু'টি চোখ, ডালিমের মতো হাতের পায়ের লম্বাটে নখগুলি। মল্লিকার দিকে ফিরে সে বললে,—এমনি পরিবেশ না হ'লে কবিতা জমে? রজনীগন্ধা আর ধূপের গন্ধ আর শাদা চাদরে কি যেন আছে।

ওদের দেখে কখন পলাশ উঠে এল,—মল্লিকা, এমন ক'রে আমাকে ত্যাগ কোরো না। তুমি কি জানতে না যে কাল মিনামাসিমা ওঁদের কল্যাণসমিতিতে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন—

মেয়েটি রাঙা ঠোঁটে রাঙা তর্জনী রেখে বললে,—স্‌স্‌ স্‌-স্‌। নিমাই ওপারের দেয়ালে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কবিতা পাঠ শুরু ক'রে দিলে।

গোড়ার খানিকটা পলাশের শ্রবণ এড়িয়ে গেছিল, তারপরে নিমাই পড়লো,

ধ্বনি!
কথার জালে দেয় না যে ধরা
পড়ে না মানের ফাঁদে,
কালিমাখা হাতের
খোঁজাখুঁজির ছাপ লাগে না তাতে

ধমক খাবার ভয়ে খুব সাবধানে সেই মেয়েটির কানে কানে পলাশ বললে,—গোড়াটা শুনতে পাইনি কি বিষয় বলছে?

মেয়েটি অবাক হ'য়ে বললে,—বিষয়? বিষয় দিয়ে আপনি কবিতা মাপবেন? বিষয় দিয়ে কি হবে? কাব্যের বিষয়বস্তু লাগে না। কাব্য কি জিনিস?

পলাশ অপ্রস্তুত হ'য়ে বলে,—না, না, তা বলছি না, মানে কবিতাটার নাম কি?

—ড্যামোক্লিস।

—ড্যামোক্লিস?

—ড্যামোক্লিস। কেন আপনার আপত্তি আছে?

—না, না, আপত্তি কিসের। তবে কি জানেন, দোষটা আমারি, মানেটা ঠিক ধরতে পারছি না কিনা—

—বাস্‌, অমনি কাটা-ছাঁটা একটা মানে ধরা চাই? কাব্য কি অতই সোজা? মানে-টানে পৌঁছোয় না সেখানে, প্রাণ দিয়ে বুঝতে হয়, আভাসটা ধরে নিতে পারা চাই, বা অনির্বচনীয়, ব্যাকরণের সাধ্যি কি তার নাগাল পায়—স্‌—স্‌—স্‌।

ততক্ষণ নিমাই-এর ড্যামোক্লিস শেষ হ'য়ে কি আরেকটা শুরু হয়ে গেছে।

পরে ঐ মেয়ে তার প্রতিশোধ নিলে, অনুরাধাকে ডেকে বললে,—তোমার স্টার গেণ্টকে আগে কাব্যের মর্ম বোঝাও, ও যে সব কথার ব্যাখ্যান চাইছে।

নিমাই আহত বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, বাকি সকলেও পলাশের দিকে চায়, পলাশের মুখখানি রাঙা হ'য়ে ওঠে। একগুচ্ছ ঢেউ-খেলানো চুল স্থানচ্যুত হ'য়ে কপালে এসে পড়ে। তাই দেখে অনুরাধা কোমল কণ্ঠে বলে,—কেন লাল হচ্ছো ডার্লিং? সুকোমলও কাব্য বোঝে না, আমার স্বামীও বোঝে না—

পলাশ হঠাৎ ব'লে বসে, কিন্তু আমি যে বুঝি, আর এগুলো বুঝতে পারছি না ব'লেই না—

মল্লিকা আর শোনে না, ধীরে ধীরে জলযোগের ব্যবস্থা করতে যায়।

সাত

সেদিন শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয়েছিল যে পলাশের মনটা বড় সেকেলে। সে ভারী তর্ক করেছিল, বলেছিল ঐ সব আসবাবপত্র আর বিলিতী নাম দিয়ে আবার কাব্য কি, কাব্য নাড়ি ধরে টান দেবে, নইলে আবার কাব্য কি? ওরাও ছাড়বার পাত্র নয়, বললে কেন রাজা না হ'লে কি গল্প হয় না? সাধারণ জিনিস দিয়ে কি কাব্য হয় না? তা হয় তো হয়, কিন্তু কাব্যটাতে অসাধারণত্বের ছাপ থাকতে হবে, মনের কোণাটোনাগুলোকে আলো হ'য়ে উঠতে হবে, এই ধরনের আরো পাঁচ রকমের কথা বললে পলাশ। ওরা খুব হাসল, বলল, এমন কথা কলেজের কমনরুমেরই শুধু যোগ্য।

সুকোমল এ-সব আলোচনায় যোগ দেয়নি। সোজাসুজি বলেছিল, সে অনুরাধার নিমন্ত্রণে এসেছে, রুমার রূপ দেখতে আর মল্লিকার হাতে তৈরী স্যান্ড্‌উইচ খেতে, আর বেশী কিছু আশাও করেনি। যার কোনো রূপই নেই, পলাশবাবু মিছিমিছি তার অর্থ খুঁজে মরছেন! শেষের দিকে অনুরাধার স্বামীও এসেছিলেন, কালো বেঁটে মোটা-সোটা মানুষটি, বিলিতী পোষাক পরা, কথাবার্তায় একটু দাম্ভিকতা আর চোখ-ভরা কিসের আকুলতা। তিনি এসে পলাশের সব কথার সমর্থন করাতে, পলাশ তখনি রণে ভঙ্গ দিয়েছিল।

অনুরাধা বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল,—এ সবের মধ্যে তুমি কেন এলে বলো তো? তোমার কি কোনো ইন্‌টারেস্ট আছে এতে?

টিলি বললে,—নিজের স্ত্রীর লেখাই যে পড়ে না, তার আবার মতামত।

বেশীক্ষণ ছিলেন না অনুরাধার স্বামী, মল্লিকার কাছ থেকে চা-জলখাবার চেয়ে নিয়ে, দুটো কথা বলেই চলে গিয়েছিলেন। অনুরাধা সে সময় নিমাই সুকোমলদের খাওয়ার তদারক করতে ব্যস্ত ছিল, কখন গেলেন লক্ষ্য করেনি।

তাই দেখে টিলি পলাশকে বললে,—স্বামীটিকে ঘরছাড়া না ক'রে ছাড়বে না ঐ অনুরাধা। অথচ স্বামী ছাড়া ওর আর কি পরিচয় আছে বলো? বাপটি একটা ওয়ার্থলেশ ভ্যাগাবণ্ড—জীবনে কখনো একটা বিল শোধ করেনি জানো? আর মা-টি তো ঐ অনুরাধার-ই মতো, কালো কুৎসিত, এদিকে তারিণী দত্তর মেয়ে ব'লে মাটিতে পা পড়ে না! এক সময় ফ্রান্স থেকে ওদের কাপড় কেচে আসতো নাকি, মেম আয়া ছিল ওদের, হেনা-তেনা কত কি। হয়েছেও তেমনি, এখন দেনার দায়ে বাড়িঘর বেচে জামাই-এর ঘাড়ে চেপেছেন!

পলাশ চারিদিকে তাঁদের খোঁজে।—কি দেখছ কি! এখানে তাদের আসতে দিলো আর কি অনুরাধা! বাপটি দেখতে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর জকির মতো—তিনতলায় বন্ধ ক'রে রেখে দেয় অনুরাধা ওঁদের—

অনুরাধা কাছে এসে বলে,—খেয়েছ, মাণিক?

টিলি তার গালে একটা চুমু খেয়ে বলে—ওঃ, মেলা খেয়েছি। তোমার যা কাণ্ড! এখন আমাকে পালাতে হয়, দাসদের ওখানে ককটেল, তোমরা যাবে না?

অনুরাধা আকাশের দিকে নাক তুলে বললে,—ও সব আমার বোরিং লাগে, কি ক'রে তোমরা সহ্য করো বুঝি না!

টিলিও রেগে যায়,—তা তোমাদের মতো হাইব্রাউ তো আর সবাই নয়, আমাদের একটা সোশ্যাল লাইফ আছে। আচ্ছা চলি পলাশ, কাল মিনামাসির কল্যাণসমিতির পার্টি ভুলো

না কিন্তু।

অনুরাধা অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল, তারপর হতাশভাবে পাশের আরাম কেদারাটায় বসে পড়ে বললো,—বসো পলাশ। কেমন লাগছে আমাদের শহরটাকে বলো। আমাদেরি বা কেমন লাগছে? রুমার সঙ্গে প্রেমে পড়োনি তো? কাল খুব সাবধানে থাকবে। কারণ রুমার হাত এখনো তত শক্ত নয়, ওর যা দেমাক, নিজের ন্যায্য অধিকারটুকু রক্ষা করবার জন্যও আঙ্গুলটি তুলবে না। ওর ধারণা ওর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে সবাই এসে ওর পায়ের কাছে আপনা থেকেই জড়ো হবে। কিন্তু ওর মা-টি ভারী সাংঘাতিক। তার উপর এখন মেয়ে পার করতে হবে, মরীয়া হ'য়ে উঠেছেন, কি জানি বাপু, এত রূপ, তার উপর তোদের সিন্দুক-ভরা টাকা জমানো রয়েছে, প্রাণ ধরে তো কাউকে একটা কাণাকড়িও দিতে পারিসনে—তা তোর মেয়ের বিয়ে হয় না কেন?

পলাশ আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না।—ওর মেয়ের বিয়ের জন্য কোনো ভাবনা নেই। অমন মেয়ে হাজারে একটাও দেখা দেখা যায় না। সাধারণ মানুষ ব'লে মনেই হয় না।

—হয়েছে! ও মল্লিকা, পলাশ বলে কি!

ততক্ষণে আসর ভাঙ্গতে শুরু করেছে, মল্লিকা কাছে এসে বলে,—ঠিক-ই বলেছে। আমি যদি পুরুষমানুষ হতাম, আমিও রুমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে যেতাম। দেখাও তো অমন আরেকটা মেয়ে।

শ্যামলীকে তার বৌদিদি গঞ্জনা দিলে সে বলে,—করুক না মোহন পদ্মকে বিয়ে। তারপর আমি আর একদিনও ওদের নৌকোতে যাবো না। আহা, পদ্মের মতো পাত্রী কোথায় পাবে মোহন! দেখতেও খাসা, বাপের অত টাকা পয়সা পাবে, মোহনের আর কোনো দুঃখু থাকবে না। পণ্ডিত মশাই ওর কুষ্ঠি করেছিলেন, তাতে লেখা আছে, জলে ডুবে মরার ভয় আছে মোহনের। পদ্মকে বিয়ে করলে আর নৌকোয় বেরুতে হবে না, সে ভয়টিও যাবে। ওদের কাঠগুদোমের মেলা আয় শুনেছি।

তেলচিটে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে শ্যামলী। কান-ব্যথায় না মনের দুঃখে বুঝতে পারে না ওর বৌদি। বালিশ থেকে মুখ তুলে বলে,—শুধু বড় খরখরি ওর মেজাজটি, মুখ দিয়ে একটা মিষ্টি কথা বেরোয় না। কি জানি কেন বৌদিদিও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—মিষ্টি কথার ওর কি দরকার গো? চিড়ে তো ভিজবে না।

মোহন সন্ধ্যার দিকে একবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে খবর নিয়ে গেছিল।—ওদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে, শ্যামলী নেহাৎ না যেতে পারলে, রাঁধতে পারে এমন একটা কাউকে নিয়ে যেতে হয়। শ্যামলী ঘর থেকে ধরা গলায় চেঁচিয়ে বলেছিল—তাই যাস না কেন? রেঁধে দেওয়া আবার কি এমন কাজ! ইচ্ছে হয়েছিল বলে,—যা পদ্মকে নিয়ে যা, ভাতটা আরো মিষ্টি লাগবে। কিন্তু কিসে যেন মুখ চেপে ধরেছিল বলতে পারেনি। মোহন হেসে বৌদিদিকে বলেছিল,—বাবা! কানব্যথার চোটে তেজ তো একটুকুও কমেনি। দেখি পদ্মর বাবা যদি ওকে ছাড়ে, আজ খুড়ো যাচ্ছে সঙ্গে, আজ ছাড়তেও পারে।

অনেক রাত্রে শ্যামলীর বৌদিদি ওর জন্য দুধ গরম ক'রে এনে দেখে, শ্যামলী কানের মাকড়ি, হাতের রুপোর খাড়ু খুলে রেখেছে, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে। মনে হলো যেন ওর আলো নিভে গেছে, জানলা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে, রুক্ষ চুলগুলি উড়ছে। অনেকক্ষণ চেয়ে

থেকে, দুধ নিয়ে বৌদিদি ফিরে গেল। কি-ই বা পেয়েছে জীবনে শ্যামলী?

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে মল্লিকা দেখে, সোমনাথবাবু কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন আর শ্যামলীর বৌদিদি এসে কান্নাকাটি করছে।—ও আর বাঁচবে না, দাদাবাবু, ওর দাদাও কিছুতেই ডাক্তার ডাকবে না। বিধবা মানুষের অত সাজ ভালো না ব'লে লোকে ওর নিন্দে করে, কিন্তু ও কানেই তোলে না। আজ কেন সব খুলে ফেলে দিয়েছে? মনটা ভালো লাগছে না দাদাবাবু, বড়দিদি কবে উঠবে? সোমনাথবাবু ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন, নিজের বুকের মধ্যেও একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা ধীরে ধীরে কায়া নিতে থাকে। ঠিক সেই সময় মল্লিকা এসে পৌঁছয়।

অমনি যেন সব পালটে যায়।—তুইও যেমন! কানব্যথায় কখনো লোক মরে? দারুণ কষ্ট হচ্ছে, আর ঐ লক্ষ্মীছাড়া মোহনটার অনাদরে মন খারাপ লাগছে, তাই গয়নাগাটি খুলে ফেলেছে। ব্যথা সেরে গেলেই আবার দেখবি যে-কে সেই! তুই যা, আমি গফুরকে পাঠাচ্ছি, ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে ক'রে সে এক্ষুণি যাচ্ছে।

বৌ চলে গেলে সোমনাথবাবু আর মল্লিকা পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে।—কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন বলুন তো? শরীর খারাপ করেছে, তাই অসময়ে মিমিদি ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তারবাবু দেখে গেছেন, তবু কিসের এত ভাবনা? এদিকে আমার যে বেজায় খিদে পেয়েছে।

সোমনাথবাবু কাগজপত্র রেখে তখুনি উঠে পড়েন।—এই দেখ, সারাদিন খেটেখুটে এলে, খিদে তো পাবেই। আর আমি কেবল নিজের ভাবনার কথা বলছি। ছি ছি। ও গফুর। গফুরকেও তো একবার ছেড়ে দিতে হবে।

মিমিদি স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোচ্ছেন, কেমন যেন শিথিল অসহায় দেখাচ্ছে, মুখখানিতে সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই। কিন্তু রূপ তো আর দেহে থাকে না। সোমনাথবাবু সেই কুড়ি বছর আগেকার মিমিদিকে ছাড়া আর কিছু যে দেখতে পান না, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে মল্লিকা সোমনাথবাবুর সঙ্গে খেতে বসে।

আট

মল্লিকার মা ঘন ঘন চিঠি লিখতে থাকেন,—"খুব সাবধানে থাকবে, মল্লিকা। মেয়ে-মানুষের জীবন বিপদ দিয়ে ঘেরা। মাসিক পত্রিকার গল্পগুলো পড়ে গা শিউরে ওঠে। এখনো ঘর বদ্‌লাওনি কেন? এখানে মেয়েদের ইস্কুলে ইতিহাসের টিচার নেবে, চলে এলেই তো ভালো হয়, একসঙ্গে থাকার মতো কিছু নেই। যিনি ছিলেন, তাঁর কাণ্ড দেখে হেসে আমরা বাঁচি না। চিনিস্ তো তাঁকে, ঐ যে কালো মিস্ সোম, বেয়াল্লিশ বছর বয়স, মাথায় যাঁর কম চুল। তিনি হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, পোস্টমাস্টার মশাইকে বিয়ে ক'রে বসলেন। রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে, আবার বন্ধুদের রাত্রে পোলাও মাংস খাওয়ানো হলো, পোস্টমাস্টারের আগের পক্ষের ছেলে দুটো নাকি মহাখুশি; দু'জনে মহানন্দে পরিবেষণ-টেশন করলো! কি কেলেঙ্কারি বল্ দিকিনি?—"

মানুষের মনের সঙ্গীসাথী নেই, একান্ত প্রিয় যে সে-ও মনের কথা বোঝে না, তবু হাতড়ে মরতে হয়, না বললে বুক ফেটে যায়, কিন্তু মনের নৈঃসঙ্গ কিছুতেই ঘোচে না।

—মল্লিকা, ও মল্লিকা, তোমার মিমিদি আজ উঠেছেন; এখানে নিয়ে আসব? কি এত

ভাবছ মল্লিকা?

সোমনাথবাবুর মুখভরা প্রসন্নতা। মাথার সামনের দিকটাতে টাক পড়ে গেছে, স্নিগ্ধ সুকোমল পদ্মফুলের মতো সুন্দর চোখ আলোয় ঝলমল করছে। সকালবেলাকার রোদ নিমগাছের পাতার মধ্যে দিয়ে বারান্দায় এসে পড়েছে, জানলার কাঁচগুলিও ঝলমল করছে। মিমিদির চারটে বেড়ালছানা আর তাদের মা'র ফূর্তি দেখে কে।

মল্লিকা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এই তবে ভালোবাসা, এরই নাম ভালোবাসা, মিমিদির সুখ না হ'লে সোমনাথবাবুর সুখ নেই, মিমিদির শরীর খারাপ হ'লে সোমনাথবাবুর শান্তি নেই, কিন্তু মিমিদিকে সুখী করবার সাধ্য সোমনাথবাবুর নেই।

দুজনে মিলে ধরাধরি ক'রে মিমিদিকে বারান্দার লম্বা চেয়ারে এনে বসিয়ে দেন, বেড়ালরা অমনি তাঁর গায়ের উপর উঠে পাঁচটিতে ঘোঁষাঘোঁষি ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। বারান্দার চারিদিকে মিমিদি অযত্নের চিহ্ন দেখতে পান, ধুলোময়লা, শুকনো ফুল, ওষুধের শিশি। মিমিদির অসুখ ব'লে বাড়িতে কোনো কিছুর যত্ন নেই! সোমনাথবাবু অপ্রস্তুত হ'য়ে বলেন,—দেখ না, পাঁচ মিনিটে সব পরিষ্কার ক'রে ফেলব। তুমি কি খাবে বল তো?

চটপট ক'রে কোনো কিছু ক'রে উঠতে পারে না গফুর আজকাল। গফুর বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছে, আগের মতো আর হাত চলে না, আরেকটা লোক রাখাও মানে মেলা খরচ। গফুর এ বাড়িতে পঁচিশ বছর আছে, সোমনাথবাবুর ছাপাখানার শুরু থেকে। মিমিদি এসে প্রথম প্রথম জাত যাবার ভয়ে ওর হাতে খেতেন না, নিজের জন্য স্টোভে এটা-ওটা ক'রে নিতেন। তারপর একদিন অসুখে পড়লেন, ঘরে দ্বিতীয় লোক নেই, গফুর এসে সেবার অংশ নিল, মিমিদি আর তার হাতে খেতে আপত্তি করলেন না। এখন গফুর না হ'লে একদিনও চলে না, অথচ গফুর বুড়ো হ'য়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম পারে না, সব ভুলে যায়, কিন্তু আরেকটা লোক রাখবার কথা বললেই রেগে চতুর্ভুজ হ'য়ে যায়। একদিন যে নিজের কাজে খুঁতটুকু থাকতে দিত না, আজকাল নিজের প্রতি তার অসীম ক্ষমা। কিন্তু আজ হঠাৎ চটপট ক'রে মুখরোচক কিছু তৈরী ক'রে দিতে বলাতে গফুরের আর হাত চলে না। মল্লিকা রান্নাঘরে গিয়ে পড়াতে সে কেঁদে ফেললে,—দিদি, একফোঁটাও ময়দা রাখিনি, এমন আমি তো আগে ছিলাম না—

মল্লিকা তাকে সান্ত্বনা দেয়।—ময়দা দিয়ে কি হবে গফুর? ওঁর ওসব না খাওয়াই ভালো। এই নাও ধরো, এই দিয়ে চাঁজু টোস্ট বানিয়ে দাও, ওঁর ভালো লাগবে।

মিনামাসিমা চাকর-বাকরদের সঙ্গে বেশী দহরম-মহরম পছন্দ করেন না। ওতে নাকি ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়, কমিউনিস্টদের যে আজকাল এত বাড় বেড়েছে, তারও একটা কারণ হলো ঐ চাকর-বাকরদের প্রতি তার বেশী বেশী প্রীতি। মিনামাসিমার বাবার নাকি এক পেয়ারের বেয়ারা ছিল, পঁচিশ বছর কাজ ক'রে হঠাৎ এ বাড়িতেই যখন মারা গেল, ডাক্তারবাবু ডেথ-সার্টিফিকেট লিখতে গিয়ে মিনামাসিমাকে বেয়ারার পুরো নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন মিনামাসিমাকে উঠে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে হয়েছিল। তবে লোকটা বিবাহিত কি না, পরিবার আছে কি না, এ'রা কেউ-ই বলতে পারেননি, শেষে অন্য চাকরদের কাছে তাদের খোঁজ খবর পাওয়া গিয়েছিল।

এসব লোককে ইচ্ছামত এক মাসের নোটিশ দিয়ে দিব্যি ছাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু গফুর? ওর একটা ছেলে, সেটা নেশাখোর, তার আবার দুটো বিয়ে। আগেরটা দেখতে ভালো না ব'লে মনে ধরেনি, তাই দ্বিতীয়টাকে দেখেশুনে নিজে বিয়ে করেছিল, এমনি

লক্ষ্মীছাড়া। দিনরাত দুটো বৌ-এ চুলোচুলি, তবু গফুর কিছুতেই বড় বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাবে না, ওতে নাকি এ বাড়ির মুখ ছোট হয়। এখন বছর পাঁচেক হলো গফুরের স্ত্রী মাটি নিয়েছে, উড়নচড়ে ছেলেটার তবু মতিগতি ফেরেনি, এখন আবার তার আগের বৌকেই বেশী পছন্দ, ছোটটার একে রূপের বড় দেমাক, তায় নিষ্কর্মার একশেষ। কোনো রকমে ওদের দিন কেটে যায়, দুটো তিনটে কাচ্চা-বাচ্চাও হয়েছে, কিন্তু এত সবের মধ্যে বুড়ো গফুরের ঠাঁই কোথায়?—না, দিদিমণি, এখানেই শরীরটা রাখব একদিন, আপনাদের ইচ্ছে হয়, মাটি দেবার ব্যবস্থা করবেন, নয়তো ফেলে দেবেন, গফুরের কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই। মোট কথা সে যাবে না কিছুতেই।

সন্ধ্যাবেলা মিনামাসিমাদের ওখানে কল্যাণসমিতির আসর বসেছিল। মল্লিকা গিয়ে পৌঁছতেই রাঙা দিদিমনির খাস দাসী, সুন্দরী এসে তাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল।—সেই চারটে থেকে আপনার জন্য পথ চেয়ে বসে আছি, মল্লিকাদিদি, বড়মা আর তিষ্ঠুতে দিচ্ছেন না। মা ওনাকে নিচে নামতে মানা করেছেন, তাই উপরে উনি কাউকে কোনো কাজ নিয়ে বসতে দিচ্ছেন না।

মল্লিকা উপরে পৌঁছতেই রাঙা দিদিমণি লম্বা নালিশ শুরু ক'রে দিলেন।—মিনাদের কাণ্ড দেখ একবার, বিরাট বিরাট গাড়ি চেপে, সিফন জর্জেট হীরে মুক্তো পরে, পাঁচ টাকা পাউণ্ডের চা খেতে খেতে, ওঁরা সব কল্যাণসমিতির খরচ কমাচ্ছেন। এগ্ সেলের পেয়ালাতে চায় চুমুক দিচ্ছেন আর পরস্পরের গয়না কাপড় মুখস্থ ক'রে নিচ্ছেন, যাতে পরে চুটিয়ে নিন্দে করতে পারেন, আর বলছেন,—তা হ'লে টিচারদের মাইনে আরো চার টাকা ক'রে কমিয়ে দেওয়া হোক, ওরাও কিছু স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, পেয়ে পেয়ে ওদের স্বভাব খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে।

কথাগুলি এত বেশী সত্যির মতো শোনালো যে মল্লিকা না হেসে পারলো না।—হাসছিস যে বড়? বুঝলি, পলাশটাকে বাগাবার তালে আছেন ওঁরা। ওর কাছ থেকে যদি হাজার পাঁচেক আদায় করা যায়, তা হ'লে এক বছরের মতো নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাজে খরচ করা যায়!

মল্লিকা হেসে বললে,—রাঙা দিদিমণি, কথাগুলো তো খুব আমাকে বলছ, মিনামাসিমাকে বলবার সাহস আছে?

রাঙা দিদিমণি গলাটাকে খাটো ক'রে বললেন,—সাহস যথেষ্ট আছে। কিন্তু কি জানিস্, কথায় কথায় বড় গোলমাল করা ওর স্বভাব। স্বামীটাকে কি কম জ্বালিয়েছে ভাবিস? সে মরে বেঁচেছে। তবে ও মেয়েকে আমি মোটেই ভয় পাইনে, নিজের পেটের মেয়ে তো, ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি—ভাবতে পারিস, দিন-রাত আমার পেছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছে? কখন কি করি, কি বলি, সবটার হুবহু রিপোর্ট নেয় দিনে দু'বার ক'রে!

—কি যে বলো, রাঙা দিদিমণি।

—আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি বলছি! ঐ সুন্দরীটি ওর মাইনে-করা স্পাই নয় তো কী? জেরা ক'রে সব বের করেছি। আমিও নিয়েছি এক হাত, জানিস? মিনার নাম ক'রে লেডি চক্রবর্তীকে একটা নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ ওদের আসরে হাজির হ'য়ে সারাক্ষণ ওর ঐ ন্যাকা গুরুঠাকুরের গল্প করবে, বেশ রগড় হবে।

দম নেবার জন্য রাঙা দিদিমণিকে থামতে হয়। মল্লিকা ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মল্লিকা জানে মিনামাসিমা ছাড়া রাঙা দিদিমণিকে ভালোবাসবার আর একটিও লোক নেই দুনিয়াতে।

রাঙা দিদিমণি খুব হাসেন।—কাউকে না বলিস তো একটা কথা বলি তোকে। লেডি চক্রবর্তীকে লিখেছি সম্ভব হ'লে গুরুদেবটিকেও নিয়ে আসতে, কল্যাণসমিতি থেকে হয়তো ওঁকে কিছু প্রণামী দেবার ব্যবস্থা হ'তে পারে। মিনার নাম ক'রে লিখেছি, বুঝলি?

রাঙা দিদিমণি কথাটা ভেবে ভারী খুশি হ'য়ে ওঠেন। তারপর বলেন,—আচ্ছা, আমি গেলে কি খারাপটা হতো, তুই-ই বল্? এক কোণে বসে ওদের কথাবার্তা শুনতাম আর একটু চা খেতাম। ভেবেছিলাম, আমার নতুন সাদা জর্জেটটা পরবো, সুন্দরীকে বলেওছিলাম বের ক'রে রাখতে।

রাঙা দিদিমণির চোখে জল আসে। মল্লিকা সুন্দরীকে ডেকে দিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। বুড়ো হ'লেই কি এমনি হবে? উপর থেকে রাঙা দিদিমণির খাস দাসী সুন্দরী চাপা গলায় ডেকে বলে,—যাবার আগে একবার দেখা ক'রে যাবেন, বড়মা ব'লে দিলেন।

নয়

বৈঠকখানায় অতিথিরা বসেছে যেন চাঁদের হাট। অধিকাংশই মহিলা, তবে দু-চারজন পুরুষমানুষও আছে, পরিপাটি চকচকে পালিশ-করা চেহারা তাদের। তাদের মাঝে ধুতি-পাঞ্জাবীপরা পলাশকে কেমন বেমানান লাগছে। পলাশের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্ত মনে হলো, পাশেই রুমা বসেছে ব'লেই, না কি কল্যাণসমিতির কার্যবিবরণী শুনে, সেটা বোঝা গেল না।

সমস্ত ঘরখানিতে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। মল্লিকা বিস্মিত হ'য়ে তার কারণ খোঁজে।

রাঙা দিদিমণির স্বামীর গাঢ় নীল মখমল দিয়ে বাঁধানো সিংহাসনের মতো দেখতে চেয়ারটাতে গেরুয়া রঙের ব্যাণ্ডালোর রেশমের জোড় পরে রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, ললাটে চন্দনরেখা, পরম রূপবান একজন যুবাপুরুষ আর তাঁর পায়ের কাছে নীচু একটি টুলের উপর লেডি চক্রবর্তী।

গুরুদেবকে ভারী ভালো লেগেছে পলাশের। মল্লিকার কানে কানে বললে,—ভারী উদার মতামত তো ওঁর, চিকেন স্যাণ্ডউইচ্ খুশী হ'য়ে খেলেন। সুন্দর গানের গলা—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

মল্লিকা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বললে,—একটি পয়সা দেবে না কল্যাণসমিতিকে।

—সে কি! তুমি না একজন সভ্যা, রিপোর্টে শুনলাম গত বছর এক-শো তেইশ টাকা চাঁদা তুলে দিয়ে ওঁদের চিরঋণী ক'রে রেখেছ।

মল্লিকা আবার বললে,—টাকা দিলে ভালো হবে না।

—কিন্তু তা হ'লে যে ওঁরা টিচারদের পঞ্চাশ টাকা মাইনে থেকে আরো চার টাকা কমিয়ে দেবেন!

—দিকগে, তুমি দেবে না।

রুমা অবাক হ'য়ে বলে,—সে কি মল্লিকা, তুমি কল্যাণসমিতির হিতৈষীদের ভাগাচ্ছ? মা শুনলে কত দুঃখিত হবেন।

কথাটা আর গড়ায় না, ততক্ষণে গুরুদেবের সঙ্গে মিনামাসিমার দারুণ তর্ক লেগে গেছে। গুরুদেব বলছেন,—কেন এমন ক'রে সময়, পরিশ্রম আর অর্থ নষ্ট ক'রে মানুষকে

ভ্রান্ত করেন বলুন তো? পারবেন পৃথিবীর বুভুক্ষুদের ক্ষিধে মেটাতে? যায় কখনো পেটের ক্ষিধে মেটানো? পেট ভ'রে খাইয়ে দিন, পাঁচ ঘণ্টা পরে আবার খাই-খাই করবে। তার চেয়ে আত্মার ক্ষিদে মেটাতে চেষ্টা করুন। একটি মাত্র কথায় জন্ম-জন্মান্তরের মতো হৃদয় তৃপ্ত হ'য়ে যায়, তা জানেন? —ব'লেই মিনামাসিমাকে উত্তর দেবার সময় না দিয়ে, গুরুদেব মধুর কণ্ঠে সংস্কৃতে কি যেন গাইতে লাগলেন, কেউ তার একবর্ণ মানে বুঝলো না, শুধু লেডি চক্রবর্তী একটু পাশ ফিরে খানিকটা অগোচর হ'য়ে নিয়ে, সোনালি একটা রেশমী রুমাল দিয়ে, সযত্নে সুর্মা বাঁচিয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগল। স্যানেল ফাইবের' গন্ধ ভুরভুর করতে লাগল।

মিনামাসিমাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। গান থামবামাত্র বিনা ভূমিকায় বললেন,—ক্ষিদে কাকে বলে সে বিষয় কিছু জানা থাকলে দেখতাম কত গান বেরুত!

লেডি চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালেন।—কি যে বলো মিনা, ওঁর কত অভিজ্ঞতা! জন্মে জন্মে শ্রীভগবান মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুঃখব্যথা বোঝা বইবার জন্য মানুষের দেহ ধরেন। দু-বার বিলেত গেছ ব'লেই যে ধরাখানাকে সরাখানা মনে করো, এমন জানলে ওঁকে এখানে আনতুমই না!

মল্লিকার বুক ঢিপঢিপ করে, এইবার বুঝি রাঙা দিদিমণির ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। মিনামাসিমা মধুরকণ্ঠে বললেন,—চাঁদার খাতা এখনো বের করিনি, এখনি চলে যাচ্ছ যে? তোমার গুরুদেব আমাদের গরীব অসহায়া মেয়েদের জন্য কিছু দান ক'রে যাবেন না?

তখুনি গুরুদেবও উঠে পড়ে, নিজের হাত থেকে হীরের আংটি খুলে মল্লিকার হাতে দিয়ে বললেন,—আশা করি আমার এই সামান্য জিনিসটি আপনাদের কাজে লাগবে।

রাগে লেডি চক্রবর্তীর মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল। মল্লিকা তাঁদের গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বৈঠকখানায় ফিরে আসতেই, মিনামাসিমাও বললেন,—কি দরকার ছিল তোমার ওঁদের গাড়িতে তুলে দেবার? কেমন আমার গালে একটা চড় মেরে গেল, দেখলে? ও আংটি আমাদের নেওয়া উচিত না, ভারী তো একটা কাঁচ-বসানো আংটি, কি মহা উপকার হবে আমাদের ও দিয়ে।

মল্লিকা আংটিটাকে তুলে আলোর কাছে ধরল, লাল নীল সবুজ আলো ঠিকরোতে লাগল। লাবণ্যদিদি পাকা জহুরীর চেয়েও ওস্তাদ, মল্লিকার হাত থেকে আংটি নিয়ে বললেন,—কি বলো, মিনা! এ যে বহুমূল্য জিনিস, এর দাম হাজার টাকার কম নয়। তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ব'লে তো আর সমিতির ক্ষতি স্বীকার করা যায় না!

রাগে মিনামাসিমার মুখ দিয়ে কথা সরে না।—ন্যাকা ভণ্ড কোথাকার। খুব এক চাল দিয়ে গেল, ভারী তো আস্পর্ধা! লেডি চক্রবর্তীর মতো আরো পাঁচজনে মিলে খোসামোদ ক'রে ক'রে মাথাটি ওর ঘুরিয়ে দিয়েছে! এখন আর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই!

পলাশ ভারী বিস্মিত হয়, ওঁদের টাকার দরকার, অথচ হাতে হাতে হাজার টাকা পেয়ে গিয়ে খুশি হওয়া দূরে থাকুক, সব রেগেই অস্থির।

—পলাশ, তুমিও কিছু দেবে নিশ্চয়? পাঁচ হাজারের কমে ছাড়ব না ব'লে রাখলাম।

পলাশ একটু হেসে বললে,—গুরুদেবকে অতিক্রম করাটা কি ঠিক হবে? ব'লে, সে-ও হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হলো।

মল্লিকা এবার সত্যি রাগ করে, কাউকে কিছু না বলে একা বাড়ি চলে গেল। পলাশ তাকে কোথাও খুঁজে পেল না।

এর পর আর সভা জমা সম্ভব হয় না। উপর থেকে রাঙা দিদিমণি মল্লিকার খোঁজে বারবার সুন্দরীকে পাঠাতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে মিনামাসিমা রুমাকে বললেন,—যাও তো একবার দেখে এসো। পলাশ, তুমিও বরং যাও। মল্লিকাকে তো দেখছিনে, নিদেন তোমাকে দেখতে পেলে কতকটা ঠাণ্ডা হ'তে পারেন। এ বাড়ির কাউকে তো আজকাল মনে ধরে না!

কেন জানি মিনামাসিমার মেজাজটা এমনি খিঁচড়ে গেছিল যে এক ঘণ্টার মধ্যে দু'হাজার টাকা তুলেও মন ভালো হচ্ছিল না। এমন কি বৈঠকখানার দেয়াল-জোড়া ভিক্টোরীয় ফ্যাশানের বিশাল আয়নাতে নিজের পাতলা ছিপছিপে, তাঁরের মতো সোজা, সরু সোনালি পাড়ের সূক্ষ্ম চন্দেরি-পরা দেহযষ্টিখানিকে দেখেও আজ আর কোনো তৃপ্তিই হলো না।

মনে পড়লো রুমার বাবার সঙ্গে লেডি চক্রবর্তীর এককালে বিয়ের কথা হয়েছিল; অন্তত সেইরকম একটা কিছু সবাই আশা করেছিল। লেডি চক্রবর্তীর বাবা মিস্টার রায় ও-বি-ই! ওটুকু না লিখলে তিনি ভারী ক্ষুণ্ণ হতেন, যাই হোক্, ওঁদের বাড়িতে নিত্য পার্টি লেগে থাকত, মিসেস রায় যেখানকার যত দুষ্প্রাপ্য পাত্র জুটিয়ে আনতেন, গানবাজনা শুনে, খেয়ে-দেয়ে তারা চলে যেত, বিশেষ কোনো সুবিধা হত না। তবে রুমার বাবাকে প্রায় পাকিয়েই এনেছিলেন, কোনোদিনই তো খুব বুঝি ছিল না তার, এমনি সময় একদিন সন্ধ্যা-বেলায় রাঙা দিদিমণির সঙ্গে মিনামাসিমা ওদের 'মাহ্‌জং' খেলবার পার্টিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেদিন থেকে রুমার বাবার আশা ছেড়ে দিতে হলো মিসেস রায়ের। আজকাল আর ওরকম মাহ্‌জং পার্টি দেয় না কেউ। কিন্তু কম চালাক নয় ঐ লেডি চক্রবর্তীটি। লেডি চক্রবর্তী! তখন তো সবাই ওকে বলত পুরুষঘেষা পম্পা রায়। কম চালাক নয় ও মেয়ে। পরের বছরই চক্রবর্তীকে বিয়ে করে বসল। এমন কিছু সুপাত্রও ছিল না সে, তখন তো সবাই খুব নাক সিঁটকিয়েছিল। নানারকম হিঁদুয়ানীতে ভরা নাকি ওদের বাড়ি। কিন্তু দেখতে দেখতে সেই চক্রবর্তী ব্যবসা ক'রে লাল হ'য়ে গেল, স্যার উপাধি পেয়ে গেল, উপরন্তু বৌ যা বলে তা করে, আজ পর্যন্ত বৌ-এর কোনো দোষ দেখতে পায় না, নইলে এই গুরুদেবকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কেই-বা সইত! বাস্তবিক ফ্যাশনেব্‌ল্ মেয়েদের যখন ধর্মে পায় সে একটা দেখবার জিনিস—ভাবতে ভাবতে ক্ষিপ্রহস্তে মিনামাসিমা বৈঠকখানার পার্টিশেসের অবাবস্থাকে অনেকখানি গুছিয়ে আনেন, মেমসাহেবের এই বিশেষ মেজাজটি চাকরবাকরদের জানা থাকাতে তারা কে যে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে, তার ঠিক নেই—আচ্ছা আসুক তো সব—কিন্তু রুমা পলাশই বা এতক্ষণ কি করছে উপরে!

গভীর ক্লান্তিতে মিনামাসিমার সমস্ত দেহখানি আচ্ছন্ন হয়। কিসের জন্য এত সব করা? কল্যাণসমিতি উঠে গেলেই বা কি এমন ক্ষতি হয়? হ্যাঁ, তবে একটা কথা আছে বটে। সমিতি উঠে গেলে খুশি হবার লোকের অন্ত থাকবে না। এই সব যারা আজকে সেজেগুজে বসে চা খেয়ে গেল, এদের মধ্যেই অনেকেই কি আর কম খুশি হবে মনে হয়! পিয়ানোর উপর যারা গরম চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখে আর অন্য লোকের বাড়ির মেহগনি আসবাবে ঘষে সিগারেট নেবায়—বাপের কালে এত দামী জিনিস দেখেছে কি এরা, দু'দিনের বড়লোক সব, আজ ব্যবসা ফেল হবে, কাল তো গিয়ে পথে দাঁড়াবে, হ্যাঁ, ঐ পম্পা চক্রবর্তীরাও—এসব লোকের মতামতেরই বা কি দাম!

অনেকদিন পর মিনামাসিমার রুমার বাবার কথা মনে পড়ে। শেষ দশ বছর বিলেতে ছিলেন, হপ্তায় হপ্তায় চিঠি দিতেন, বছরে একবার নিয়মিত আসতেন, ফিরে যাবার সময়

আনন্দ আর ধরত না। তাই ব'লে কেউ যেন না মনে করে যে মিনামাসিমাকে নিয়ে যেতে চাইতেন না, মিনামাসিমা ওরাই মধ্যে দু'বার ঘুরেও এসেছেন। তবে মা-র বয়স হয়েছে, এত সব সম্পত্তি কে আগলায়? চলে গেলেই তো আর হলো না। রুমার একটা ভালো বিয়ে হ'য়ে যেত যদি তাহ'লেও যা হয় করা যেতে পারত। এখন মা-র তো তিরাশী বছর বয়স হলো, মেরে কেটে আরো পাঁচটা বছর—তবে সত্যি কথা বলতে কি এক-একসময় মনে হয় উনি অমর। সব কিছুতে যোগ দিতে চান, রুমার ছেলে বন্ধুদের দেখলে তো আর কথাই নেই! একটু সামলে না রাখলেও চলে না, যা মুখে আসে বলেন আজকাল! তায় আবার কি যে অবুঝ হ'য়ে গেছেন, আজ তো খোলাখুলিই শাসালেন যে উইল ক'রে মল্লিকাকে সব সম্পত্তি দিয়ে যাবেন, মিনামাসিমার এ বাড়িতে বাস করা তুলে দেবেন—। পাগলের প্রলাপ অবশ্য। কিন্তু বলা তো যায় না, হয়তো ঝোঁকের মাথায় গোপেশ্বরবাবুকে ডেকে রীতিমতো একটা উইল ক'রে, সব বিলিব্যবস্থা ক'রে দিয়ে, দিব্যি রাতারাতি মরে গেলেন। তখন কি হবে! নাঃ, মাকে চটানোটা ঠিক নয়।

মিনামাসিমার তন্দ্রা ছুটে যায়, দ্রুতপদে রাঙা দিদিমণির কাছে গিয়ে হাজির হন।—ভাগ্যিস, নামোনি মা, পম্পা চক্রবর্তী তার গুরুদেবটিকে নিয়ে উপস্থিত! সে এক কেলেঙ্কারি! আমার সঙ্গে হ'য়ে গেল এক হাত! শুনে রাঙা দিদিমণির চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

দশ

শ্যামলীর শক্ত অসুখ করেছিল। অফিস যাবার আগে মল্লিকা খোঁজ-খবর আনে, ওষুধের ব্যবস্থা করে, আবার অফিস থেকে ফেরার পথে একবার হ'য়ে আসে। শ্যামলী কেমন যেন হ'য়ে গেছে, বেশী কথা বলে না, নিজের তেজে নিজেই যেন পুড়ে কালি হ'য়ে যাচ্ছে। বৌদিদি দু'হাতে তার সেবা করে, একটু বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই। মল্লিকার সাড়া পেয়েই রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে,—আবার শরীর কালি ক'রে এলে দিদিমণি। তোমার কষ্ট হয়, কিন্তু আমার ধড়ে প্রাণটা ফিরে আসে। মেয়ে জাতটা ভালো না দিদি, শুধু পাঁচজনকে জ্বালাতে আছে। ওর গয়নাগুলো শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি বেচে দিতেই হলো দিদি, ওর দাদা তো এক পয়সা খরচ করতে চায় না। শ্যামলীর দুঃখে শ্যামলীর বৌদিদি কাঁদতে থাকে। মল্লিকারও মনটা খারাপ হ'য়ে যায়।

পথের বাঁকে মোহনের সঙ্গে দেখা হয়, মল্লিকা ভালো ক'রে চেনে না তাকে, তবে পাড়ার প্রায় সকলেরই মতো মোহনেরও মুখটি চেনা আছে।

—দিদি, কি হয়েছে শামলীর? ভালো হবে তো?

মল্লিকার হঠাৎ রাগ হয়,—কেন তোমাদের ভাত রাঁধবার লোক পাওনি?

মোহন রাস্তার গ্যাসবাতির আলোতে এসে দাঁড়ায়, মুখখানি বড়ই বিষণ্ণ দেখায়।—দিদি, মরে-টরে যাবে না তো?

মোহনকে হঠাৎ আত্মীয়ের মতো মনে হয়।—মরবে কেন? ডাক্তারবাবু ওষুধ দিচ্ছেন। আর মলে তো আপদই চুকে যেত। ওর গয়না বেচে ওষুধ কেনা হচ্ছে।

মোহন চমকে ওঠে,—শামলী ছাড়লে গয়না?

গয়নার কাহিনী শুনে মোহন প্রথমটা কথা বলে না, তারপর বিনীতভাবে বলে,—

গয়নাগুলো বেচল কেন ওর বৌদিদি? আমার যে একেবারে কিছু নেই, তাতো নয়, আমাকে একবার বললো না কেন?

এ কথার অনেক যোগ্য উত্তর ছিল, সমস্ত নারীজাতির প্রতিনিধি হ'য়ে যেগুলি বলা যেত, কিন্তু মল্লিকা সে কথার উল্লেখ না ক'রে শুধু বললো,—ক'দিন গিয়েছে ওদের খোঁজ নিতে যে তোমাকে বলবার কথা মনে হবে?

মোহনের মুখ বন্ধ হ'য়ে যায়।

—এক আধবার গেলে তারাও খুশি হয়। এই ব'লে মল্লিকা বাড়ি চলে যায়।

হৃদয় বড় জঞ্জাল, সহজ ব্যাপারকেও ঘোরালো ক'রে তোলে। এই তো বেশ ছাড়া-ছাড়ি হ'য়ে গিয়েছিল, পদ্মকে বিয়ে ক'রে মোহন থাকতো সুখে। আর শ্যামলী? কিন্তু শ্যামলী কি আর বিয়ের যুগ্যি মেয়ে?

বাড়ি এসে দেখে দোতলার কাঁচ দিয়ে ঘেরা বারান্দা ঝলমল করছে, গোলাপী শাড়ি পরে রুমা এসেছে পলাশকে সঙ্গে নিয়ে। রুমা-ই যে পলাশকে ধরে নিয়ে এসেছে এ বিষয় মল্লিকার মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। নইলে রুমা কেন? রুমার মনে ছোট কিছুর স্থান নেই। মিমিদি আহ্লাদে আটখানা। আশ্চর্যের বিষয় ওদের সঙ্গে সুকোমলও এসেছে। সাদা শান্তিপুরী ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী পরে সুকোমলকে চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু সোমনাথবাবু কোথায় গেলেন? সুকোমল হেসে বললে,—বাঃ, অতিথি সৎকার করতে হবে না? সোমনাথবাবু রুমাদের গাড়ি ক'রে আমাদের জন্য ঢাকাই পরোটা আর ডিমের ডেভিল আনতে গেছেন, আমরা কেউ সঙ্গে গেলে ভালো দেখায় না ব'লে আমরা যাইনি।

আজ সুকোমলকে ভারী ভালো লাগলো মল্লিকার।

রুমা জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি সেদিন ও-রকম কাউকে কিছু না ব'লে চলে এলে কেন মল্লিকা? দিদিমার কি রাগ! তারপর আমাদের কাছে গুরুদেবের গল্প শুনে মহাখুশি! জানো, সুকোমলদের চারুচিত্রকলামন্দিরমে আজ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হ'য়ে গেছে, সুকোমল তাই রাগ ক'রে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে।

সুকোমল বললে,—ওভাবে বলো না, রুমা। পলাশ-ই হলো গিয়ে আসলে ঝগড়ার কারণ—

পলাশ বললে,—বাঃ! আমি সেখানে ছিলাম না পর্যন্ত।

—কারণের অস্তিত্ব থাকলেই যথেষ্ট, তাকে অকুস্থানে উপস্থিত হবার দরকার করে না।

মল্লিকা বিস্মিত হয়।—দাঁড়াও, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি—

ততক্ষণে খাবার নিয়ে সোমনাথবাবুও এসে গেছেন এবং এমন একটা অনাবিল আনন্দের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যা বহু ভাগ্য করলে মানুষের কপালে মাঝে মাঝে জুটে যায়।

মল্লিকার ভারী কৌতূহল,—বলো না কি হয়েছিল কলামন্দিরমে।

—হবে আবার কি? টিলি হাতে এক সোনার মাদুলি বেঁধে এসেছে দেখে মোমো তাকে সুপারস্টিসাস্ বলেছে। আর যাবে কোথা! নিমেষের মধ্যে চারুচিত্রকলামন্দিরম দুই দলে ভাগ হ'য়ে গেল। দুই দল কেন, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিন দলও বলা যেতে পারে। টিলি, ডলি—জানো তো ডলি টিলি চিরকাল একদলে থাকে—কি সব টাকা-পয়সার ব্যাপারও আছে নাকি তার মধ্যে—সুনন্দা, শ্রীলা এরা সব একদিকে, আর মোমো, লটি, লক্ষ্মী আর কম বয়সীরা অন্য দিকে, তা ছাড়া অনুরাধা, মলি, আরও কে কে কোনো

দলেই নেই, কারণ ওদের এদের সঙ্গেও ঝগড়া আবার ওদের সঙ্গেও ঝগড়া। ওদের একটা তৃতীয় দলও বলা যায়। পুরুষমানুষরা কোথাও একটু মাথা গলাবার সুবিধে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সব ভেগে পড়েছে।

সুকোমল হেসে বললে,—মাথা গলাবার সুবিধে কি! গা ঢাকা দেবার জায়গা বলো।

মিমিদি অবাক হ'য়ে আগাগোড়া শুনে বললেন,—তাহ'লে মাদুলি নিয়েই ঝগড়া? পলাশকে নিয়ে নয়?

রুমা হেসে বললে,—না, না, পলাশ-ই আসল কারণ, মাদুলিটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।

মিমিদি বললেন,—মাদুলি খুব ভালো জিনিস। আমার শাশুড়ি, যাদের ছেলে হয় না, তাদের বাঁরেশ্বরের মাদুলি দিতেন; চুলে বেঁধে রাখতে হতো, স্নানের সময়ও খুলতে পাবে না, চুল আঁচড়াবার সময়ও না, তা ছাড়া সোমবার করতে হতো। কিন্তু ছেলে অব্যর্থ। মানে ঠিক ছেলে নয়, মেয়ে হতো। তাও আবার একটা মেয়ে নয়, পর পর চারটি। সেইজন্য অনেকে শেষ পর্যন্ত শাশুড়ির উপর খুব অসন্তুষ্টও হতো।

মিমিদি একেবারে সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন, ফর্সা গাল দুটি অনেক কথা বলবার উত্তেজনায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা ছাড়া পেয়ে বাতাসে উড়ছে। সুগভীর প্রসন্নতায় সোমনাথবাবুর মন ভ'রে রয়েছে।

পলাশ, সুকোমল খুশি হ'য়ে ওঁর পুরানো গ্রন্থ, পুঁথি, পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ দেখছে, ছাপাখানার বিষয় কত কথাই জিজ্ঞাসা করছে, সারাটা সন্ধ্যা মিমিদির মুখে হাসি লেগে আছে।

অনেক রাত্রে অতিথিরা পুনরায় আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, বিদায় নেবার পর সোমনাথ-বাবু বললেন,—এমন একটি পরিপূর্ণ সুন্দর সন্ধ্যাবেলা একেবারে দেবতাদের কোল থেকে খসে এসে পড়ে, মল্লিকা। সারা জীবন ধরে মনে ক'রে রাখতে হয়। ক্লান্ত হ'য়ে গেছ, মিমি?

মিমিদি হেসে মাথা নেড়ে বলেন,—না, না, একটুও না। ঐ সুকোমল ছেলেটি জানে না, কিন্তু ও আমার ভাগ্নে হয়। ও যখন ছয় সাত বছরের, ওর মা ওকে নিয়ে আসতো আমাদের বাড়িতে।

নিমেষের মধ্যে সোমনাথবাবুর মুখখানি বিবর্ণ হ'য়ে যায়। মিমিদি সহসা সেদিকে ফিরে বলেন,—কি হলো আবার? সেজন্য আমার মনে কোনো দুঃখ নেই। বড় অপমানের মধ্যে ছিলাম ওদের বাড়িতে, তুমি আমাকে কত সম্মানে রেখেছ।

সম্মান? ঠিক তো। মল্লিকারও মনে হলো সোমনাথবাবু মিমিদিকে কত সম্মানিত করেছেন। কিন্তু—মল্লিকা উঠে পড়ে। একজনার সমস্যা কি কখনো আরেকজন সমাধান ক'রে দিতে পারে?

ঘুম আসে না চোখে। কবে কোন্ কালে মল্লিকা কি অন্যায় করেছিল, কি ভুল করেছিল, তারা সব মনের মধ্যে এসে ভীড় করে। বর্তমানটাকে অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। ভবিষ্যতের কথা ভাবতেও ইচ্ছা হয় না। মা রোজ চিঠি লিখছেন, 'ঐ যে টিচারের চাকরি খালি হয়েছে, ওঁরা আমার কাছে এসে তোমার কথা বলেছেন, ভালোই তো হয়, একসঙ্গে থাকা যায়। আর নিজের মতো যদি থাকতে চাও, সেও তো হয়, ওঁরা কোয়ার্টার্স দেবেন, কাছেও থাকবে, অথচ স্বাধীনভাবেও থাকতে পারবে। তুমি সুখী হ'লেই আমি সুখী হই। তোমার দিদির অনেক দিন হলো বিয়ে হ'য়ে গেছে, ভাইরাও বড় হ'য়ে উঠলো, খোকন-ই আসছে

বছর বি-এ দেবে, আর ক'দিন-ই বা সব ক'টিকে কাছে পাবো"—এমনিধারা কত কি লিখেছেন মা।

চলে গেলেও হয়। মা খুশি হবেন। কিন্তু পলাশ যদি রুমাকে বিয়ে ক'রে আগ্রায় গিয়ে থাকে? প্রিয়জন সুখী হ'লে মানুষ সুখী হয়। পলাশ যদি রুমাকে বিয়ে ক'রে সুখী হয়, পলাশের অন্তরঙ্গ বন্ধু মল্লিকাও কি তাহ'লে সুখী হবে না? কত ভালো রুমা, রুমার মতো মেয়ে হয় না, কি সুন্দর রুমা, কি মিষ্টি কথা রুমার, কোনো অহংকার নেই রুমার, সবাই রুমাকে ভালোবাসে। মল্লিকার গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে, রুমা বড় ভালো, রুমাদের গৃহিণীতে কেউ সুখী হয় না, কিন্তু রুমা সুখী হবে। রুমার সুখের কথা ভেবে মল্লিকার চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু জল পড়ে। হঠাৎ শ্যামলীর কথা মনে হয়,—শ্যামলীর কপালটা বড়ই মন্দ, শ্যামলীও সুখী হোক, যেমন ক'রেই হোক সুখী হোক।

এগারো

মিমিদিকে নিয়ে সোমনাথবাবু পুরী যাবেন, ডাক্তারবাবুর হুকুম। চক্রতীর্থের ঐ ধারে সোমনাথবাবুর ছোট্ট একটি বাড়ি আছে, তার সামনে এক সারি ঝাউ গাছ আছে, বাড়ির সামনে বালিগুলো স্তূপ হ'য়ে জমে থাকে, কিন্তু পিছন দিক্‌টি উঁচু পাঁচিল দিয়ে আড়াল করা, সেখানে একটা গভীর কুয়ো আছে। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, সোমনাথবাবুর মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুয়োটি খুঁড়িয়েছিলেন। পাঁচ বছর বয়সের সোমনাথবাবু মা-র আঁচলের খুঁটোট হাতের মধ্যে পাকিয়ে শক্ত ক'রে ধরে রাখতেন, মনে বড় ভয় ছিল মা যদি হঠাৎ পা হড়কে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়! কত কথাই যে সোমনাথবাবুর মনে হয়, সাদা সাদা মাকড়সার মতো দেখতে কাঁকড়ার মালা গেঁথে নুলিয়ারা বিক্রী করতে আনত, দেখে গা শিরশির করত, কিন্তু মা-র কি সাহস! ইঁদুর দেখলে ভয়ে মা-র হাত-পা এলিয়ে যেত, কিন্তু কাঁকড়া-গুলোর ঠ্যাং ছিঁড়ে কচি কুমড়ো দিয়ে কি সুন্দর চচ্চড়ি রান্না ক'রে দিতেন, পঁয়তাল্লিশ বছর পরে তার স্বাদটি সোমনাথবাবুর মুখে ফিরে এল।

—এর আগে তো কোনোদিনও রাজী করাতে পারিনি, মিমি, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি সেখানে গেলে তোমার ভালো লাগবে। কেন যাওনি, মিমি?

মিমিদির মুখে ভাষা যোগায় না, বলতে পারেন না, তোমার মা ভালোবাসতেন সেই ভয়েই তো যেতে চাইনি। নিশ্চয় জানি আমাকে দেখলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু তাহ'লে মল্লিকা কোথায় থাকবে? গফুরকেও নিয়ে যেতে হয়, তাহ'লে মল্লিকা এ-বাড়িতে একা থাকবে কি ক'রে?

মল্লিকা কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়, পাড়ার মধ্যে থাকবে, তার আবার ভয়টা কি? ইলেক্‌ট্রিক রিং-এ নিজেরটুকু নিজে ক'রে নিতে পারবে না? চায়ের দোকানের ঐ বাচ্চা শঙ্করটাকে রেখে নিলেই হবে, হাট-বাজার ধোয়া-পাকলা ক'রে দেবে। দুপুরে আফিসের ক্যান্টিনে যা মন চায়, খাওয়া যাবে, অফিসের পর এখানে-ওখানে বেড়িয়ে বাড়ি এসে, চমৎকার সব জিনিস রান্না করা হবে। আর ছুটির দিনে মিমিদির ঘর-দোর মল্লিকা আগ্‌গোড়া গুছিয়ে দেবে।

তাই শুনে সোমনাথবাবু ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন,—ঐটি করো না মল্লিকা, আর যাই করো,

ঐটি করো না। গুছিও না। তোমাদের গুছোনো মানেই তো সব দরকারী জিনিষের অদৃশ্য হওয়া। আমার অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে ও বিষয়। দোহাই, অন্তত আমার পড়ার ঘরটি বাদ দিয়ে, আর যা ইচ্ছে কর। তোমার মিমিদি একবার আমাদের ইয়ার-ক্লোজিং-এর হিসেবপত্র সুদ্ধু গুছিয়ে ফেলে যে কাণ্ডটা করেছিল, উঃ—ফু, মনে করলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

মিমিদি হেসে বলেন,—না, না, মল্লিকা, কোনো অনিষ্ট করিনি, শুধু ছেঁড়া কোণমোড়া কাগজগুলো সব উনুনে পুরে দিয়েছিলাম। ওঁদের কথা শুনো না।

যাওয়ার আয়োজনে দিন কেটে যায়। এক-শো রকম ব্যবস্থা করতে হয়। চায়ের দোকানের মালিক বলে,—শঙ্কর চালাক-চতুর হ'লেও, ওর একটু হাত-সাফাই বিদ্যে আছে। দিদিমণি সারাদিন থাকবে অফিসে—পাড়ার মধ্যে কোনো খবর অজানা থাকে না—তার চাইতে চায়ের দোকানের মালিকের বিধবা বড় বোনটিকে রাখলে হয় না? তার চলা-ফেরা করা অভ্যাস আছে, রাঁধে-বাড়ে ভালো, মাছ-মাংস ছুঁতেও আপত্তি নেই, অথচ বয়স হয়েছে, ঐ শাম্‌লী মুখপুড়ির মতো উড়নচড়ে নয়—

কিন্তু শ্যামলী বারবার বলেছে,—দিদি, আমার জ্বর তো ছেড়ে গেছে, ওনারা যেতে আরো সাতদিন বাকি আছে, তার মধ্যে আমি সেরে উঠব, কি-ই বা তোমার কাজ, আমি খুব পারব, ঘরে আর আমি টিকতে পারছিনে দিদি।

শ্যামলীর শক্তি সম্বন্ধে মল্লিকার যথেষ্ট সন্দেহ থাকে, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে আর না বলতে পারে না।

সোমনাথবাবুর ভাবনা হয়, পেরে উঠবে তো সে? আবার যদি অসুখে পড়ে?

পাশের বাড়ির গয়লানীমাসি বিষম আপত্তি করে,—না, দিদি, ও কাজও কোরো না, ওর বড় দুর্নাম, শেষটা না বাড়িতে এসে কত কি জোটায়।

কিন্তু শ্যামলীর কালি-পড়া চোখ দু'টির কথা মনে ক'রে মল্লিকা কারো কথা কানে তোলে না।

আশ্চর্যের বিষয় সব চাইতে বেশি আপত্তি পলাশের। তিন-চারদিন পরে মিনামাসি-মাদের ওখানে তার সঙ্গে দেখা।

—এ ব্যবস্থায় কোনো মানেই হয় না। আগ্রায় মোড়ের মাথায় কলেজে যেতে, তাও তোমার মা রঘুরাকে সঙ্গে দিতেন। স্বাধীনতা পেয়ে পেয়ে এখন তোমার মাথা ঘুরে গেছে। সত্যি তোমার উচিত এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে সেখানে গিয়ে ইস্কুলের ঐ চাকরিটি নেওয়া। শুধু নিজেকে নিয়ে থেকো না, মল্লিকা মা'র দিকটাও একটু দেখো! সময়ের মোহ দেখছি তোমাকেও পেয়ে বসেছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি সে সবের উপরে।

মল্লিকা দারুণ রেগে যায়।—সে রকম মনে করবার তোমার কোনোই কারণ ছিল না, পলাশ। একটু নিজের চরকায় তেল দাও দিকিনি; সম্পত্তি পেয়ে তোমারো মাথাটি ঘুরতে আর বেশি বাকি নেই।

রুমা শুনে অবাক।—ও কি পলাশ, ও কি মল্লিকা, ছোটবেলা থেকে তোমাদের এত বন্ধুত্ব, আর তোমরা ঝগড়া করছ? তুমিই তো বলেছ, পলাশ, যে মল্লিকাকে তোমার আলাদা একটা মানুষ ব'লে মনে হয় না—

—তার কারণ ও ভাবে ওর এত বুদ্ধি যে ও যখন যা বলবে আমাকেও তাই করতে হবে।

মল্লিকা রাগ ক'রে রাঙা দিদিমণির খোঁজে চলে যায়; পলাশ আহত হ'য়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

রাঙা দিদিমণি বললেন,—খুব একটা চাল চেলেছি রে মল্লিকা, ওদের প্রাণে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছি। বলেছি, ফের অমন করলে তোকে আমার সব সম্পত্তি দিয়ে যাব। সেই অবধি ওরা আমাকে কি ক'রে যে খুশি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তাই ব'লে দেব না অবিশ্যি সত্যি সত্যি তোকে, তা যেন আবার আশা করিস্ না, ও আমার কথার কথা—

মল্লিকা রাঙা দিদিমণিকে আশ্বাস দেয় অমন কথা সে কখনই আশা করে না। রাঙা দিদিমণিও খুশি হ'য়ে ওঠেন।

—তা করবি-ই বা কেন? কি দরকার তোর এসব দিয়ে? তোদের তো তিনকুলে কারো কোনো ঐশ্বর্য ছিল না যে তার একটা অভ্যাস হ'য়ে যাবে। টাকা বড় খারাপ জিনিষ বুঝলি—বড় বদ্ অভ্যাস—তোর দিদিমা আমার পিস্‌তুতো বোন ছিল, না ছিল তার রূপ না ছিল কোনো গুণ, বিয়েও হলো তেমনি—

মল্লিকার একটু অভিমান হয়, মার কাছে চিরকাল শুনে এসেছে দিদিমা নাকি রূপে-গুণে অলোকসামান্যা ছিলেন, তবু তাই নিয়ে তর্ক না ক'রে বলে,—কিন্তু দিদিমার বাবার শুনেছি মেলা টাকা ছিল—

—কার টাকা ছিল? আমার পিসেমশাইর? যা, যা তোর যেমন কথা! বাপের কালেও পিসেমশাইর সে-রকম কিছু টাকাকড়ি ছিল না। কোত্থেকে থাকবে বল? হ্যাঁ, কন্‌ষ্ট্রাক্‌টারি ক'রে কামিয়েছিল অনেক, কিন্তু জানিস তো ঐসব মধ্যবিত্তদের যেমন হয়, একজন একটু উঠলো তো পাঁচজন অমনি তার গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়বে।— টাকা ছিল বটে পলাশের বাবার—। না, বাবার তত না, ছিল ওর ঠাকুরদার। তার উপর কি রূপই ছিল যে তার সে আর কি বলব তোকে! আমি একবার দেখেই—

রাঙা দিদিমণির কেমন সব গোলমাল হ'য়ে যায়। চোখের সামনে অতীতটা এক একবার যেমনি পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে, পরমুহূর্তেই আবার তেমনি অস্পষ্ট হ'য়ে যায়, একবার টর্চ জেবলে নিভিয়ে দিলে অন্ধকারটা যেমন আরো গাঢ় হ'য়ে ওঠে।

তবু বলেন,—রুমার সঙ্গে পলাশের বিয়ে হ'লে বেশ হয়, নারে? পলাশ ছাড়া তো ওর যুগ্যি কাকেও দেখিনে।

মল্লিকা বলে,—রুমার বাবা নাকি বলতেন ভালোবাসার রাজ্যে যোগ্য-অযোগ্য ব'লে কোনো কথাই নেই।

—কি জ্বালা, ভালোবাসার কথা কে বলেছে? আমি বলছিলাম বিয়ে করার কথা।

থেকে থেকে রাঙা দিদিমণির মনটাকে একটা ছুরির মতো মনে হয়। কি কঠিন কি ধারালো। মল্লিকা উঠে পড়ে, আজ কোথাও মন বসছে না।—যাই, রাঙা দিদিমণি, মিমিদিরা পুরী যাবেন, বাড়িতে মেলা কাজ।

রাঙা দিদিমণি অমনি বলেন,—আমরাও পুরী গেছিলাম, নাটোরের বাড়িতে উঠেছিলাম। বাবা আমার মা-র জন্য মেম 'কম্প্যানিয়ন' নিয়ে গেছিলেন। ভারী সুন্দর দেখতে, চকোলেটের বাক্সের ঢাকনিতে আগে যেমনটি থাকত। মা তো রেগেই অস্থির! কেন, আমাকে ইংরিজি বলা-কওয়া অভ্যাস করাবে তা অত সুন্দরের কি দরকারটা ছিল শুনি? বাবা শেষটা কত

ক'রে মাকে ঠাণ্ডা করেন, ঐ সুন্দরীর পাশে দাঁড়ালে তোমাকে যখন আরো সুন্দরী লাগে, তখন আমার কেমন গর্ব'ত হয় বল তো? ছোঃ, মেমরা আবার আমাদের সুন্দরীদের কাছে লাগে নাকি—! মা তো গলে জল—

এই সময় মিনামাসিমা এসে পড়েন,—ঐ আবার শুরু হয়েছে! মা, সত্যি তুমি তোমার বাবা সম্বন্ধে ওরকম সব গল্প সকলের কাছে কোরো না, তোমার সে সব মনে থাকাও সম্ভব নয়—

—কেন সম্ভব নয়, আমার তখন দশ বছর বয়স ছিল না? মেম রাত্রে কালো লেস্-বসানো গোলাপী স্যাটিনের নাইট-সেমিজ পরে ঘুমোত, লোম-দেওয়া উঁচু গোড়ালি চটি পায়ে দিত, সে পর্যন্ত আমার মনে আছে—তুই বললেই তো—

মিনামাসিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় মনেই আছে তোমার। কিন্তু মল্লিকার যে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া আজ রুমাকে আমাকে পলাশ চেম্বার মিউজিক শোনাতে নিয়ে যাচ্ছে, রুমার সখ হয়েছে। এবার সুন্দরীকে ডেকে দিই, কেমন?

মল্লিকা নীরবে বিদায় নেয়। মিমিদিরা তার জন্য পথ চেয়ে রয়েছেন। মিনামাসিমা ডেকে বলেন,—কাল বিকেলের দিকে তুমি একবার না এলেই নয়, মল্লিকা। আমাদের সেই চ্যারিটি ফেয়ার নিয়ে প্রতি বার মহা গণ্ডগোল হয়, জানোই তো, মিটিং-এ তাই তোমার থাকা দরকার। রুমা পলাশ কোথায় যাবে না যাবে তার ঠিক নেই, তা ছাড়া পলাশের সঙ্গে বিপাশার দেখা হয় সেটা আমি আদৌ চাই না, দেখলেই তো ওকে খুবলে খাবে।

সেই বিপাশা। বিপাশার কথা ভুলেই গেছিল মল্লিকা।

বারো

বাড়িতেও মন টিকছিল না। মিমিদির যেমন কাণ্ড, যাচ্ছেন দেড় মাসের জন্য, তা রাজ্যের লটবহর না নিলেই নয়। শেষ মুহূর্তে বেড়ালদেরও নেবেন ব'লে বায়না ধরেছিলেন, অনেক কষ্টে পুরীতে বেড়াল হারালে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, ইত্যাদি ব'লে তাঁকে ঠেকাতে হয়েছিল। এইসব নিয়েই মিমিদি অষ্টপ্রহর ব্যস্ত। যে মানুষ সহজে বাড়ির বাইরে পা দেয় না, সহসা দড়িদড়া কেটে গেলে তার যেমনটি হয়, মিমিদিরও যেন তাই হলো। আর যেন এক দণ্ড তর সইছিল না। মিমিদির বুকের মধ্যে কুড়ি বছর ধরে যে ছেলে-মানুষটি চাবি-বন্ধ ছিল, প্রায় এক বছর এক বাড়িতে বাস করা সত্ত্বেও যার কথা মল্লিকা সন্দেহ করেনি, সে যেন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে গেল। মিমিদি বাক্স-প্যাঁটরা খুলে, বহুদিনের অযত্নে ফেলে-রাখা জিনিসপত্র টেনে বের করতে লাগলেন। সোমনাথবাবু যেমন খুশিও হলেন আবার একটু ভাবনাও হলো। বারবার ডাক্তারবাবুকে এমন অহেতুক চাঞ্চল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

—এক মিনিট বসতে চায় না ডাক্তারবাবু, শেষটা কিছু হবে-টবে না তো? সেখানে গিয়ে—

ডাক্তারবাবু তাঁকে আশ্বাস দেন,—না না চেঞ্জ ভালো, তা ছাড়া পাড়াতেই একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন রয়েছেন, অত ভাবনা কিসের?

বিকেলে মল্লিকাকে মিনামাসিমাদের চ্যারিটি ফেয়ারের মিটিং-এ যেতে হয়। এটি একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান, মিনামাসিমাদের বাগানেই হবে না লেডি চক্রবর্তীর বিশাল বাড়িতে

হবে, তাই নিয়ে প্রতি বছর নিদারুণ মন কষাকষি হয়। শেষ পর্যন্ত একটা অলিখিত নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে এক বছর এ বাড়িতে, পরের বছর ও বাড়িতে হবে। এবার অকালে বৃষ্টি হচ্ছে ব'লে লেডি চক্রবর্তী বলে বসলেন, বাইরের আয়োজন করাটা ঠিক হবে না, স্টল ইত্যাদি তুলতে খরচও নিতান্ত কম হয় না, শেষে বৃষ্টি নামলে সব পণ্ড। তার চাইতে এ বছরও ওঁদের বাড়িতেই করলে সেদিক দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, আবার অন্য সুবিধাও আছে।

মিনামাসিমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি অন্য সুবিধা?

এবার আর রাঙা দিদিমণিকে কেউ ঠেকাতে পারেনি। সবার আগে নীচে নেমে এসে, প্রথম লাইনের ঠিক মাঝখানের বড় চেয়ারটি আধ ঘণ্টা আগে থাকতেই দখল করেছিলেন। মিনামাসিমা তাঁকে আর ঘাঁটাতে সাহস পাননি।

দূর থেকে মল্লিকাকে দেখতে পেয়ে রাঙা দিদিমণি ইসারায় তাকে কাছে ডেকে কানে কানে ফিসফিস করে বললেন,—কি অন্য সুবিধা বুঝেছিস কি না? অর্থাৎ বাড়তি কেক মিষ্টিগুলো ওঁর গুরুদেবের সেই অনাথ-আশ্রমে চালান যাবে, বুঝলি?

রাঙা দিদিমণির ফিসফিস কথা ঘরময় শোনা যায়, একটা চাপা হাসির গুঞ্জন ওঠে।

মল্লিকা জোরে জোরে বললে,—ভালো-ই তো, সে বেচারারা একটু খেয়ে বাঁচে।

রাঙা দিদিমণির একটু অভিমান হয়, গাল ফুলিয়ে বলেন,—বেচারারা আবার কি? আমিও তো কেক খেতে পাই না, আমাকেও তো কোনো মিষ্টি জিনিস দিতে চায় না।

মল্লিকার মায়া লাগে; রাঙা দিদিমণির কানে কানে বলে,—তাতে কি হয়েছে, আমি তোমাকে ওয়াল্ট ডিজনির ফিল্ম দেখাব।

—কবে দেখাবি?

—আসছে মাসে, মাইনে পেয়েই দেখাব।

—উপরতলায় নিয়ে যেতে হবে কিন্তু আমি নিচে সাধারণ লোকদের সঙ্গে বসতে পারব না।

—আচ্ছা তাই দেখাব।

—কিন্তু আমি তো কখনো শুধু মেয়েদের সঙ্গে ফিল্ম দেখি না।

মল্লিকা মুগ্ধ হয়। যে বাড়িতে ছেলে জন্মায় না, সে বাড়ির উপযুক্ত কথাই বটে। হেসে বলে,—আচ্ছা, পলাশকে নিয়ে যাব।

—কিন্তু তাহ'লে তো রুমাকে বাদ দিলে চলবে না।

—বেশ, তবে পলাশকে নেব না, অন্য কাকেও নেব।

—কাকে নিবি?

ক্লান্ত চোখে মল্লিকা ঘরময় তাকায়, সত্যি তো পলাশ ছাড়া আর কাকে নেওয়া যায়?—আচ্ছা, রুমাকেও নেব।

—না রুমা গেলে আমি যাব না। ও থাকলে কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইবে না, থাক ফিল্ম।

তাঁকে ভোলাবার জন্য মল্লিকা বলে,—ঐ দেখ, বিপাশা এসেছে।

বিপাশা যেখানে যায়, সঙ্গে ক'রে বিদ্যুৎ-বজ্র নিয়ে যায়। মিনামাসিমাদের সমস্যার শেষ পর্যন্ত কি সমাধান হলো মল্লিকার আর শোনা হলো না। বিপাশাকে দেখে মিনামাসিমা নিজেই ব্যস্ত হয়ে উঠে এলেন।

—কি করা যায়, ও মল্লিকা, রুমা পলাশকে তো কিছুতেই সরাতে পারলাম না, ঐ মেয়ে এখুনি কি কাণ্ড করে দেখিস। নেশাখোররা যেমন আঁচে আঁচে ঠিক তাড়ির দোকান খুঁজে বের করে, বিপাশাও তেমনি টাকার গন্ধ পায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ পল্লবিত চোখ দিয়ে সমস্ত ঘরখানিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে নিয়ে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে ঠিক পলাশের পাশে গিয়ে বসল বিপাশা।

মিনামাসিমা ডাক দিলেন,—ও বিপাশা, এদিকে এসো, মা-র সঙ্গে দেখা করবে না?

বিপাশা হেসে বললে,—আপনার কোনো ভয় নেই, মাসিমা, আমি কিছু করব না।

বিপাশার দাঁতগুলি মুক্তার সারির মতো কিন্তু আঙুলগুলি ঈষৎ ধারালো। মিনামাসিমা চাপা গলায় মল্লিকাকে বললেন,—দেখলে, আস্পর্ধা! একটা স্বামীকে খেয়ে, তার একগাদা টাকা পেয়েছে; আরেকটাকে বিদেয় ক'রে তার কাছ থেকে একগাদা অ্যালিমনি পাচ্ছে; তবু লোভ যায় না! ছিঃ, মেয়েমানুষের লোভ ভালো নয়।

ভাঙা ভাঙা টুকরো কথা মল্লিকার কানে পৌঁছয়, কোনোটার কিছু মানে খুঁজে পায় না। কিন্তু কোথায় যে কি একটা বাদ পড়ে গেছে ঠিক বুঝতেও পারে না। বিপাশা উঠে এসে মল্লিকাকে আদর ক'রে বলে,—ডার্লিং, সবাই বদলায় শুধু তুমি সেই রকমই থাকো।

মল্লিকা মাথা নাড়ে,—না বিপাশা, আমি বদ্‌লেছি। সে আমি আর নেই। তুমি কি করছ আজকাল?

—ডার্লিং, আমি একজন এমনি মিষ্টি নেচারোপ্যাথকে আবিষ্কার করেছি যে দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে।

—নেচারোপ্যাথ আবিষ্কার করেছ? সে আবার কি, বিপাশা?

—তোমাকে দেখাতে ইচ্ছে করছে; এতো মিষ্টি যে কি বলব। কিন্তু ভয়ও হচ্ছে, সে আবার গুণের ভারী ভক্ত, শেষটা যদি তুমি ভাগিয়ে নাও।

—তোমার কোনো ভয় নেই, বিপাশা, নেচারোপ্যাথ ভাগাবার আমার আর সময় কোথায় বলো? তা ছাড়া গুণই বা কোথায় পাই?

বিপাশা একগাল হেসে মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে,—ঠিক তো! কি জানো ডার্লিং, তুমি কোনোরকম মেক্-আপ লাগাও না কিনা, তাই হঠাৎ দেখলে তোমাকে গুণী ব'লে ভুল হয়।

রুমা আর পলাশ-ও উঠে এসেছে। পলাশ বললে,—না, না, আপনার কোনো ভুল হয়নি, মল্লিকার অনেক গুণ আছে এবং সেগুলি প্রকাশ না করাটাই হলো তার মধ্যে সবচাইতে বড় গুণ।

পলাশ কথা কইতে শিখেছে। কানে শুনতে ভালো লাগে কিন্তু কোনো মানে হয় না এমন কথা বলতে পলাশ শিখে গেছে। মল্লিকা দরজার দিকে তাকাতেই পলাশ তার কানে কানে বলে,—আবার যদি চলে যাও, আমি একটা সীন্ ক্রিয়েট করবো ব'লে রাখলাম।

মল্লিকা গম্ভীরভাবে বললে,—যাবার আমার কোনো ইচ্ছাই নেই। বিপাশার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

বিপাশা হেসে বলে,—বাঃ, তা হবে না? ও যে আমার নেচারোপ্যাথ-এর বন্ধু; একসঙ্গে থাকে, ওর সঙ্গে আমার রোজ দেখা হয়। তুমিও চেনো বুঝি শম্ভু সরকারকে?

পলাশ বলে,—না, ওরা শম্ভু বেচারাকে পছন্দ করে না। শম্ভু থিয়েটার দেখে, রেসে যায়, তাই এদের বাড়িতে সে একেবারে অচল।

মল্লিকার বিরক্ত লাগে।—যাকে চোখে দেখলাম না কোনোদিন, তাকে পছন্দ-অপছন্দ-র

কথাই ওঠে না।

—না ডার্লিং, রাগ করছ কেন বল তো? শম্ভু জনসমাজে যত আন্‌পপুলার হয়, আমি ততই খুশি হই। আমি কি রকম জেলাস্ প্রকৃতির মেয়ে তুমি তো জানোই, মল্লিকা। ঐ জেলাস্ স্বভাবের জন্য রবীনের সঙ্গে আমার একেবারে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল, নইলে ওর গোটা বাড়িটা এয়ার-কণ্ডিশন্ করা ছিল, অমনটি আর কোথায় পাবো বলো? পলাশ, ভালো লাগছে এখানে তোমার? এর চেয়ে শম্ভুর বাড়িটা অনেক ভালো নয় কি?

রুমা এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, এবার বললে,—পলাশের খুব ভালো লাগছে এখানে, না পলাশ? তা ছাড়া পলাশ আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ওকে আমরা অল্প ক'দিনের মধ্যে কেমন কায়দাদুরস্ত ক'রে দিয়েছি, মল্লিকা জানে। তাই না মল্লিকা?

মল্লিকা আর কি জানে পলাশের কথা? রামকৃষ্ণপুরে যারা বাস করে, তারা কথার কারিগরি জানে না; তারা মনের কথা হয় ব'লে ফেলে, নয় চেপে রাখে। আগ্রায় যারা পাশাপাশি বাড়িতে মানুষ হয়েছিল, তারাও মনের কথা গোপন করতে জানত না। কিন্তু হৃদয়ের গভীর তলদেশে যে কথা নিরন্তর পাঁড়া দিতে থাকে সে যদি বলবার মতো না হয়, দুই হাতে যার কণ্ঠ রোধ ক'রে ধরলেও যে কথা নীরব হয় না, তাকে নিয়ে মল্লিকা কি করবে?

স্বাভাবিক কণ্ঠে মল্লিকা বললে,—চ্যারিটি ফেয়ারের কি স্থির হলো শুনে আসি গিয়ে। তা ছাড়া সত্যিই আমাকে শীগ্‌গির ফিরতে হবে।

[আগামীবারে সমাপ্য]

বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের সমস্যা

বিনয় ঘোষ

অবশেষে সত্যিই যেদিন রাখালের পালে বাঘ পড়েছিল, সেদিন তার চীৎকারে কেউ কর্ণপাত করেনি। বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের সমস্যার কথা অনেকদিন্ ধরেই শোনা যাচ্ছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই তার গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছিল। শেষপাদ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যন্ত গুঞ্জনের গাম্ভীর্য বেড়েছে। তার পর থেকে রীতিমত তা কোলাহলে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে কোলাহল রূপ নিয়েছে সোরগোলে। কিন্তু সেদিনের গুঞ্জনের সুরে যারা সাড়া দিয়েছিল, আজকের কোলাহলে ও সোরগোলে তারা কালা হয়ে বসে আছে। অর্থাৎ রাখালের পালে বাঘ যখন সত্যিই পড়েছে তখন কারও দেখা নেই, প্রতিবেশীরাও উদাসীন। সমস্যা অস্বীকার করার আগ্রহ যাঁদের মধ্যে প্রবল, তাঁদের মানসিক অবস্থা কতকটা অসহায় রোগীর ব্যাধি অস্বীকার করার মতন। সঙ্কটের সেটাও একটা উপসর্গ। সমাহিতি সবসময় স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। নিজেরাই যখন সজাগ নই, তখন প্রতিবেশীদের কথা স্বতন্ত্র। তা ছাড়া, প্রতিবেশীদের নাবালকত্বের কাল যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তারও খেয়াল নেই আমাদের। আজ তারা সাবালক হয়েছে। সমানে-সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জীবন-রণাঙ্গনে রাখালের চীৎকারে আজ কর্ণপাত করার অবকাশ নেই কারও। বাঙালীর অভিমান বেশি। অল্প আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়াও কতকটা যেন তার জাতীয় স্বভাব। বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের কণ্টকিত পথে চলার চেয়ে হৃদয়বৃত্তি ও ভাবালুতার পুষ্পিত পথেই চলতে সে অভ্যস্ত বেশি। তাই সঙ্কটের দিনেও কাব্য-কথা-সাহিত্যের মনোহর বাগিচা রচনাতেই তার আত্মতৃপ্তি। কিন্তু গৃহকোণের নিভৃত বাগিচায় বৃহত্তর সমাজের ল্যাণ্ডস্কেপের সামান্য আভাস ছাড়া আর কিছু নেই। সমাজের জীবন-প্রবাহচিত্র তাতে সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হয় না। যেটুকু হয় তারও সবটুকু বাস্তব কিনা বিচার্য। যত দিন কাটছে দেখা যাচ্ছে, হাত ঘুরিয়ে নাড়ু দেখিয়ে আর বুদ্ধিমানের মন ভুলিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কোন দেশেই হচ্ছে না। বাঙালীর ক্ষেত্রে যেটুকু হচ্ছে তা তার বিশ্লেষণবিমুখ মনের বিশিষ্ট গড়নের জন্য। তাই সমস্যার বা সঙ্কটের অনুধ্যানের চেয়ে, বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের মনে অভিমান ও অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে বেশি। কিন্তু ব্যক্তি ও বহির্জীবনকে সংযুক্ত করার কাজে মনের পেশা কেবল ঘটকালির করা নয়। মনটাকে যাঁরা অনুঘটক বা 'ক্যাটালিটিক এজেণ্ট' মনে করেন তাঁরা অন্যের তো দূরের কথা, নিজেদের মনের কথাই জানেন না। মানুষের মন আর যাই হোক, ঘটক নয়। মনেরও গড়ন বদলায়, জীবনতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে। নৈয়ায়িক বাঙালী একদিন ভাবালুতার পিচ্ছিল পথে যেমন আছাড় খেয়ে পড়েছিল, তেমনি আবার জীবনের নতুন স্রোতের টানে ন্যায় ও আবেগের সমন্বয় ঘটিয়ে সোজা হয়েও সে দাঁড়াতে পারে। ভবিষ্যতের সেই 'একদিনের' কথা আপাতত আলোচ্য নয়। বর্তমানের সমস্যাই বিচার্য।

বিদ্বৎ-সমাজের সমস্যা অনেক, সঙ্কটের কারণও একাধিক। প্রথম সমস্যা বহু পুরাতন অন্নসমস্যা বা জীবিকার সমস্যা। বুদ্ধিতে যখন পেট ভরে না এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যখন দেখা গেছে যে পেট না ভরলে বুদ্ধিও পুষ্টিলাভ করে না, তখন বাধ্য হয়ে

বুদ্ধিজীবীকেও অন্যান্য সূক্ষ্মচিন্তার সঙ্গে অন্নের স্থূলচিন্তা করতে হয়। সে-চিন্তা সাধারণত বুদ্ধি বা প্রতিভার অনুশীলনে সাহায্য করে না। কথাটা সত্য হিসেবে খুব স্থূল হলেও অনেক সময় এই স্থূল সত্যটাকেও বুদ্ধির সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করে এমন-ভাবে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা হয় যে বুদ্ধিজীবীও যে অন্নজীবী মানুষ তা বিশিষ্ট বুদ্ধিমানদেরও খেয়াল থাকে না। দ্বিতীয় সমস্যা হল, সামাজিক বিরোধের সমস্যা। দুর্ধর্ষগতি যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে সমাজের সর্বাঙ্গিক গড়ন যত দ্রুত বদলে গেছে ও যাচ্ছে, মানুষের মনের গড়ন তত দ্রুত বদলাচ্ছে না, বদলাতে পারেও না। সমাজের গতি যতটা যান্ত্রিক হতে পারে, মানুষের মনের গতি কখনই তা হতে পারে না। বুদ্ধিজীবীদের মন সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ বলে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ধ্যানধারণার নোঙর খুলতে দ্বিধা আরও বেশি হয় তাঁদের। সামাজিক শ্রেণী বলে তাঁরা গণ্য হন বা না-ই হন, তাঁদের আত্মচেতনার প্রাখর্য শ্রেণীচেতনার তুলনায় বেশি ছাড়া কম উগ্র নয়। এই কারণেই বুদ্ধিজীবীর মনের স্থিতি বেশি, অর্থাৎ চিন্তাধারার নির্দিষ্ট খাতের প্রতি আসক্তি বেশি। সমাজ-মানসের সঙ্গে ব্যক্তি-মানসের বিরোধও এইজন্য বুদ্ধিজীবীর স্তরে, অন্যান্য জনস্তরের তুলনায় তীব্রতর। সমাজের পরিবর্তনশীলতার গতিবৃদ্ধির ফলে এই বিরোধ ক্রমেই আরও তীব্রতর হতে থাকে। রাজনীতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রের গণরূপায়ণ বা ডেমক্র্যাটাইজেশন সংস্কৃতিক্ষেত্রে যত প্রতিভাত হচ্ছে তত আধুনিক বুদ্ধিজীবীর দীর্ঘকালের চিন্তাসংস্কারাচ্ছন্ন আড়ষ্ট মনের দ্বন্দ্ব ও সংশয় বাড়ছে। তার ফলে তৃতীয় সমস্যা মননসঙ্কট দেখা দিচ্ছে।

অন্নচিন্তায়, অথবা আরও প্রাঞ্জল করে বলতে গেলে, অর্থচিন্তায় অনন্যমনা যিনি তাঁকে হয়ত বুদ্ধিজীবীর মর্যাদা দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হবেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে একালের বুদ্ধিজীবীরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এই সংস্কার নিয়ে। বিদ্যাবুদ্ধির চর্চার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কোন সম্পর্ক নেই, টাকাকড়ির স্পর্শ থেকে তাকে মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধিজীবীরা এমন এক উচ্চমার্গের ধ্যানমগ্ন সাধক, যেখানে সামাজিক জীবনস্রোতের কোনরকম কদর্যতার প্রভাব পৌঁছতে পারে না। বহুদিন তাই আইনজীবী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বুদ্ধিজীবীর পবিত্র পংক্তিতে ঠাঁই পাননি। কবি-সাহিত্যিকরাও অনেকদিন পর্যন্ত নিজেদের রচনার অর্থমূল্য গ্রহণ করতে সঙ্কোচবোধ করতেন এবং সেই-জন্য গোড়ার দিকে তাঁরা মুদ্রণেরও বিরোধী ছিলেন। সংস্কার যে অনেকটা সহজাত তা আধুনিক বুদ্ধিজীবীর এই মনোভাব থেকেই বোঝা যায়। রাজসভার নিরুপদ্রব পরিবেশে যাঁদের অতীত জীবন কেটেছে, হঠাৎ জনসমাজের দিকে অগ্রসর হতে তাঁরা স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করেছেন। তাছাড়া মানমর্যাদা হারাবার ভয়ও তখনও প্রবল হয়নি। মধ্যযুগের সমাজে মানমর্যাদার মানদণ্ড স্থির ছিল এবং প্রধানত তা ছিল কুলবংশানুক্রমিক। অর্থের প্রভাবে তার পরিবর্তন হত না। পুরোহিত-যাজকদের মতন বুদ্ধিজীবীরাও মানমর্যাদার দিক থেকে স্পর্শাতীত ছিলেন। যে-সমাজে মর্যাদার কোন 'মোবিলিটি' ছিল না, সে-সমাজের বুদ্ধিজীবীরা যে বুদ্ধির শুচিতার বড়াই করবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অর্থের ছোঁয়াচ থেকে বিদ্যাচর্চাকে মুক্ত রাখার সঙ্কল্পও তখন অবাস্তব ছিল না। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজের চলার গতিতে বুদ্ধিজীবীর এই দম্ভের স্তম্ভ চূর্ণ হয়ে গেল।

নতুন সমাজে মানমর্যাদা কীর্তি-কৃতিত্বের অন্যতম তো বটেই, প্রায় একক মানদণ্ড হয়ে দাঁড়াল অর্থ। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের সাধনা ও সাফল্যকে অতিক্রম করে আর্থিক সাফল্যের প্রতিপত্তি স্বীকৃত হল সমাজে। তা যখন হল তখন অর্থমোহমুক্ত সাধনার উচ্চমার্গ থেকে বিদ্যাবুদ্ধিকে মর্ত্যের জীবনদ্বন্দ্বের মধ্যে টেনে নামানো ছাড়া বুদ্ধিজীবীদের গত্যন্তর রইল না। অতীত আদর্শের কুশপুত্তলি দাহ করে তাঁরা যুগোপযোগী আদর্শের নতুন প্রতিমা গড়ে তুললেন। এই প্রতিমার বাঁশখড়ের কাঠামটি হল অর্থ এবং তার উপর রঙচঙের সযত্ন প্রলেপটি হল বুদ্ধিজীবীদের নতুন কৃত্রিম আভিজাত্যের চেকনাই। এর প্রথম প্রকাশ হল রিনেস্যান্সের যুগের হিউম্যানিস্ট বিদ্যাকে বাজারের পণ্য করবার চেষ্টায়। অর্জিত বিদ্যাও যে যেকোন উৎপন্ন পণ্যের মতন আর্থিক বিনিময়মূল্য দাবি করতে পারে, হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীরা দৃঢ়কণ্ঠে তা ঘোষণা করলেন। তার জন্য বিদ্বানকে প্রথমে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হল বটে, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির কেনাবেচায় সেই দেবত্ব কোন বাধা হয়ে দাঁড়াল না। ইনিয়াস সিলভিয়াস বললেন, দেবতার সঙ্গে সাধারণ মানুষের যা পার্থক্য, বিদ্বানের সঙ্গে মূর্খের পার্থক্য তাই। একথা বলেও, হিউম্যানিস্টরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধির মূলধন খাটিয়ে (ক্যাপিটালিস্টদের আর্থিক মূলধনের মতন) মুনাফালাভের জন্য তৎপর হলেন। 'মুনাফা' কথাটাই এখানে প্রযোজ্য, কারণ খোলাবাজারে সর্বাধিক চড়ামূল্যে বিদ্যার বিনিময় করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। বাজার হল টাউন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তন, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। মার্টিন বলেছেন, অনেকক্ষেত্রে হিউম্যানিস্টদের এই প্রচেষ্টাকে 'ব্ল্যাকমেইল' ছাড়া কিছু বলা যায় না এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি পিয়েত্রো আরেতিনোর নাম উল্লেখ করেছেন। আরেতিনোকে তিনি বলেছেন, রিনেস্যান্সের যুগের 'সাহিত্যিক দুর্বৃত্ত ও দস্যু', কারণ তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজের রচনা বিক্রী করে এবং অন্যকে অগ্নিমূল্যে তা কিনতে বাধ্য করে, প্রচুর অর্থ উপার্জন করা। মার্টিনের উক্তি আরেতিনো সম্পর্কে স্মরণীয় :[১]

> He already represented the type of 'literary highwayman' (V. Bezold); his one wish was to make money by selling or forcing others to buy his pen. Yet this cynic, this professional literary blackmailer, represented the last 'refinement' of the type which was using its intellect for financial ends, the 'philosopher of money', tearing down the last barriers of traditional morality, of literary decency and the corporate feeling of the *literati*.

অর্থলোভী সমাজের কোলাহল থেকে বিদ্যাবুদ্ধিকে কুলবধূর মতন অবগুণ্ঠিত রাখার জন্য বুদ্ধিজীবীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা এইভাবে অবস্থাচক্রে ব্যর্থ হয়। বুদ্ধি ও বিদ্যা এত বেশি পণ্যময় হয়ে ওঠে যে সিমেলের মতন বুদ্ধিমানরা টাকার সঙ্গে 'ইণ্টলেক্টের' স্টাইলিস্টিক সম্পর্কের কথা পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেন। সিমেল বলেন, আধুনিক যুগের বিদ্যাবুদ্ধি হল টাকার মতন নীতিবহির্ভূত বা 'অ্যা-মরাল' এবং নিরপেক্ষ বা 'নিউট্রাল'। টাকার যেমন নিজস্ব কোন চরিত্র নেই, কোন নীতি বা আদর্শ নেই, আধুনিক মানুষের বিদ্যাবুদ্ধিরও তেমনি কোন চরিত্র বা নীতি নেই। ঠিক ম্যানুফ্যাকচার্ড কমো-ডিটির মতন বাজারে তা কেনাবেচার জন্য লভ্য এবং ডিমান্ড-সাপ্লাইয়ের হ্রাসবৃদ্ধি অনুপাতে তার বিনিময়-মূল্য নির্ধার্য।

---

১ Alfred Von Martin: *Sociology of the Renaissance*, p. 39.

বিদ্যাবুদ্ধি ও টাকার প্রকৃতিগত ঐক্য অনস্বীকার্য হলেও, দুই মূলধনের মালিকের মধ্যে বিরোধও ছিল গোড়া থেকে। বিদ্বান-বুদ্ধিমানের সঙ্গে বিত্তবানের বিরোধ। এই বিরোধ পরবর্তীকালে ক্রমেই কিভাবে তীব্র হয়ে ওঠে এবং সেই তীব্রতার কি মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব। আপাতত আলোচ্য হল, বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পূর্বোক্ত যুগলক্ষণের প্রকাশের বৈশিষ্ট্য কি এবং রিনেস্যান্সের পরিণতির সঙ্গে তার কোন পার্থক্য আছে কি না।

প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে আধুনিক বাঙালী বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাবকাল থেকেই ছিল না। বাংলার ও ইয়োরোপের মধ্যে ঐতিহ্যগত ও সামাজিক অবস্থাগত যে পার্থক্য ছিল তার জন্য এদেশের বুদ্ধিজীবীর অগ্রগতির পথ খানিকটা ভিন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু চারিত্রিক ভিন্নতা কিছু ঘটেনি। বরং এদেশের শাসক হয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সংস্পর্শে আরও দ্রুত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের যুগোপযোগী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছিল। বাংলার হিউম্যানিস্ট বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ-স্থানীয় রামমোহন ও বিদ্যাসাগরও এই যুগপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। বিদ্যা ও বাণিজ্যের মধ্যে যে প্রকৃতিগত ঐক্য আছে, তা তাঁরা গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেকালের বিস্বৎ-জনের মতন বিদ্যাবুদ্ধির অপার্থিব শুচিতা সম্পর্কে তাঁদের কোন সংস্কার ছিল না। কেবল হিন্দু কলেজে নয়, সংস্কৃত কলেজেও যাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরাও বিদ্যার পণ্যময়তায় বীতশ্রদ্ধ হননি। ইংরেজ শাসকরা শুরু থেকেই চাকরি ও টাকার সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধিকে এমনভাবে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন যে এদেশের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা করে তা আবিষ্কার করতে হয়নি। এ যুগের বিদ্যা ও বিত্তের দাম্পত্য সম্পর্ক কতকটা স্বতঃস্ফূর্ত সত্যের মতন তাঁদের উন্মীলিত বুদ্ধির সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই কথায় কথায় জনপ্রবাদের মতন শোনা গেছে—'লেখাপড়া করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে'। সেকালের রাজসভার প্রসাদপুষ্ট পণ্ডিতেরা এমন লোভনীয় কথা তাঁদের টোল-চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের বলতে পারতেন না। কিন্তু আধুনিক যুগে লেখাপড়ার সঙ্গে গাড়ীঘোড়াকে এমনভাবে যুতে দেওয়া হল যে অধিকাংশ বিস্বানের অদৃষ্টে তা ছ্যাক্‌রাগাড়ী হলেও আজও তার অবিশ্রান্ত ঘর্ঘরানি থামেনি।

আধুনিক যুগের প্রায় প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যকতা যে আছে ও অনেক বেড়েছে তা কেউ অস্বীকার করবেন না। বিদ্যার বহুরকমের স্তরভেদ ও শ্রেণীভেদ আছে, তাও সকলে জানেন। ব্যবহারিক বিদ্যার সঙ্গে অর্থের সম্পর্কও প্রত্যক্ষ হতে বাধ্য। তা ছাড়া, বিদ্যাবুদ্ধিজীবী অন্নজীবী বলে বিদ্যার উচ্চস্তরেও তা বায়ুভুক্ষ হতে পারে না এবং অর্থচিন্তা থেকে তার নিষ্কৃতিও সম্ভব নয়। রাজা-জমিদাররা যখন আর ভূমিদান বা প্রসাদ বিতরণ করেন না, তখন উচ্চমার্গের ইন্‌টেলেক্টের সাধকরাও যদি বর্তমান রাষ্ট্রিক বা সামাজিক পোষকতাপ্রার্থী হন, তাতেও দোষ নেই। বিদ্যার একনিষ্ঠ চর্চাকে অব্যাহত রেখে এবং বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করেও এসব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করতে কোন বাধা হত না। কিন্তু তা হয়নি, বাধা হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজেও হয়েছে, আমাদের সমাজেও হয়েছে। সমাজের সঙ্গে সমাজের, দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব যে-যুগে অতিদ্রুত ঘুচে গেছে, সে-যুগে বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এযুগে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জাত বাঁচিয়ে চলাও কঠিন, অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব। তাই দেখা যায়, ইয়োরোপে যেমন আধুনিক যুগে বিদ্যাবুদ্ধির বাণিজ্যিক রূপায়ন ঘটেছে, আমাদের

দেশেও তাই ঘটতে বিলম্ব হয়নি। বিদেশীর তত্ত্বাবধানে বিস্বান হবার জন্য এবং বিদেশী শাসকের প্রসাদপুষ্টির জন্য, বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধির এই পরিণতি আরও অনেক বেশি দ্রুত ঘটেছে। তার কারণ, বিদেশীর স্বার্থের চাপে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিসর্জন না দিলেও, তার অনেকটা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বাতন্ত্র্যের যেটুকু ধারা প্রথম যুগে ছিল, তা ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে পরবর্তীকালের অবস্থাগতিকে। বর্তমানের ভিন্ন পরিবেশেও সেই ধারার কোন চিহ্ন তাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর দেড়শত বছরের এই ইতিহাস নিয়ে একটা ট্র্যাজিডি রচনা করা যেতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শতবর্ষের ইতিহাস (১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত) প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সেই খাত বা খাল ইংরেজ ইঞ্জিনিয়াররাই কেটেছিলেন। সেই খাল দিয়ে শিক্ষার দাঁড় বেয়ে চলবার সময় আমরা বিদ্যার তরণীতে যে পাল তুলে দিয়েছিলাম তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল—'লেখাপড়া করে যে, গাড়ীঘোড়া চড়ে সে'। কিন্তু খাল কোন নদীতে এবং নদী কোন সমুদ্রে গিয়ে মিশল না। খাল বদ্ধ নালা হয়ে গেল, মজে গেল শেষ পর্যন্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে সামাজিক সংকট যখন গভীর হতে থাকল তখন বুদ্ধি-জীবীর মুখেই নতুন শিক্ষানীতির প্রবচন প্রহসনে পরিণত হয়ে হল—'লেখাপড়া করে যে, গাড়ীচাপা পড়ে সে'। দেখা গেল, গাড়ী যারা সত্যিই চড়ে বেড়াচ্ছে তাদের অনেকেই লেখাপড়া করেনি এবং সমাজের রাজপথে, এমন কি অলিগলিতে পর্যন্ত, যারা তার তলায় দলিত হচ্ছে তাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প নয়। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সকলের অগোচরে নিঃশব্দে যে সামাজিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে, আজ পর্যন্ত বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা তার দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। তার ফলে যে মানসিক বিভ্রান্তি, জটিলতা ও সংকট দেখা দিয়েছে, অন্নবস্ত্র ও গাড়ীঘোড়ার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, তা থেকে সর্বদেশের বুদ্ধিজীবীদের মতন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও মুক্তি পাননি।

খালকাটার কাল থেকে আরম্ভ করি। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে অ্যাংলিসিস্ট ও ওরিয়েণ্টালিস্টদের মধ্যে শিক্ষানীতি নিয়ে যে বাক্‌যুদ্ধ চলছিল, লর্ড মেকলে তার মীমাংসা করে দিয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রস্তাবে বললেন : বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে সমাজে যাঁরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবেন। তাঁরা রক্ত-মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবেন বটে, কিন্তু রুচি মতামত নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবেন খাঁটি ইংরেজ।২

> We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.

বাঙালী কেন, বৃটিশ আমলের ইংরেজীশিক্ষিত শহুরে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ঐতিহাসিক চরিত্র মেকলের এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাঙালীদের মধ্যে আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠেছে, কারণ আধুনিক কালোপযোগী বিদ্যাবুদ্ধি অর্জনের

২ H. Woodrow: *Macaulay's Minutes on Education in India* (Cal. 1862), p. 115.

পথে সোৎসাহে যাত্রা করার সুযোগ তাঁরাই পেয়েছিলেন সর্বাগ্রে। এই দোভাষী বুদ্ধিজীবী-দেরই ঐতিহাসিক টয়েন্‌বি বলেছেন 'লিয়াজোঁ অফিসারশ্রেণী'।

সভ্যতার পতনের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে টয়েন্‌বি এই বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকে বলেছেন পাশ্চাত্ত্য জগতের 'ইণ্টারনাল প্রলেটারিয়েট'। দুই সভ্যতার সংঘাতকালে বিজয়ী উদ্‌বেধক সভ্যতার রীতিনীতি ও কলাকৌশল দ্রুত আয়ত্ত করে বুদ্ধিজীবীরা নতুন সামাজিক পরিবেশে উদ্‌বর্তনের যোগ্যতা অর্জন করেন এবং মনে ভাবেন যে দুই সভ্যতারই উৎকৃষ্ট ফল তাঁরা। স্বদেশের ও বিদেশের উভয় সমাজের মানুষের কাছে তাঁরা অপরিত্যাজ্য। কিন্তু যত দিন যায় তত দেখা যায়, তাঁদের এই সামান্য সান্ত্বনাটুকুরও ঠাঁই নেই সমাজে। মানুষ নিজেই যে-সমাজে পণ্যতুল্য বা কমোডিটির মতন, সেখানে তার ডিম্যাণ্ড-সাপ্লাইয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সাধনাতীত ব্যাপার। সুতরাং আধুনিক বিদ্যাযন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানায় যখন পূর্ণবেগে বুদ্ধিজীবী ম্যানুফ্যাক্‌চার্ড হতে থাকে তখন অল্পদিনের মধ্যেই বাজারের ডিম্যাণ্ড ছাড়িয়ে যায় সাপ্লাই এবং অত্যুৎপাদনের উপসর্গ হিসেবে বেকার-সমস্যা ইত্যাদি দেখা দিতে থাকে। তোড়জোড় করে উৎপাদন আরম্ভ করা যত শক্ত, বন্ধ করা তত সহজ নয়, বিশেষ করে মানুষ-পণ্যের উৎপাদন। তার উপর বিশ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষ যে-যন্ত্রে কমোডিটির মতন তৈরি হয়, সে-যন্ত্রের আবর্তন বন্ধ করা খুবই কঠিন। তার কারণ, ইনস্টিটিউশনগুলি সমাজের সবচেয়ে মজবুত যন্ত্র, একবার গড়ে উঠলে সহজে ভাঙতে চায় না। এই ইনস্টিটিউশন-যন্ত্রেই মানুষ-পণ্য তৈরি হয় সব সমাজে, বুদ্ধিজীবীরাও তৈরি হন। বাংলার সমাজেও ইংরেজ আমলে তাই হয়েছে। প্রথম যুগের কয়েকশত ইংরেজী ভাঙা-বুলিসর্বস্ব বাঙালী 'বাবু' পরবর্তীকালে হাজার-হাজার বি-এ পাশ এম-এ পাশ, বি-এ ফেল এম-এ ফেল বুদ্ধিজীবীর দলবৃদ্ধি করেছেন।৩

টয়েন্‌বির এই উক্তির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি বিখ্যাত গল্পের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। গল্পটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।৪ একবার এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন—বিদ্যাসাগর মশাই, আপনি তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র ফেলো, কিন্তু কেন এমন হয় বলুন দেখি? যে ছেলেটি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে সেও যা লেখে, যে এণ্ট্রান্স পাশ করে সেও তাই লেখে, যে এল-এ পাশ করে সেও তাই লেখে, যারা বি-এ এম-এ পাশ করে তারাও তাই লেখে। কেন এমন হয় বলতে পারেন? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের মা-বাপ, এর কি কিছু বিহিত করা যায় না? যে-সময়ের কথা হচ্ছে, তখন লাহোর ছাড়া উত্তরভারতে আর বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল না। আগ্রা থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল, নাগপুরেও ছিল, লঙ্কাও ছিল। বিদ্যাসাগর মশায় দুটি গল্প বলে একথার উত্তর দেন। তার মধ্যে প্রথম গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর বলেন—'সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই হাতার মধ্যে ছিল। হিন্দু

৩ 'The intelligentsia is a class of liaison officers who have learnt the tricks of the intrusive civilisation's trade . . .' (P. 394).
'The handful of chinovniks is reinforced by a legion of 'Nihilists', the handful of quill-driving babus by a legion of 'failed B.A.s'; and the bitterness of the intelligentsia is incomparably greater in the latter state than in the former.' (P. 395)—Arnold Toynbee: *A Study of History*.

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভূমিকা।

স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খেত। আমরা দেখতাম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খেতে পারতাম না। কিন্তু দেখতে দেখতে যখন নেশা করার ঝোঁক প্রবল হল তখন আমরা কতকগুলি উঁচুক্লাসের ছেলে বাধ্য হয়ে সস্তায় ছিটে ধরলাম। অল্প খরচে বেশ নেশা হত। রুমে যখন একটু পেকে উঠলাম, আট-দশ ছিটে পর্যন্ত একটানে খাওয়া অভ্যাস হল, তখন আমাদের সখ হল যে বাগবাজারের বড় বড় গুলিখোরদের সঙ্গে টক্কর দেব। একদিন বাগবাজারের আড্ডায় গিয়ে দেখি, হলঘরে বসে সকলেই বেশ মৌজ হয়ে গুলি টানছে। হলঘরের পূর্বদিকে সবাই মাটিতে বসে খাচ্ছে, উত্তর দিকেও তাই, পশ্চিম-দিকেও তাই। কেবল দক্ষিণদিকে যারা গুলি খাচ্ছে তারা সকলে সাজানো ইটের উপর বসে আছে। ব্যাপার কি, আড্ডাধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা সব ইটের উপর বসে খাচ্ছে কেন? আড্ডাধারী বলল, আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই যে যে-কেউ একটানে ১০৮টা ছিটে খেতে পারবে, তাকে একখানা ইট দেওয়া হবে বসতে। এই কথা শোনা মাত্রই আমাদের টক্কর দেবার ইচ্ছা উবে গেল। একজন আটখানা ইটের উপর বসে আছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ও তাহলে কত ছিটে খেতে পারে? আড্ডাধারী বলল, একটানে ৮৬৪ ছিটে। শুনে আমাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। টক্করের আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা গুলিখোরদের গল্প শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হলাম। দেখলাম, হাত-পা নেড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে তারা কি সব গল্প করছে। কাছে বসে গল্প শুনলাম। যে একখানা ইটের উপর বসেছিল সে বলছে—চাকর চাণক, গোল করাত, মস্ত বড় গোল। তার উপর কাঠ ফেলে দিচ্ছে, ফর্‌ফর করে কাঠ চিরে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়িবরগা, কোথাও দরজা জানলা, কোথাও কোচ-কেদারা বেরিয়ে যাচ্ছে। যে দুখানা ইটের উপর বসেছিল সে হাত নেড়ে বলল—ও আর এমন কি কল! কল হল গরফের কল। একখানা পাথরের বারকোশ, মস্ত বড় বারকোশ ঘরজোড়া, তার উপর দুখানা মোটা পাথরের চাকা আড়ে ঘুরছে। সাহেবরা তার মধ্যে বস্তা-বস্তা মসিনা ফেলে দিচ্ছে। কলের দুটো মুখ, একটা দিয়ে পিপে-পিপে তেল বেরুচ্ছে, আর একটা দিয়ে থান-থান খোল। অবশেষে যে আটখানা ইটের উপর বসেছিল সে হাত নেড়ে বলল—ওসব কল কোন কাজের নয়। আমার বাড়ী ফরাসডাঙ্গায়। বাড়ী গিয়ে দেখি একদিন, কোথাও ঘরবাড়ী পুকুর গাছপালা কিছু নেই, সব মাঠ হয়ে গেছে। শ্রীরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্যন্ত কেবল ধূ ধূ করছে মাঠ। শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুড়ঙ্গ, আর চুঁচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একটা সুড়ঙ্গ বেরিয়েছে। একটা দিয়ে পালে-পালে গরু যাচ্ছে, আর-একটা দিয়ে গাড়ি-গাড়ি আখ যাচ্ছে। মাটির ভেতর কোথায় যায়, কিছুই বুঝতে পারলাম না। অনেক খোঁজখবর করে বুঝলাম, মাটির ভেতরে কল আছে, কলের একশটা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়ে বেরিয়েছে। কোনটা দিয়ে বাতাবী লেবু, কোনটা দিয়ে মনোহরা, কোনটা দিয়ে রসগোল্লা, কোনটা দিয়ে ছানাবড়া, কোনটা দিয়ে পানতুয়া বেরুচ্ছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখলাম, সবই একরকম তার। মানে, একপাকের তৈরি কিনা!

গল্পটি শেষ করে বিদ্যাসাগর বললেন : আমাদের যেসব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাইনে নিই, পাওণা-ফি নিই, পরীক্ষার ফি নিই। সবরকমের ফি নিয়ে কলের দরজা খুলে দিই। দেখিয়ে দিই, এইখানে মাস্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, কালিকলম আছে। দেখিয়ে দিয়ে কলের ভেতর ফেলে দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দিই। কল ঘুরতে থাকে, আর তার কোন মুখ দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস, কোন মুখ দিয়ে এল-এ, বি-এ, এম-এ বেরুতে থাকে। কিন্তু টেস্ট করে দেখ, সকলেরই একরকম তার।

একপাকের তৈরি কিনা!

গল্পটি আধুনিক শিক্ষানীতির চমৎকার রূপক। একই গল্পের মধ্যে একাধিক রূপকের সমাবেশ হয়েছে। গুলিখোরদের ইটগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। সব ডিগ্রীধারী কলের গল্প বলে। যার যত বেশি ডিগ্রী তার কল তত বেশি তাজব। তিনি তত বেশি ছিটে একটানে খেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরে মাস্টার মশায় হয়ে তিনিই আবার ছাত্রদের ছিটে ধরতে শেখান এবং ধীরে ধীরে একটানে বহু ছিটে টানবার কলাকৌশলটি শিখিয়ে দেন। এও রূপক, আবার শতমুখী কলটিও রূপক। টয়েন্‌বি যে বুদ্ধিজীবীর ম্যান্‌ফ্যাক্‌চারিঙের কথা বলেছেন, বিদ্যাসাগরের রূপক গল্পের মধ্যে তার 'প্রসেস্‌টি' সুন্দরভাবে পরিস্ফুটে হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের চতুর্থ পাদেই যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যাযন্ত্রে বুদ্ধিজীবীর উৎপাদনের হার বাজারের (প্রধানত বাঁধা-মাইনের চাকরির) চাহিদা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তা বিদ্যাসাগরের গল্পের নীতি থেকে বোঝা যায়।

বাঁধা-মাইনের চাকরির ক্ষেত্র এমনিতেই সংকীর্ণ। তবু যে-সমাজে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ হয়েছে স্বচ্ছন্দগতিতে, সেখানে আপিস-ইনস্টিটিউশনের আধিক্যের জন্য চাকুরিজীবী বুদ্ধিজীবীর জীবিকার সমস্যার সমাধান অনেকটা সম্ভব। আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক বিকাশের সেরকম কোন সুযোগ ঐতিহাসিক কারণেই ঘটেনি বলে, বুদ্ধিজীবীর চাকুরির ক্ষেত্র বরাবরই সংকীর্ণ ছিল। তার উপর, সরকারী চাকুরির প্রতি এদেশের বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণ ছিল গোড়া থেকেই বেশি। কারণ তার নিশ্চিন্ততা বেশি। সেইজন্য তার সামাজিক মূল্য একসময় খুব বেশি ছিল। তিনশ টাকা মাইনের ডেপুটির সামাজিক কদর ছ'শ টাকা মাইনের সদাগরী প্রতিষ্ঠানের আফিসারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বিবাহ-বাজারের পাত্র নির্বাচনকালে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেত। সরকারী পোষকতার এই সামাজিক মর্যাদা অনগ্রসর সমাজ-জীবনের লক্ষণ। ধনতন্ত্রের অবরুদ্ধ গতির ফলে আমাদের সমাজে পশ্চিমের মতন 'ম্যানেজেরিয়াল' শ্রেণীর বিকাশ হয়নি এবং বেসরকারী স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের চাকুরির পদমর্যাদাও বাড়েনি। কেবল সরকারী বন্দরে সবরকমের বুদ্ধিজীবীর ভিড় বেড়েছে। বাংলাদেশে অনেক বেশি বেড়েছে তার কারণ বাঙালীরা স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের কর্মক্ষেত্র থেকে, উদ্যম ও ধৈর্যের অভাবে, ক্রমেই অবাঙালীদের দ্বারা স্থানচ্যুত হয়েছেন। তার ফলে এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর আন্তরিক সম্পর্ক বিশেষ গড়ে ওঠেনি। ক্রমেই তাঁদের জীবন সরকার-মুখাপেক্ষী হয়ে উঠেছে। উড সাহেব তাঁর ১৮৫৪ সালের বিখ্যাত শিক্ষাসংক্রান্ত ডেস্‌প্যাচে সরকারী চাকুরির প্রতি শিক্ষিতশ্রেণীর এই মোহের কথা মনে করেই বোধ হয় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন : ৫

> However large the number of appointments under Government may be, the views of the natives of India should be directed to the far wider and more important sphere of usefulness and advantage which a liberal education lays open to them.

উড সাহেবের হুঁশিয়ারীতে বাংলাদেশে অন্তত কোন কাজ হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কেবল তখনকার বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার

৫ Wood's *Educational Despatch* of 1854.

প্রসারে এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দানও অতুলনীয়। আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর (বাঙালী তো বটেই) কয়েক পুরুষ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচর্যাতেই মানুষ হয়েছেন বলা চলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ও যে আধুনিক যুগের সমাজের একটি দৃঢ়মূল 'ইনস্টিটিউশন', সেকথা সামাজিক সমস্যার আলোচনাকালে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যে-সমাজে যে ইন্‌স্টিটিউশন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, তার মধ্যে সেই সমাজের ভালমন্দ দোষগুণ দুইই থাকে। গুণের চেয়ে ক্রমে দোষগুলি মারাত্মক হয়ে ওঠে, কারণ প্রতিষ্ঠানের দেহে ব্যাধির বীজাণুর মতন তার ক্রিয়া হতে থাকে। সামান্য একটি বিষাক্ত বীজাণুর সংক্রমণে যেমন অতিসুস্থ মানুষও ব্যাধিগ্রস্ত পংগু হয়ে যায় এবং তার সর্বাংগে সেই বিষ ছড়িয়ে পড়ে, সামাজিক ইন্‌স্টিটিউশনের ক্ষেত্রে দোষের ক্রিয়াও ঠিক সেইভাবে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ও যেহেতু এই ধরনের একটি ইনস্টিটিউশন, এই সংক্রমণ থেকে তাই তার পক্ষেও আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই তার সর্বাংগে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, সিণ্ডিকেট সিনেট থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি বিভাগ পর্যন্ত। শিক্ষার ক্ষেত্র চাকরি ও গোষ্ঠীগত-ব্যক্তিগত প্রভুত্ব বিস্তারের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে আরও দ্রুত ব্যাপকভাবে হয়েছে, তার কারণ বাঙালী বুদ্ধিজীবী সংখ্যায় বেশি, তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশি এবং তার চেয়েও বড় কথা, কেবল সরকারী চাকরি ছাড়া সমাজের অন্যান্য স্বাধীন কর্মক্ষেত্র থেকে (যেমন অর্থনৈতিক) তাঁরা প্রায় বিচ্ছিন্ন। আধা-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তাই তাঁদের প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে যতরকমের চারিত্রিক নীচতা দীনতা সবকিছুর লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে সেই প্রতিষ্ঠান। আজ তারই পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বাংলার বিশ্বৎ-সমাজে।

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই, কিভাবে এই অসন্তোষ বাঙালী বিশ্বৎ-সমাজের মনে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত কয়েকশত সমসাময়িক আলোচনার ও সমালোচনার পুস্তকপুস্তিকা থেকে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একজন লিখছেন—সিনেটে ও সিণ্ডিকেটে এমন সব লোক ধীরে ধীরে ক্ষমতা দখল করে বসেন, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীন। সমস্ত ব্যাপারটাই কেবল প্রভুত্বের ব্যাপার হয়ে ওঠে এবং সিণ্ডিকেটের মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি সর্বব্যাপারে ও বিভাগে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব করেন। যত কমিটি, যত বোর্ড, সব তাঁদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি ও প্রভুত্বরক্ষার স্বার্থে গঠিত হয়।৬ আর একজন লিখেছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তখনকার বিশ্বানদের সঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'চারজন কৃতীদের বাদ দিলে, অধিকাংশ শিক্ষিতেরই স্ট্যাণ্ডার্ডের অনেক অবনতি হয়েছে দেখা যায়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম-যুগে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে পরবর্তীকালের শিক্ষিতদের অনুন্নততরের কোন তুলনাই হয় না। তার মানে কি এই যে বাংলাদেশে প্রকৃত প্রতিভাবানের অভাব ঘটেছে? তা নয়, শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই কোথাও মারাত্মক গলদ আছে নিশ্চয়।৭ অন্য একজন এসম্বন্ধে লিখেছেন—ক্রমেই দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি বিশ্বানদের মধ্যে প্রকৃত চিন্তাশীল

৬ Krishna Ch. Roy: *Education in India* (1901), Pp. 3-4.
৭ N. N. Ghose: *Higher Education in Bengal as influenced by the Calcutta University* (1901), Pp. 1-2.

মনীষীর বিকাশ হচ্ছে না। মৌলিক চিন্তার শক্তি শিক্ষিত বাঙালীর কমে যাচ্ছে, প্রতিভাবানের সংখ্যাও দিন দিন কমছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা, যাঁরা অধ্যাপনা শিক্ষকতা করেন তাঁরাও, লেখাপড়ার চর্চা করেন না। যা মুখস্থ করে তাঁরা একবার ডিগ্রী পেয়েছেন তাই তাঁদের সারাজীবনের মূলধন। তাতেও গলদ অনেক। কেবল মুখস্থেও কাজ হয় না, পরীক্ষক-অধ্যাপকের প্রিয়পাত্র ও মোসাহেব হওয়া চাই। একদল ব্যক্তি ঘুরেফিরে প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হন, এবং তাঁদের খেয়ালখুশি মতামত, এমনকি বিদ্যার দৌড় কতদূর সে-সম্বন্ধে অবহিত না হলে কোন পরীক্ষার্থীর কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব নয়। শিক্ষার এই ব্যবস্থার জন্যই আমাদের দেশের সংস্কৃতি ক্রমে একটি যান্ত্রিক ইণ্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে।৮

এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এরকম সমালোচনা সাম্প্রতিককালে শিক্ষাবিদ্‌রা প্রকাশ্যে অহরহ করছেন। কিন্তু অর্ধশতাব্দী আগেও যে এরকম সমালোচনা বিশ্বৎ-জনমহলে হত, এগুলি তার প্রমাণ। ইংরেজরা যে শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাকে বাস্তব রূপে দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন ইনস্টিটিউশন গড়ে তুলেছিলেন, তার পরিণাম 'শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ার' মতন হয়েছে। সমাজের অন্য আর যেকোন পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মতন হয়েছে তার অবস্থা। শিক্ষায়তনের সঙ্গে কমার্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের কোন পার্থক্য নেই। শিক্ষার লক্ষ্য যখন চাকরি (অধ্যাপনাও চাকরি) তখন বিদ্যার যেটুকু মূলধন সম্বল করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব তার বেশি বিদ্যা অনাবশ্যক। এ-সমাজে যেমন কয়েকশত বা হাজার টাকা মাত্র মূলধন নিয়ে লক্ষপতি-কোটিপতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং হয়েছেনও অনেকে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীচিহ্নিত সামান্য বিদ্যার মূলধন নিয়ে মহাবিশ্বানের স্তরেও অনেকে উন্নীত হয়েছেন। সাধারণভাবে অধ্যাপকশ্রেণীর বা শিক্ষকশ্রেণীর অর্জিত বিদ্যার স্থিতিশীলতা দেখলেই তা বোঝা যায়। গণিতের উত্তম স্কলার সারাজীবন ধরে ছাত্রদের কাছে একই ফরমুলা যন্ত্রের মতন আবৃত্তি করছেন, ইতিহাসের রত্ন পঁচিশ বছর ধরে পড়াচ্ছেন অশোকের ও আকবরের কীর্তিকথা, বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির সূত্র আওড়াচ্ছেন। পরিবর্তনশীল জ্ঞানজগতের সঙ্গে তাঁদের কোন সুদূর সম্পর্কও নেই, কারণ তা সিলেবাসে নেই এবং চাকরি বজায় রাখার জন্য তার দরকার হয় না, উন্নতির জন্যও না। নিজেদের জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রেই তাঁরা অল্পকালের মধ্যে কূপমণ্ডূক হয়ে যান। অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকে না, এবং সম্পর্ক রাখাও তাঁরা তাঁদের স্কলারশিপ-বিরোধী ব্যাপার বলে মনে করেন। গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী যিনি তিনি ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক যিনি তিনি বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও তার সাধারণ সূত্রগুলিও জানেন না। এইখানেই শেষ নয়। গ্রীক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ যিনি তিনি ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ অজ্ঞতার ব্যাপারে আদৌ লজ্জিত নন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের এক্সপার্ট যিনি তিনি উনিশ শতক সম্বন্ধে কৌতূহলীও নন। চূড়ান্ত হল, অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ইকনমিক' ইতিহাসে যিনি 'ডক্টর' উপাধি পেয়েছেন, তিনি সেই শতাব্দীরই রাজনৈতিক বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানেন না বলে গর্ববোধ করেন, কারণ ওগুলি তাঁর 'স্পেশ্যালাইজেশনের' বিষয় বহির্ভূত।

আধুনিক যন্ত্রকাণ্ড ধনমত্ত সভ্যতায় বিদ্যার হাল হয়েছে এই। হাল সম্বন্ধে এতদিন চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্‌রা সচেতন হয়েও উদাসীন ছিলেন, একেবারে হালে তাঁদের সেই

৮ *The Calcutta University as it is and as it should be*: The Editor, Pratibasi (Cal. 1901), Pp. 9-10.

উদাসীনতার ঘোর কেটেছে। সম্প্রতি তাঁরা 'হিউম্যানিটিজ' 'সায়েন্স' ও 'টেকনলজির' জ্ঞানের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেছেন। কারণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণ সমাজ-সচেতন স্থিতপ্রাজ্ঞ মানুষ তৈরি হয় না, তার বদলে আধা-মানুষ সিকি-মানুষ একপেশে ও একচোখো কাণা মানুষ তৈরি হয় দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার ফলে জ্ঞানের তৃতীয় চক্ষু তো খোলেই না, ঈশ্বরদত্ত দুই চক্ষুর মধ্যে একটি কিছুটা খোলে, অন্যটি মুদিতই থাকে। একচক্ষু হরিণের মতন অবস্থা হয় বিশ্বৎ-সমাজের। যন্ত্রযুগের খণ্ডিত-বিখণ্ডিত শ্রমের মতন শিক্ষা ও বিদ্যাবুদ্ধিও খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হয়েছে এবং যন্ত্রের এক্সপার্ট ও টেকনিসিয়ানের মতন বিদ্যারও এক্সপার্ট বেড়েছে। কোন বিরাট শিল্প-কারখানার মজুরদের মতন অবস্থা হয়েছে এযুগের সমাজ-কারখানার বিশ্বৎ-জনদের। বিদ্যার ও বিশ্বৎ-জনের এই যান্ত্রিকতা বা মেকানাইজেশন এবং অতিবিভাজ্যতা বা ডিপার্টমেণ্টালাইজেশন, আধুনিক বিশ্বৎ-সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা ও সঙ্কট। এ-সম্বন্ধে বর্তমান যুগের দুজন বিখ্যাত মনীষীর মতামতের কথা মনে পড়ছে, একজন সমাজবিজ্ঞানী, আর-একজন কবি-শিল্পী। সমাজবিজ্ঞানী ম্যানহাইম্‌ এযুগের বিশ্বৎ-জনদের এই খণ্ডিত রূপের কথা স্মরণ করেই তাঁদের কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন, যেমন 'পলিটিক্যাল', 'অর্গ্যানাইজিং', 'ইণ্টেলেকচুয়াল', 'আর্টিস্টিক', 'মরাল' ও 'রিলিজিয়াস'।৯ কবি টি. এস. এলিয়ট আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর একটি রচনায় প্রধানত ম্যানহাইমের মতামতের সমালোচনা করে বলেছেন যে এযুগের বিশ্বৎ-সমাজে এই বিভাজ্যতার সমস্যা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার সবটুকুই নিন্দনীয় নয়। বিভাজনের খানিকটা প্রয়োজন আছে, ভালর জন্যই। তবে যেভাবে বা যেরূপে তা বর্তমান সমাজে দেখা যায়, তার সবটুকু সমর্থনীয় বা প্রশংসনীয় নয়। এযুগের সংস্কৃতির একটা প্রধান দুর্বলতা হল, বুদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। রাজনৈতিক দার্শনিক শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক, কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই এবং তার জন্য ক্ষতি সকলেরই হয়। সমাজের দিক থেকেও তা কল্যাণকর নয়। বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতা এবং সজ্ঞান স্তরে ভাবের আদান-প্রদানের অভাব, বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা।১০

এ-সমস্যা বাংলার বিশ্বৎ-সমাজেও প্রকট হয়ে উঠেছে। বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি হয়েছে কেরানী-কর্মচারী ও আমলাবাহিনী উৎপাদনে। সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তার মর্মান্তিক ব্যর্থতা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৃটিশ শিক্ষানীতির এই পরিণাম সম্বন্ধে একজন লিখেছেন—১১

> . . . they have aimed at the production of government officials, lawyers, doctors, and commercial clerks and, within this narrow range they have succeeded remarkably well. Where they have failed, almost completely, is on the cultural side.

এমনকি, মেকলের দম্ভোক্তিরও বহরাড়ম্বর সার হয়েছে শুধু। তিনি যে ভারতীয় মেটে

৯ Karl Mannheim: *Man and Society*, P. 82.

১০ T. S. Eliot: *Notes towards the Definition of Culture*, P. 38.
পরে ম্যানহাইম্‌ বুদ্ধিজীবীদের বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত অনুশীলন করেছেন তাঁর *The Sociology of Culture* গ্রন্থে এবং তাতে পূর্বের মতামত (*Man and Society* এবং *Ideology and Utopia* রচনাকালের) অনেক পরিবর্তন করেছেন। তাতে অবশ্য এলিয়টের আসল বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ আছে বলে মনে হয় না।

১১ Arthur Mayhew: *The Education in India* (London 1926), P. 149.

রঙের চামড়ার অন্তরালে ইংরেজের সংযমী ও বিজ্ঞানী মনটি গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন, তাও ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যের আংশিক সাফল্য হয়েছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি দোভাষীশ্রেণীর বিকাশের মধ্যে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার কোন আদর্শ, যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক হিউম্যানিজম্ কোন কিছুই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে বাঙালী বা ভারতীয় বিশ্বৎ-সমাজের চরিত্রে বাসা বাঁধতে পারেনি। তার প্রধান কারণ, দেশের জলবায়ু-মাটির গুণে বদলায়নি। পাশ্চাত্ত্য আদর্শের বীজ ছড়ানো হয়েছে এদেশের বর্ধিষ্ণু নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কেবল বীজের গুণে প্রথম দিকে উনিশ শতকে তার বিস্ময়কর অঙ্কুরোদ্গমে আমরা ধাঁধিয়ে গেছি। ভেবেছি, নবজাগরণের সেই তরঙ্গের জোয়ার আসবে ভবিষ্যতে। তাও আসেনি। কারণ পুরনো মাটিতে নতুন বীজের পরিপূর্ণ উদ্গম সম্ভব হয়নি। সমাজের অর্থনৈতিক স্তরের মৌলিক কাঠাম খানিকটা বদলেছিল ঠিকই। তার ফলে সমাজের গড়নও যে কিছুটা বদলায়নি তা নয়। কিন্তু মধ্যপথেই এই পুরাতনের ভাঙন ও নতুনের গড়নের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরাধীন উপনিবেশের অদৃষ্টে যা হওয়া সম্ভব তাই হয়েছিল। অঙ্কুরেই তাই পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার আদর্শ ও নীতি শুকিয়ে গেছে। মেকলে খুব বড়াই করে লিখেছিলেন : ১২

> It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without any efforts to proselytise; without the smallest interference in their religious liberty; merely by the natural operation of knowledge and reflection.

অতিবিশ্বাসের কি মোলায়েম আত্মসন্তোষ! লর্ড মেকলে কতকটা 'লর্ডলি' ভঙ্গিতে বলেছেন : আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যদি আমাদের শিক্ষানীতি কার্যকর হয় তাহলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে কোন মূর্তিপূজকের অস্তিত্ব থাকবে না। এবং আমাদের তরফ থেকে কোনরকমের ধর্মান্তরের চেষ্টা না করেও এই ধরনের সামাজিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করারও দরকার হবে না। কেবল নতুন শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও চিন্তার ক্রিয়াতেই এই অসাধ্য-সাধন করা যাবে।

কূটনীতিজ্ঞ বা শিক্ষাবিদ্ হিসেবে মেকলে হয়ত ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁর এই বালকোচিত উক্তি শুনেই বোঝা যায়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র সম্বন্ধেও তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। কি ধরনের উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজের ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয় তা তাঁর অজানা ছিল। তাই ব্যক্তিগত পত্রে তাঁর এরকম মনখোলা উক্তি করতে দ্বিধা হয়নি। কোন নীতি বা আদর্শ বা পরিকল্পনা, তা যত বড় অতিমানবেরই উত্তপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত হোক না কেন, উপর থেকে উপলখণ্ডের মতন সমাজের বুকে নিক্ষেপ করলে তাতে সামান্য জলতরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে হয়ত, কিন্তু সমাজের অন্তঃস্থল পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে না। সেরকম আলোড়ন ছাড়া সমাজের স্থায়ী পরিবর্তনও হয় না। মেকলের ত্রিশ বছরের হিসেবের কথা উপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। একশ-ত্রিশ বছর পরেও আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, মেকলের রোপিত আমগাছে আমড়া ফলেছে। বাংলার সম্ভ্রান্ত বিশ্বৎ-সমাজে আজ বরং এমন একটি লোক খুঁজে পাওয়াই কঠিন যিনি যাবতীয় ধর্মীয় ও

১২ G. O. Trevelyan: Life and Letters of Lord Macaulay (London 1878). Vol. I, P. 455.

সামাজিক কুসংস্কারে বিশ্বাসী নন। যাবতীয় মৃত কান্টের কঙ্কালকে মহাসমারোহে পুনরুজ্জীবিত করার আগ্রহ আজ তাঁদের মধ্যে প্রবল। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর ব্যর্থতার প্রকাশ বলে এই উপসর্গ ব্যাখ্যা করা যায় এবং করলে ভুলও হয় না। কিন্তু ব্যর্থতার বেদনা অন্য উপায়েও আত্মপ্রকাশ করতে পারত, মৃত কান্টের শ্মশানে ঘুরপাক না খেয়ে। আত্মাভিমান, অভিযোগ, অবিশ্বাস ও নিঃসঙ্গতা হয়ত তাঁদের কাম্য হত। অতিচেতন সজাগবুদ্ধি মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালী বুদ্ধিজীবীর হয়ত আজ কাম্য তাই। কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই অতীতের মৃত আদর্শের শ্মশানের পথে যাত্রী, বর্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাহীন।

যে কোন ব্যবহার্য পণ্যের বাজারদর একটা নিয়ম মেনে ওঠানামা করে, অর্থনীতির ছাত্ররা তা বিলক্ষণ জানেন। প্রতিযোগিতার মোটামুটি সুস্থ ও স্বাধীন পরিবেশে এই বাজারদরের নিয়মের ব্যতিক্রম হত না সাধারণত। ক্যাপিটালিজমের যৌবনকালে স্বর্ণযুগে অর্থতত্ত্ববিদ্‌রা এই সমস্ত নিয়ম রচনা করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ক্যাপিটালিজমের এমন কতকগুলি পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে ক্লাসিকাল যুগের কোন নিয়মই আর সত্য বলে টিঁকে থাকতে পারছে না। প্রতিযোগিতা বা কম্পিটিশনের সেই স্বাধীন সুস্থ পরিবেশ আজ আর নেই। আজ তার বিচিত্র সব স্ববিরোধী নাম—মোনোপোলিস্টিক কম্পিটিশন, ডুয়োপোলি, ওলিগোপোলি ইত্যাদি। খোলা বাজারে ক্রেতাদের কোন স্বাধীনতা নেই বাজারদর নির্ধারণে, বিক্রেতার উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাও তার সীমাবদ্ধ। দুজন তিনজন বা চারপাঁচজন উৎপাদক-বিক্রেতা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ চুক্তি অনুযায়ী পণ্যের বাজারদর নির্ধারণ করেন। ক্রেতার স্বাধীনতা নেই, জিনিসের সত্যিকারের মূল্য যাচাইয়ের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ, কারণ 'ফ্রি মার্কেট' বা 'ফ্রি কম্পিটিশন' বলে কিছু নেই আর। ক্যাপিটালিজমের চরিত্রের এই যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের সমাক্ চেতনারই বিকাশ হয়নি।১৩ সমাজের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে স্পষ্টভাবে। বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রেও স্বাধীন প্রতিযোগিতার দিন চলে গেছে, তার একটা লোকদেখানো খোলস আছে শুধু। সরকারী বা বেসরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে প্রকাশ্য পরীক্ষার বহর যতই বাড়ুক, তার অন্তরালবর্তী অদৃশ্য বিচারকমণ্ডলীর প্রভাব যে কতখানি তা সমাজের কারও আজ অজানা নেই। এযুগের জিনিসের মূল্য যেমন বিজ্ঞাপনের বাহারে নির্ধারিত হয় এবং বাইরের প্যাকেটের চটকে তার কাট্‌তি বাড়ে, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভারও যাচাই হয় বিজ্ঞাপনে ও বাইরের খেতাবের চটকে। এর মধ্যেও যে দুচারজন প্রকৃত বিদ্বান ও প্রতিভাবান যোগ্য সমাদার পান না তা নয় (দুচারটে চমক্‌লাগানো প্যাকেটের মধ্যেও যেমন ভাল জিনিস থাকতে পারে তেমনি), কিন্তু সেটা দৈবচক্রের ব্যাপার ও ব্যতিক্রম। আমাদের আলোচ্য সামাজিক 'ব্যতিক্রম' নয়, সাধারণ সামাজিক গতি ও প্রকৃতি। সাহিত্য, শিক্ষা জ্ঞানবিদ্যা ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আজ তাই প্যাকেট লেবেল ও বিজ্ঞাপনের বাহাদুরির যুগ এসেছে। বর্তমান যুগের শিক্ষা ও বিদ্যার ক্ষেত্র সম্বন্ধে ম্যানহাইম বলেছেন : ১৪

১৩ John Strachey: Contemporary Capitalism (London 1956), Pp. 20-21.
১৪ Karl Mannheim: *Essays on the Sociology of Culture* (London 1956), P. 167.

> Education is one of the major areas in which the spirit of inquiry is on the decline . . . The retailing of knowledge in standard packages paralyses the impulse to question and to inquire. Knowledge acquired without the searching effort becomes quickly obsolescent, and a civil service or a profession which depends on a personnel whose critical impulse is benumbed becomes rapidly inert and incapable of remaining attuned to changing circumstances.

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্র থেকে অনুসন্ধিৎসা প্রায় অন্তর্ধান করেছে। স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেট-আঁটা লেবেলমারা বিদ্যা ক্রমে বিদ্যার্থীর কৌতূহলী ও সন্ধানী মনকে অসাড় অচৈতন্য করে দিচ্ছে। যে-বিদ্যার পদ্ধতির মধ্যে সন্ধানী মনের ক্ষুধানিবৃত্তির কোন সুযোগ নেই, খানিকটা মুখস্থ এবং অনেকটা পরীক্ষক-তোষণের উপর যা নির্ভরশীল, সেই বিদ্যা অর্জন করে যাঁরা বিদ্বান হন তাঁরা জীবনের যে-কোন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন সেখানেও যন্ত্রবৎ কাজ করবেন। তাঁদের নিজস্ব কোন বিচারবুদ্ধি বিবেচনাশক্তি বলে কিছু থাকবে না, বিরাট যন্ত্রের নাটবল্টুর মতন অবস্থা হবে তাঁদের এবং যুগের বা সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখেও তাঁরা চলতে পারবেন না।

শিক্ষা ও জ্ঞানবিদ্যার যখন এই অবস্থা তখন জনশিক্ষার প্রসার হচ্ছে প্রতিদিন এবং শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধিও হচ্ছে দ্রুতহারে। সেটা নিঃসন্দেহে সামাজিক শুভলক্ষণ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের জয়যাত্রার প্রমাণ। তার ফলাফলও শুভ হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল বলছি কারণ কোন দেশের বিদ্বৎ-সমাজে (বা যেকোন সামাজিক শ্রেণীতে) যত নতুন তরুণ শিক্ষিত ও বিদ্বান-বুদ্ধিমানের আমদানি হয় ততই মঙ্গল। তাতে বিদ্বৎ-সমাজের স্থিতিশীলতা বা কূপমণ্ডূকতা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে। নতুন যাঁরা তাঁরা যদি সত্যিই নতুন মন, নতুন দৃষ্টি নিয়ে আসেন, তাহলে তাঁরা পূর্বের বদ্ধ চিন্তাধারার ও কর্মধারার পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান যুগের সমাজের মতন যে-সমাজ অত্যন্ত বেশিমাত্রায় 'ইন্‌স্টিটিউশনালাইজড্' সেখানে নতুনের উপর পুরাতনরা তাঁদের নিজেদের ছাপ মেরে দেবার সুযোগ খুব বেশি পান। অর্থাৎ যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, যেমন শিক্ষক তেমনি ছাত্র তৈরি হয়। যে অধ্যাপক বা শিক্ষকদের নিজেদের অনুসন্ধিৎসা লোপ পেয়ে গেছে, নিছক চাকুরির স্বার্থে চর্বিত বিদ্যার চর্বণে যাঁরা দিনগত পাপক্ষয় করেন, যে বিদ্বান ব্যক্তি অর্জিত বিদ্যার সামান্য পুঁজি নিয়ে দুতিনহাজারী মনসবদারের গদিতে বসে আছেন, যাঁদের জ্ঞানার্জনের সমস্ত আগ্রহ স্বার্থবাদ ও সুবিধাবাদের অনলে ভস্মীভূত এবং যাঁরা ইন্‌স্টিটিউশনের বৃহৎ ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্তে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা কখন তাঁদের ছাত্রদের চিন্তা-শীল কৌতূহলী বা অনুসন্ধানী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন না। নিজেদের চালাকির কৌশলে মহৎ কার্য করবার শিক্ষাই তাঁরা তরুণ শিক্ষার্থীদের দিয়ে থাকেন এবং তরুণরাও স্বভাবতই 'মহাজ্ঞানী মহাজনেরা' যে পথ অনুসরণ করে বর্তমান সমাজে 'প্রাতঃস্মরণীয়' হয়ে ওঠেন সেই পথ ধরে চলতে চেষ্টা করেন। ফলে নতুন বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে পরিবর্তনের যে প্রত্যাশা থাকে, বর্তমানের বৃহৎ ইন্‌স্টিটিউশনবদ্ধ সমাজে তাও সম্ভব হয় না। বিদ্যাবুদ্ধির প্রবাহে ক্রমেই চড়া পড়তে থাকে।[১৫]

> Large and well-trenched organisations are usually able to assimilate and indoctrinate the newcomer and paralyse his will to dissent and innovate. It is in this sense that the large-scale organisation is a factor of intellectual dessication.

[১৫] Karl Mannheim: *Essays on the Sociology of Culture* (London 1956), p. 168.

বাংলার বিদ্বৎ-সমাজও আজ এই সমস্যার সম্মুখীন। তার জীবিকা-সমস্যা অনস্বীকার্য নয়। উপেক্ষণীয় তো নয়ই। চাকুরির আদর্শে, বিশেষ করে সরকারী চাকুরির আদর্শে যাঁদের আধুনিক শিক্ষার পথে যাত্রা শুরু হয়েছে এবং ক্রমে যাঁরা কারখানার যন্ত্রোৎপন্ন পণ্যের মতন বিশ্বানে পরিণত হয়েছেন, জীবিকার সমস্যা দেড়শ বছরের মধ্যে তাঁদের ক্রমে জটিল হওয়া স্বাভাবিক। কারণ ক্রমেই তাঁদের সংখ্যা বাংলাদেশে দ্রুতহারে বেড়েছে এবং মধ্যবিত্তের বড় একটা অংশ যেমন বাংলাদেশে 'শিক্ষিত' পদবাচ্য তেমন আর ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নয়। এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের (যাঁদের নিয়ে 'বিদ্বৎ-সমাজ' গড়ে উঠেছে) সংখ্যানুপাতে সরকারী বা বেসরকারী কোন চাকুরির সংখ্যা বাড়েনি। তার উপর বাংলার বাইরের প্রদেশেও শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিপত্তির যুগ নিশ্চিত অস্তাচলে। কারণ ইংরেজের আমলে যেসব প্রদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসার নানা কারণে ঘটেনি, আজ তার দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। সুতরাং বাঙালীর চাকুরির ক্ষেত্র এবং সরকারী পোষকতার ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে বাধ্য। সমস্যা এক্ষেত্রে থাকবেই এবং ক্রমেই তার ফলে অসন্তোষও বিদ্বৎসমাজে ধূমায়িত হয়ে উঠবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বাঙালী বুদ্ধিজীবীর 'intellectual dessication'-এর সমস্যা। হয়ত এ-সমস্যা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরও। ম্যানহাইমের মতে তো বুদ্ধিজীবীর এ-সমস্যা বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক ও আন্ত-র্সামাজিক সমস্যা। বর্তমান সমাজ ও তার ভেতরকার সব দৃঢ়মূল ইন্‌স্টিটিউশনের গড়ন না বদল করলে হয়ত এ-সমস্যার প্রতিকার সম্ভব নয়। সেই গড়নও বদলাচ্ছে আজ, সমাজের দ্রুত গণরূপায়নে (democratisation)। তার ফলে আবার নতুন করে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের সামনে। তার জটিলতাও কম নয়। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তা আলোচনার যোগ্য। আপাতত সমস্যা-সমাধানের কোন রেডিমেড ফরমুলা কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামাজিক গণরূপায়নের ধারা কিরকম হবে এবং তার ফলে নতুন কি ধরনের সব সমস্যা দেখা দেবে, তার আভাস যেটুকু পাওয়া যায়, সোশ্যালিস্ট ডেমক্রাসীর পরীক্ষা থেকে, তাতেও উল্লসিত হয়ে বলা যায় না যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জীবিকার চেয়ে যে জীবন আরও বৃহত্তর এবং উদরের চেয়ে মগজের স্বাধীন চিন্তা বুদ্ধি ও মননের প্রতি যে মানুষের সহজাত অনুরাগ কম নয়, তা আজ নতুন সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-ক্ষেত্রেও পদে পদে সঙ্কটের আঘাতে বোঝা যাচ্ছে। সামাজিক গণরূপায়নে বুদ্ধিজীবীর স্তরস্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তা যদি হয় তাহলে তো বুদ্ধিজীবীর বা 'বিদ্বৎ-সমাজের সমস্যা' বলে কোন সমস্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকবে না। তা নিয়ে এত মাথা ঘামানোরও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু কি হবে না-হবে আপাতত বলা যাচ্ছে না। সমাজ-বিজ্ঞানীরা কেবল 'ট্রেন্ড' বা গতির কথা বলতে পারেন, রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের মতন কোন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

আধুনিক সাহিত্য

শিক্ষিত বাঙ্গালী খুব সংস্কৃতি-সচেতন, এমন একটা দাবি প্রায়ই আমরা করে থাকি। দাবিটি একেবারে অযৌক্তিক, একথা বলিনে; যুক্তিবস্তার প্রমাণও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, এবং যখন পাওয়া যায় তখন মন খুশী হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার এমনও দেখা যায়, আমাদের সাংস্কৃতিক আঙিনায় চোখে পড়বার মতো কোনো দৃশ্যের আবির্ভাব হোলো, কোনো ঘটনা ঘটলো, অথচ আমরা প্রায় তা লক্ষ্যই করলাম না। তখন একটু সংশয় হয়, আমাদের দাবিটি কি পুরোপুরি সত্য!

প্রায় বছরখানেক হ'তে চললো, অশোক মিত্র-মশায়ের "ভারতের চিত্রকলা" প্রকাশিত হয়েছে। আমার ধারণা, ব্যাপক অর্থে বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই গ্রন্থ যে-ভাবে ও যতটা আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধি আকর্ষণ করা উচিত ছিল, পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত তা হয়নি। কেন হয়নি, তার হেতু খুঁজে বার করা কঠিন নয়; এবং তার প্রয়োজনও আছে। হেতু সম্বন্ধে সচেতন না হ'লে প্রতিকার সম্ভব নয়, এবং প্রতিকার না হ'লে আমাদের সাংস্কৃতিক সচেতনতা পূর্ণতর হ'বে না।

চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে আমাদের উত্তরাধিকার যত ঐশ্বর্য, গৌরব ও মহিমাময়, সে-উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধি ও চেতনা আজও তত অহংকৃত ও অপরিণত। সঙ্গীত ও সাহিত্য সম্বন্ধে ঐতিহ্য ও সংস্কারলব্ধ এবং কতকাংশে বুদ্ধি-নির্ভর একটা চেতনা বরাবরই মোটামুটি অব্যাহত ছিল; আঠারো শতকের অন্ধকারও তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিতে পারেনি। কিন্তু চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য সম্বন্ধে একথা বলা চলে না, ভারতের বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো অংশ ছাড়া। এখানে ওখানে আনাচে কানাচে কোথাও কোথাও ঐতিহ্যানুসারী সচেতনতা ছিল, কিন্তু তা'ও খুব সুস্পষ্ট, সুউচ্চারিত ছিল না। সাধারণভাবে একথা বললে খুব অন্যায় হ'বে না যে, আমাদের প্রাচীন ও মধ্য-যুগীয় শিল্পৈতিহ্যের ধারা মরুভূমির বুকে যেমন হারিয়ে গিয়েছিল, তেমনই সে-সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতার ধারা থেকেও আমরা একেবারে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছিলাম।

এই দুই ধারারই পুনরুজ্জীবন ঘটলো মাত্র সেদিন, উনিশ শতকের শেষপাদে, বিশ শতকের গোড়ায়, এবং তা' ঘটলো আমাদের নবলব্ধ জাতীয়-চেতনার সবল ও সোৎসাহ প্রেরণায়। তবু, স্বীকার করতেই হয়, এই প্রেরণা সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতটা ফল-প্রসূ হ'য়েছে এবং আজও হ'চ্ছে—শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র—শিল্পের ক্ষেত্রে ততটা হয়নি, এবং হ'চ্ছে না। এক্ষেত্রে চিত্রকলায় পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ যদি-বা কিছুটা প্রত্যক্ষ, ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যে তা' একেবারেই নয়। অবনীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আমাদের চিত্রীরা নানা রূপ ও আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এগুচ্ছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ভাস্কর্যে পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ আজও সুউচ্চারিত হ'য়ে ধরাই পড়ছে না, আর, স্থাপত্যে তো একেবারেই নয়। অথচ, বাঘ-অজন্তা-মুঘল-রাজপুত শৈলীর সমৃদ্ধ চিত্রকলা সত্ত্বেও, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই তো ছিল

ভারতবর্ষের সর্বোত্তম গৌরব; বস্তুত, ভারতীয় শিল্পমহিমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশই তো আমাদের ভাস্কর্যে।

যাই হোক, পুনরুজ্জীবনের প্রথম পর্যায়ে ভাবাবেগের বাষ্পে আমাদের দৃষ্টি ছিল মোহময়; তার ফলে আমাদের নিজেদের শিল্পের উত্তরাধিকারই তার যথার্থ শিল্পমূল্যে আমাদের কাছে ধরা পড়েনি। তার সমস্ত প্রস্তব্য এবং আঙ্গিকতথ্যও আমাদের জানা ছিল না। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সেগুলো যখন কিছুটা জানা হোলো, তখন সে-শিল্পের আখ্যান ও বর্ণনাত্মক দিক, তার প্রত্নৈতিহাস ও প্রতিমালক্ষণের দিকটাই আমাদের প্রায় সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে রইলো বহুদিন। আজও তার জের মেটেনি, তার জড় মরেনি। তা' ছাড়া, যাঁরা শাস্ত্রবিদ, যাঁরা ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার অনুরাগী প্রত্নবিদ বা ঐতিহাসিক, তাঁরা ভারতীয় শিল্পকে বুঝতে ও বুঝাতে চেষ্টা করলেন শিল্পের আঙ্গিক গৌরবে বা শিল্প-মহিমায় ততটা নয় যতটা আচারধর্মের রীতি-নীতি ও ভাবমহিমার দৃষ্টিগ্রাহ্য স্পর্শগ্রাহ্য রূপময় প্রকাশের দৃষ্টান্তস্বরূপ। আনন্দ কুমারস্বামীর মতো মনীষীও সর্বদা শিল্পশাস্ত্র, প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্র এবং ধর্ম ও অধ্যাত্মমহিমার রূপায়ণ থেকে ভারতীয় শিল্পকে মুক্ত রেখে সে-শিল্পের আত্মবতন্ততায় তাকে দেখতে পারেননি। অর্বাচীন শিল্প ও প্রতিমালক্ষণশাস্ত্র এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের গূঢ় লোকোত্তর ব্যাখ্যা তাঁর মতো মুক্তবুদ্ধির মানুষকেও কখনও কখনও শিল্পের শিল্পত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অন্যান্য দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের বেলায় তা' আরো বেশি হ'বে, এ তো খুব সহজবোধ্য। সাহিত্য বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেমন, শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনই যে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণবুদ্ধির নিয়োগ প্রয়োজন, শিল্পের যন্ত্রপাতি ও মালমসলা, তার কথাবস্তু, ভাববস্তু ও আঙ্গিকবস্তু, রূপভেদ, প্রমাণ, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ, ভাব, লাবণ্য, রং, রেখা, বিন্যাস, গড়ন, ডৌল, উচ্চাবচত্ব, প্রেক্ষাপট, পশ্চাদপট ইত্যাদি গুণাগুণের বিশ্লেষণ ও বিচার প্রয়োজন, শিল্পীর দেশ ও কালধৃত সমাজ, সে-সমাজের ভাবাকাশ, কর্মকৌলাহল, রীতিনীতি ও আদর্শ, প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদির যথাযথ জ্ঞান প্রয়োজন, এসব কথা আমাদের শিল্প ও শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় আজও ভাল করেই স্বীকৃতিই লাভ করেনি। বিদেশি পণ্ডিতরাও যখন ভারত-শিল্প নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন খুব সম্প্রতি করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেন্‌জামিন রৌল্যান্ড এবং পরলোকগত হেনরিখ্ য়ঁসমার, তাঁরাও শিল্পেতিহাসের এই দিকটা কিছুটা যেন অবজ্ঞা করেই চলেন, প্রত্নেতিহাস এবং ধর্মের আবহটাই যেন বড় হয়ে দেখা দেয়।

য়ুরোপে সেই ভ্যাসারির আমল থেকেই শিল্পের ইতিহাস-চর্চা লিবারেল ও হিউম্যানিস্ট জ্ঞানসাধনার অন্যতম প্রধান উপায় বলে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে। পাশ্চাত্য পৃথিবীতে আজ সর্বত্রই "হিস্ট্রি অফ আর্ট" বা শিল্পের ইতিহাস, "আর্ট এপ্রিসিয়েসন" বা শিল্পের সমঝদারী ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত পাঠক্রমের অন্তর্গত। সাম্প্রতিক শিক্ষাবিদেরা তো সোচ্চারে বলে থাকেন, শিল্পের ইতিহাস-চর্চা লিবারেল ও হিউম্যানিস্ট জ্ঞানসাধনার অন্যতম সদুপায়, এবং সে-উপায় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য-চর্চার চেয়ে এতটুকু কম মূল্যবান নয়। ঠিক এ-ধরনের কথা সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণও বলেছেন তাঁর ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও শিল্পের সমঝদারী ও শিল্পের ইতিহাস-চর্চা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সৌখীনতার বস্তু, অর্থাৎ, যা হওয়া উচিত "একাডেমিক ডিসিপ্লিনের" বস্তু তা' হয়ে আছে

এমেটরদের কৌতূহল ও লীলাখেলার সামগ্রী। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ভারতশিল্পের ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়টির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে। পরে মধ্যযুগীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির পাঠক্রমেও অনুরূপ ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু, শিল্পের ইতিহাসের যে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্য ও মর্যাদা তা' এতে স্বীকৃত হয় না, হওয়া সম্ভব নয়, এবং এই কারণেই আজও ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস বহুলাংশে প্রস্তর ও প্রতিমাতত্ত্বের অবান্তর ভারে ভারাক্রান্ত, অথবা ধর্মীয় ভাবালুতায় আচ্ছন্ন।

অশোক মিত্রের "ভারতের চিত্রকলা"র প্রকাশ বিগত বৎসরের বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকর্মে একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সূচনায় একথা কেন বলেছি, এবার তা' ব্যাখ্যা করা সহজ হ'বে।

প্রথমত, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সুরু করে আমাদের কাল পর্যন্ত ভারতের চিত্রকলার এমন একটি সামগ্রিক, স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এ-যাবৎ রচিত হয়নি, ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় তো দূরের কথা, ইংরাজি, ফরাসী ও জর্মন ভাষাতেও নয়। বিভিন্ন শৈলীর, বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের রচিত ভাল ভাল পুস্তক ও পুস্তিকা নানা ভাষায় পাওয়া যায়; পার্সি ব্রাউনের ছোট একখানা বইও আছে মোটামুটি সব শৈলী ও পর্যায় নিয়ে; অশোক মিত্র সে-সমস্ত দেখেছেন, পড়েছেন, কাজেও লাগিয়েছেন; কিন্তু শুধু ভারতীয় চিত্রকলার উপর এমন একটি বিশদ, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। বাংলা ভাষায়ই সর্বপ্রথম এ-ধরনের একখানা বই লেখা হ'লো, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আমি মনে করি।

দ্বিতীয়ত, অশোক মিত্রের শিল্পেতিহাস রচনার পদ্ধতি একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী এবং আধুনিক, অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণনির্ভর আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত রুচি বা ভালো-লাগা-মন্দ-লাগা, ভাবাবেগাপ্লুত ও জাতীয় অহংবুদ্ধিপীড়িত দৃষ্টি, প্রত্নভারগ্রস্ত বর্ণনা ও শাস্ত্রোক্ত ভাব-লক্ষণের আতিশয্য তিনি সযত্নে পরিহার করে গেছেন, এবং গূঢ় লোকোত্তর ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ, পবিত্র মানবচেতনাকে স্থান দিয়েছেন। ভারতীয় শিল্পবিচারে এবং শিল্পেতিহাস রচনায় মানব-চেতনার এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি খুব বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যেও দেখা যায় না। অথচ, এই স্বীকৃতি ছাড়া ভারতশিল্প, বিশেষ করে তার চিত্র ও ভাস্কর্যের রূপ ও রস আমাদের হৃদয়মনবুদ্ধির গোচর হওয়াই কঠিন, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে; আমার তাই বিশ্বাস। এ-ধরনের ইতিহাসনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক অথচ শুষ্ক মানব-চেতনাসংবাহী সর্বাঙ্গীন শিল্পালোচনার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে বিরল। বাংলা ভাষায়, ভারতীয় যে-কোনো ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিল্পের বিচারে ও শিল্পের ইতিহাস রচনায় অশোক মিত্র পথিকৃতের কাজ করলেন, একথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই।

তৃতীয়ত, তথ্যসংগ্রহে যে-নিষ্ঠা, তথ্যবিচার ও বিন্যাসে যে-নৈপুণ্য, এবং সর্বোপরি আঙ্গিক-বিশ্লেষণে যে-শ্রম ও ধীশক্তি অশোক মিত্র দেখিয়েছেন, তার তুলনা আমাদের বুদ্ধি-জীবী এবং পণ্ডিত সমাজেও খুব বেশি নেই। বস্তুত, তাঁর আঙ্গিকজ্ঞানের বিস্তার ও গভীরতায় আমি বিস্মিত হয়েছি, তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণ বারবার আমার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কঠিন ও সুস্পষ্ট 'একাডেমিক ডিসিপ্লিন' ছাড়া এ-ধরনের জ্ঞান আয়ত্ত

ও প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। তাঁর বিচার-বিশ্লেষণে 'এমেটর'-সুলভ সৌখীনতার ছোঁয়াচও কোথাও নেই।

চতুর্থত, আমি বিস্মিত হ'য়েছি পৃথিবীর শিল্পেতিহাসে তাঁর জ্ঞানের বিস্তার দেখে। ভারতের চিত্রের আলোচনা করতে গেলে যে সভ্য ও সংস্কৃতিপুত পৃথিবীর, আদিম উপজাতি অধ্যুষিত পৃথিব্যাংশের শিল্পপ্রচেষ্টার যাবতীয় খবরাখবর জানা প্রয়োজন, একথা অশোক মিত্র কখনও বিস্মৃত হননি'। এই সব যাবতীয় শিল্পকর্মের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার যোগাযোগ ও পারস্পরিক প্রভাব তিনি স্বচ্ছ মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং সে-আলোচনায় তিনি কোথাও জাতীয় অহংবুদ্ধি দ্বারা পীড়িত হননি'।

পঞ্চমত, যাঁরা এ-বই ভাল করে খুঁটিয়ে পড়েননি, তাঁদের মনে ধারণা হ'তে পারে, বই-খানা দশ বিশখানা ইংরাজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষায় রচিত বই পড়ে, পড়া বিদ্যা আয়ত্ত করে নিজের ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা। বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় আমাদের অধিকাংশ আলোচনা-গ্রন্থ ঐ-ভাবেই সাধারণত লেখা হয়। অশোক মিত্রের বইখানা সম্বন্ধে একথা মনে করলে খুব ভুল করা হ'বে, এবং পাঠকেরাই তাতে ঠকবেন। নানা জায়গায় নানা প্রসঙ্গে তিনি যে-ধরনের বিশ্লেষণ করেছেন, যে-সব বিচার ও মতামত প্রকাশ করেছেন তা মৌলিক এবং লেখকের নিজের বুদ্ধি ও চিন্তার, বিচার ও বিশ্লেষণের ফল। এবং সেই ফল তিনি নিবেদন করেছেন সবিনয়ে অথচ অত্যন্ত সংসাহসের উপর ভর করে। আনন্দ কুমারস্বামীর মত মনীষীর মতামতও তিনি বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং দু'চার জায়গায় খণ্ডন করে নিজের বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে। বুদ্ধিজীবীর এই সংসাহস থাকা প্রয়োজন; অশোক মিত্রের তা আছে, অথচ তিনি অবিনয়ী নন, কোথাও প্রথমপুরুষে তিনি কথা বলেননি'।

ষষ্ঠত, এই গ্রন্থ বাংলায় লিখে অশোক মিত্র তাঁর বাংলাভাষা প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, এ-তথ্য বাঙ্গালীমাত্রকেই আত্মপ্রসাদ দান করবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু, বাংলায় লেখার ফলে এই গ্রন্থের যে-মূল্য ও মর্যাদা প্রাপ্য, তার পরিধি সীমিত হ'তে বাধ্য। অথচ, এই গ্রন্থে ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে এমন অনেক বিশ্লেষণ, বিচার ও মতামত আছে যা পৃথিবীর বৃহত্তর পণ্ডিত ও বিশ্বজনসমাজে আলোচিত ও পরীক্ষিত হ'বার দাবি রাখে। বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্যের আদর্শে নয়, পৃথিবীর পাণ্ডিত্যের আদর্শেই এ-গ্রন্থের বিচার হওয়া উচিত।

সপ্তমত, অশোক মিত্রের ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গী সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর; তার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষেও এ-বই পড়ে বুঝতে পারা কিছু কষ্টকর হ'বে না। পারিভাষিক শব্দ বাধ্য হ'য়ে তাঁকে অনেক ব্যবহার করতে হয়েছে, কিছু কিছু নোতুন রচনাও করতে হয়েছে, কিন্তু উদ্ভট দুর্বোধ্য শব্দ বা পদাংশ তিনি কিছু ব্যবহার করেননি, বা তেমন নোতুন রচনাও কিছু করেননি। ভাষায় ভাবালুতার বাষ্পলেশও তিনি কিছু রাখেননি, কিংবা 'এফেক্ট' সৃষ্টি করবার সচেতন চেষ্টাও কিছু করেননি। তার ফল মোটামুটি ভালই হয়েছে; বুদ্ধিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিভঙ্গীনির্ভর রচনায় এই ধরনের ভাষাই বোধ হয় ভালো। তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, শিল্প ও সাহিত্যবিচার এবং ইতিহাস-রচনার ভাষায় আরো একটু লাবণ্য, আরো একটু ভাবদীপ্তি ও ব্যঞ্জনা থাকা বোধ হয় মন্দ নয়; তাতে সম্ভবত সূক্ষ্মবোধ জাগানো, শিল্পদৃষ্টি উন্মোচন সহজতর হয়। শিল্পের স্পর্শালুতা ও ভাবব্যঞ্জনা ভাষায় সঞ্চারিত হ'লে পাঠকের চিত্তে তার সঞ্চারণ সুগম হয়। ব্যক্তিগতভাবে, কোথাও কোথাও অশোক মিত্রের ভাষায় গুরুচণ্ডালী দোষও আমার কানে একটু ঠেকেছে। হয়তো তা পরিহার

করা সম্ভব হয়নি। হ'লে ভালো হোতো বলে আমার ধারণা, বিশেষত এ-ধরণের বুদ্ধিনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর আলোচনায়।

এ-ধরনের বিশদ, পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক আলোচনায় বিশেষজ্ঞদের ভেতর মতবিরোধের অবকাশ কোথাও কোথাও থাকবে, সন্দেহের অবকাশও থাকবে তা' কিছু বিচিত্র নয়। অশোক মিত্রের সব বিশ্লেষণ, বিচার ও মতামত সর্বত্র আমিও এখন পর্যন্ত স্বীকার করতে পারিনে। কোথাও কোথাও এমন মনে হয়েছে, তাঁর বিচার গ্রহণ করতে হ'লে আরো তথ্য, আরো বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখমাত্র করি; আলোচনার স্থান এখন নয়, এখানে নয়। শ্রীযুক্ত মিত্র অজন্তার চিত্রে চীনাশিল্পের প্রভাবের কথা সোচ্চারে ও সবিস্তারে বলেছেন; আগেও দু'একজন পণ্ডিত একথার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। আমি এখনও এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় নয়। যে-প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে তা চীনা চিত্রকলার, না মধ্যএশীয় যাযাবর শিল্পের দূরাগত প্রভাব, তা এখনও নিশ্চিত করে বলা বোধ হয় কঠিন। ইলোরার চিত্রে যে সে-প্রভাব সক্রিয় তা তো সুস্পষ্ট, এবং পরবর্তী কালে তা আরো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে। খৃষ্টপূর্ব মধ্যএশীয় যাযাবর শিল্প যে চীনা শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা তো বহুদিন স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমনও তো হ'তে পারে যে, সেই যাযাবর শিল্প ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন পথ দিয়ে চীন ও ভারতবর্ষে এসে প্রবেশ করে দুই দেশের শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। এই যাযাবর শিল্পের একটি ধারা চীনা অভ্যাস দ্বারা পরিশোধিত হ'য়ে ভারতবর্ষে আসার প্রশ্নও একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। আমার প্রকাশিত দুই একটি রচনায় এই যাযাবর শিল্পের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছি, কিন্তু এই শিল্পের সমস্ত তথ্য আজো আমাদের ভালো জানা নেই; ক্রমশ জানছি মাত্র। তবে, আপাতত এটুকু বোধ হয় কিছুটা জোর দিয়েই বলা চলে যে, এই যাযাবর শিল্পের ধারা সাসানীয় শিল্প, পারসিক শিল্প ও চীনা শিল্পকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল, এবং তার ধাক্কা পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকেই ভারতীয় শিল্পেও এসে লাগতে সুরু হয়েছিল। ক্রমশ তার স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে, ধীরে ধীরে আমার মনে হচ্ছে, এই যাযাবর শিল্প সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হ'বার সময় এসেছে, এবং এর সমস্ত তথ্য ও অন্বিষ্ট জানলে পর তথাকথিত পশ্চিম-ভারতীয় পুঁথিচিত্র, দক্ষিণী সুলতানী চিত্রকলা, রাজপুত চিত্রকলা ইত্যাদির জন্মেতিহাস ও বিবর্তনের ধারার স্পষ্টতর ইতিহাস আমরা বুঝতে পারবো। এবং বোধ হয়, কিছুটা মুঘল চিত্রকলারও।

কিন্তু, এই সব মতামত পার্থক্যের কথা একান্তই গৌণ, এহ বাহ্য। শ্রীযুক্ত মিত্র ভারতীয় চিত্রকলার যে-ইতিহাস আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা পড়ে আমি উপকৃত বোধ করেছি, কিছুটা গর্বও বোধ করেছি, এবং সে-কথাটি সবিনয়ে নিবেদন করবার জন্যই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা।

নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের চিত্রকলা—অশোক মিত্র। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা। মূল্য ১৫,

বাংলার জাগরণ—কাজী আবদুল ওদুদ। বিশ্বভারতী। কলিকাতা, ৭। মূল্য তিন টাকা।

মাত্র দু'শো পৃষ্ঠার বই, কিন্তু নানা তথ্য ও তত্ত্বে এমন পরিপূর্ণ, বুদ্ধির আলোকে এমন দীপ্ত, যে উনিশ শতকে বাঙালীর প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ এবং বিংশ শতকে জীবনের নানাক্ষেত্রে বাঙালীর পশ্চাদপসরণের মর্মকথা যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের জন্য বইখানি অপরিহার্য-পাঠ হ'য়ে দাঁড়াবে। চিন্তাশীল ও মুক্তবুদ্ধি লেখক হিসাবে কাজী আবদুল ওদুদ বাংলাদেশে সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর সে খ্যাতিকে আরো ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

উনিশ শতকে জীবনের নানাক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতিভা যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, কোন পরাধীন দেশের ইতিহাসে তার তুলনা সহজে মেলে না। শতাব্দীর প্রারম্ভেই রাজা রামমোহন রায়ের মতন যুগান্তকারী প্রতিভার অভ্যুদয়, এবং বিভিন্ন দশকে কর্মবীর শক্তিশালী যে সমস্ত চিন্তানায়ক, সংস্কারক, লেখক, কর্মবীর এবং রাষ্ট্রনেতার আবির্ভাব কেবলমাত্র তাদের নামের তালিকা সংকলন করলেই আশ্চর্য হ'য়ে যেতে হয়। একা রবীন্দ্রনাথকেই একশো মনে করলে অন্যায় হবে না। কারণ কবি হিসাবে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার কথা ছেড়ে দিলেও জাতীয় জীবনের গোড়াপত্তনে এবং মানবধর্মবিকাশে তাঁর যে কি বিরাট দান, আজও ভারতবর্ষ তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। বাংলাদেশে এত অল্পদিনের মধ্যে বহুমুখী এত প্রতিভার সমাবেশ আরো বেশি বিস্ময়কর, কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে বাংলাদেশ চিরদিনই খানিকটা অনাদৃত, ভৌগোলিক ব্যবধানের ফলে কেন্দ্রের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তার সম্বন্ধ চিরদিনই খানিকটা শিথিল। বিভিন্ন যুগে তাতে অবশ্য বাংলাদেশের লাভ এবং লোকসান দুই-ই হয়েছে, কিন্তু উনিশশতকে হঠাৎ লোকসানের দিক প্রায় লোপ পেয়ে গেল, এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সমস্ত ভারতবর্ষে চিন্তা ও কর্মজীবনের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বাঙালীর নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

কেন বাঙালীর এ আকস্মিক জাগরণ সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ মোটামুটিভাবে প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙালীই জানেন। ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে ইয়োরোপের আবির্ভাব দক্ষিণদেশেই প্রথম হয়েছিল, কিন্তু বাঙালী যেভাবে মনে-প্রাণে ইয়োরোপকে গ্রহণ করেছিল, ইয়োরোপের গণতন্ত্রের আদর্শ এবং বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গীকে আপন ক'রে নেবার চেষ্টা করেছিল, অন্যত্র তার পরিচয় মেলেনি। ভারতবর্ষের দক্ষিণে এবং পশ্চিমে—মাদ্রাজে এবং বোম্বাইয়ে—ইয়োরোপের কার্যকরী দিকটাই বেশি প্রবল হয়েছে। মাদ্রাজ ইংরিজি ভাষাকে হয়তো বাঙালীর চেয়েও বেশি আদর ক'রে বুকে টেনে নিয়েছে, কিন্তু বহুদিন ধরে শুধু ভাষাকেই নিয়েছে, তার সাহিত্য বা প্রাণধর্মকে গ্রহণ করেনি। বোম্বাই ইংরেজের ব্যবসায়িক সফলতার সমস্ত ভঙ্গীকে আয়ত্ত করেছে কিন্তু সেখানে ইয়োরোপীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব তত গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে খানিকটা বিচ্যুত বলে ইয়োরোপের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে সহজ হয়েছিল, কিন্তু বাঙালী

ইয়োরোপীয় সভ্যতার মর্মবাণীকে গ্রহণ করেছিল ব'লে বাংলাদেশেই আবার প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবন প্রথম ঘটে। প্রতীচ্য ও প্রাচ্য ভাবধারার সংঘর্ষ, সংগম ও সমন্বয়ের ফলে বাংলাদেশে উনিশ শতকে নবজীবনের এক অপূর্ব আলোড়ন দেখা দেয়।

মোটামুটিভাবে এ-সব কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি, কিন্তু কাজী সাহেবের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব এইখানে যে সেই সাধারণ ভাসা-ভাসা জ্ঞানকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তলিয়ে দেখেছেন। শুধু তাই নয়, বাংলার নবজাগরণের বিশ্লেষণে একথাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিয়েছে যে প্রথম থেকেই সে নবজন্মের মধ্যে খানিকটা চিন্তা ও প্রেরণার গলদ দেখা দিয়েছিল। কাজী সাহেবের মতে যে চিন্তা ও কর্মের ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হ'য়ে ওঠে, সেই চিন্তা ও কর্মধারাই প্রাণবন্ত ও প্রগতিশীল। সত্যের ভিত্তিকে অবলম্বন না করলে চিন্তা বা কর্ম কোন ক্ষেত্রেই মিলন সম্ভবপর নয়, তাই জীবনের সমস্ত স্তরে সত্যকে প্রতিষ্ঠাই মানুষের ধর্ম। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ সত্য বহুযুগ আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু নানা সামাজিক সংস্কার ও আচারের আবর্জনায় সে সত্যদৃষ্টি কালক্রমে আবিল হ'য়ে পড়ে। ইয়োরোপের আবির্ভাবের যুগে রাজা রামমোহন রায়ের চিত্তে সেই সত্যান্বেষা আবার নতুনভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল ব'লেই রামমোহন রায়কে বর্তমান ভারতের জনক বলা হ'য়ে থাকে।

সত্যের সন্ধানের মধ্যেও কিন্তু বারবার জাতীয় অভিমান, সামাজিক সংকীর্ণতা এবং অন্যান্য ধরনের মানবধর্মবিরোধী মনোভাব এসে পড়ে। বাংলাদেশের জাগরণের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যাঁরা মুখে বুদ্ধির মুক্তির দোহাই দিয়েছেন, তাঁরাও বহুক্ষেত্রে মনে-প্রাণে সংস্কারের দাস। কোন কোন ক্ষেত্রে সে সংস্কার বিদেশজাত, কিন্তু স্বদেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক, যেখানেই বুদ্ধির সহজ প্রবাহকে আচার বা অভ্যাসে ব্যাহত করেছে, সেখানেই মানবধর্ম ঘা খেয়েছে। যাঁরা বুদ্ধির মুক্তি ও মানবকল্যাণকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরও সময় সময় পদস্খলন হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, মিথ্যা আদর্শ সময় সময় ব্যক্তি ও সমাজের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে যে মানুষের সহজবুদ্ধি বিকৃত হ'য়ে ভালো-মন্দের সহজ তফাৎ ভুলে গিয়েছে। জাতীয়তার ক্ষেত্র থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিলেই একথা পরিষ্কার হবে। ভারতের স্বরাজসাধনা প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে স্বাভাবিক কর্তব্য, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে স্বরাজসাধনার নামে ইংরেজবিদ্বেষ প্রচারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যাঁরা স্বরাজসাধনার এ বিকৃতি লক্ষ্য করে তার সংশোধন করবার চেষ্টা করেছেন, জাতি তাদের সমাদরের বদলে অনাদর-ই করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকে জাতীয় জীবনের ভিত্তির পুনর্গঠনের প্রতি যে জোর দিয়েছিলেন, তা বিস্ময়কর। কিন্তু তাঁর কর্মসূচীতে উত্তেজনার চেয়ে সাধনার দিকে ঝোঁক বেশি ছিল ব'লে লোকে তাঁর কথা শুনতে চায়নি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এবং পরে অসহযোগ আন্দোলনের দিনে জাতি উত্তেজনার সহজ পথ বেছে নিয়েছে। জাতি-গঠনের কঠিন ও নিরাড়ম্বর সাধনাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। বিদেশী বর্জন করা যত সহজ, স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা তার চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ। গান্ধীজির কর্মসূচিতে আন্দোলনের দিক যত সহজে গৃহীত হয়েছে, শিল্পসংগঠন বা সমাজ-কল্যাণের দিক তত সহজে স্বীকৃত হয়নি। এরকম আত্মপ্রতারণায় জাতির কল্যাণ হয় না, এবং স্বাধীনতা অর্জনের পরে সে কথা আমরা মর্মে মর্মে প্রতিদিন অনুভব করছি।

কাজী সাহেবের বুদ্ধি স্বচ্ছ, দৃষ্টি উদার এবং চিত্ত নির্ভীক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই নির্ভীকতা আমাকে সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে। যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন, তাঁদের প্রতি

বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন না ক'রেও কাজী সাহেব যেভাবে তাঁদের সমালোচনা করেছেন, সে ধরনের নির্ভীক ও যুক্তিবাদী সমালোচনার আজ দেশে বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের দেশে মতভেদ ও অশ্রদ্ধার মধ্যে আমরা বিশেষ পার্থক্য করি না। যাঁকে শ্রদ্ধা করি, বহুক্ষেত্রে বিনা বিচারে সকল বিষয়ে তাঁর মতামত মেনে নিই। অন্য পক্ষে কোন ক্ষেত্রে কারু কোন মতকে অস্বীকার করলে সে মতভেদকে সাধারণত অশ্রদ্ধা মনে করা হয়। দু রকমের মনোবৃত্তিই স্বাধীন চিন্তার বিরোধী। তাই কাজী সাহেব যেভাবে বহু সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাঁদের মতামতের সমালোচনা করেছেন, তা প্রশংসনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন এবং বিবেকানন্দ—এঁরা প্রত্যেকেই জাতিকে অনেক খাঁটি জিনিস দিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যে খানিকটা আবেগদুষ্ট জাতির জীবনে এনে দিয়েছেন, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। কাজী সাহেব তাঁদের দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি বা গলদকে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। সেই সঙ্গে একথারও উল্লেখ প্রয়োজন যে অকারণে নিন্দিত বাংলার মনীষীদের যশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজেও কাজী সাহেব অনেক পরিমাণে সফল হয়েছেন। ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গলদের সম্বন্ধে যেসব কথা তিনি বলেছেন, তা যেমন সমীচীন, তেমনি প্রয়োজনীয়।

এ ধরনের বিচারে মতভেদের অবকাশ রয়েছে এবং থাকবে। কাজী সাহেবের অনেক কথা হয়তো মানতে পারিনি, কিন্তু এ মতভেদ বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে বুদ্ধির আলোকে তিনি বাঙালীর জীবনের একটি উজ্জ্বল যুগকে নূতন ক'রে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ আন্দোলনের মূল্য নিরূপণে মতভেদ যতই থাক না কেন, কাজী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারপদ্ধতিকে প্রায় পুরোপুরি গ্রহণ করা চলে।

বইখানি এত ভালো লেগেছে ব'লেই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি বেশি পীড়া দেয়। আশা করি যে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলির সংশোধন হবে। মনে হয় যে বাংলাদেশের মুসলমানের চিন্তাধারার সঙ্গে কাজী সাহেবের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম। এ-কথা সত্য যে পুরো উনিশ শতক এবং বিংশ শতকের অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালী মুসলমান চিন্তা বা কর্মজগতে বড় রকমের কোন দান করতে পারেনি, কিন্তু তাই ব'লে বাঙালী মুসলমান যে একেবারেই ভাবতে চেষ্টা করেনি, সে কথাও সত্য নয়। তিতুমীরের উল্লেখ বইখানিতে রয়েছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে, বিশেষ ক'রে ফরিদপুরে ফরায়জী আন্দোলনের নামোল্লেখ কাজী সাহেব করেননি। ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলেও ফরায়জী আন্দোলনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। হাজী শরিয়ৎউল্লা এবং দুদুমিয়ার বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্থান রয়েছে, এবং এই ঐতিহ্যকে বহন ক'রেই অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বাদ্‌শা মিয়া বাংলার মুসলমান সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে টানতে পেরেছিলেন।

বাঙালী মুসলমান কেন ইংরিজি শিক্ষার সঙ্গে বহুদিন পর্যন্ত অসহযোগ করেছে, তার বিবরণ হাণ্টার সাহেবের আলোচনা থেকে জানা যায়। যখন অবশেষে সুবুদ্ধির উদয় হলো, নবাব আবদুল লতিফ, আমীর আলী, আবদুর রহিম প্রভৃতি মনীষী নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। কাজী সাহেব সংক্ষেপে তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই স্বার্থের খাতিরে তার বিস্ততর আলোচনার প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে আমীর আলী যেভাবে ইসলামকে বুদ্ধির আলোকে প্রতিভাত করতে চেষ্টা করেছেন, বাংলার হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই সে কথা জানা উচিত। পরবর্তী সংস্করণে যদি কাজী সাহেব তাঁর গ্রন্থের এ অংশকে পরিবর্ধন করেন,

তবে তাতে সমস্ত বাঙালীর লাভ হবে।

কাজী সাহেব ঢাকার সাহিত্যসমাজের নামোল্লেখ করেছেন। 'শিখা' পত্রিকা এবং ঢাকার সাহিত্যসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর ছিল ব'লে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ঢাকার বাইরেও যে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন প্রেরণা এসেছিল, তার যথাযথ উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে মিলবে না। কলকাতায় এ সময় যে মুসলমান সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, কাজী সাহেবের নিজস্ব মাপকাঠিতে বিচার করলেও তাদের দান বোধ হয়, ঢাকার সাহিত্যগোষ্ঠীর তুলনায় কম মনে হবে না। 'শিখা' পত্রিকায় যাঁরা লিখতেন, তাঁরা মুসলমান, এই কথার উপর জোর দিয়ে তাঁরা বুদ্ধির মুক্তি সাধনে অগ্রসর হয়েছিলেন। কলকাতায় যাঁরা এ সময়ে লিখতে সুরু করেন, তাঁরা মুসলমান হিসাবে কোন স্বীকৃতি দাবী করেননি। মানবতার ভিত্তিতে সাহিত্যসৃষ্টিই ছিল তাঁদের লক্ষ্য, তবে সেই সঙ্গে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে যেহেতু মুসলমানসমাজে তাঁদের জন্ম, এবং সেই সমাজেই তাঁরা প্রতিপালিত, তাঁদের রচনায় শাশ্বত সত্যের প্রকাশে মুসলমানসমাজের ছায়া স্বভাবতঃই পড়বে।

কাজী সাহেব প্রধানত বুদ্ধিজীবী এবং সেজন্য তাঁর সমস্ত আলোচনায় বুদ্ধির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আবেগকে তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু তাঁর রচনায় আবেগের স্বীকৃতি সহজ ও গভীর হ'য়ে ওঠেনি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ স্বল্প-পরিসর সমালোচনায় নেই। কাজেই কেবলমাত্র তার উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হই।

পরিশেষে কাজী সাহেবের ভাষা সম্বন্ধে একটু আপত্তি জানিয়েই এ আলোচনা শেষ করি। সাধারণত তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল এবং প্রাণবন্ত। কিন্তু কোন কোন স্থলে মনে হয় যে তিনি ইংরিজিতে ভেবে বাংলায় তার অনুবাদ করেছেন। কিন্তু অনুবাদ অনুবাদই রয়ে গেছে। বাংলাভাষার মাধ্যমে চিন্তাধারার নব-জন্ম বা নব-রূপায়ণ হয়নি। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

"শাসকদের এই ধরনের চেষ্টার ভবিষ্যৎ ফল যে কত বিষময় হ'তে পারে সে সম্বন্ধে চেতনা পিছিয়ে-পড়া আর পিছিয়ে পড়ার জন্য অনেকখানি স্বস্তিহীন মুসলমানদের মনে তেমন ক'রে তো জাগল-ই না, প্রাগ্রসর হিন্দুদের মধ্যেই সে চেতনা জাগল না প্রাগ্রসরতা যে তাদের সামনে দেখা দিল হিন্দু জাতীয়তার আপাত মোহনরূপ নিয়ে অনেকটা সেই জন্য" (বাংলার জাগরণ—১৮৭ পৃষ্ঠা)। এ-রকম ভাষার আড়ষ্টতার দৃষ্টান্ত আরো আছে।

দোষত্রুটিগুলি ক্ষুদ্র ও নগণ্য—গ্রন্থখানির গুণ মহৎ। তাই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীকে বইখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

হুমায়ুন কবির

হে বিদেশী ফুল—বিষ্ণু দে। বাক্। কলিকাতা, ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

পশ্চিমের ছোট যে শহরে আমি বাস করি, সেখানকার জনৈক গৃহকর্তা সেদিন আমাকে তাঁর বাগান দেখাচ্ছিলেন। পাঁচরকম ফুল দেখানোর পরে একটি ফুলগাছ দেখালেন—ফুট দেড়েক উঁচু হবে, টবে বসানো, সে টব আবার কাজ-করা সুন্দর বেত দিয়ে মোড়া, ফুল ধরেছে প্রায় গোলাপি রঙের। আমি যখন সে ফুলের অনতিদীপ্ত তারিফ করছি, তখন ভদ্রলোক বললেন, এর নাম অ্যাজালিয়া, the only Azalea between Simla and

Calcutta. দক্ষিণে কুনুর থেকে আমি আনিয়েছি, বহু মেহনত ক'রে এটিকে পোষ মানিয়েছি এই ধুলো-মাখানো লু-লাঞ্ছিত শহরের শুকনো আবহাওয়ায়! অ্যাজালিয়ার নাম আমি আগেই শুনেছিলাম, শেলির কবিতায় এ নামের উল্লেখ পেয়েছিলাম, হয়তো এ ফুল দেখেছি সিমলায় অথবা কাশ্মীরে অথবা বিদেশে কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখিনি কোনদিন। সেই বহুদিনশ্রুত বিদেশী ফুল যখন সহসা আমার প্রতিবেশী হলো, বলতে পারি, আমার সমবাসী হলো, তখন যে-আনন্দ, যে-রোমান্টিক আনন্দ বোধ করলাম, সাধারণ সুন্দর ফুল দেখার অবধারিত আনন্দের চেয়ে তা অনেক বেশি প্রগাঢ়।

বিষ্ণু দে'র অনুবাদসংগ্রহে বিদেশী ফুল দেখার আনন্দ পেলাম। শুধু ফুল নয়, ফুলের নয়নাভিরাম সমাবেশ। এ-সংগ্রহে আটটি বিভিন্ন দেশের কবিতা, সাতটি বিভিন্ন ভাষার কবিতা অনূদিত হয়েছে। মোট সাতান্নজন কবি, আর তা ছাড়া প্রাচীন চৈনিক কবিতা, বুবাদুর কবিতা, ধাঁধার ছড়া স্থান পেয়েছে। এ-সব কবিদের জনকয়েকের নাম শুনিনি অথবা নাম-মাত্রই শুনেছি। ইংরেজি অনুবাদে গারথিয়া লোরকার কবিতা পড়েছি, ফোম্বোনা-পাচানোর নাম সাহিত্যের অভিধানের বাইরে এই প্রথম পেলাম একথা সসঙ্কোচে স্বীকার করছি। বিষ্ণু দে-র ফুলচয়নে প্রমাণ হয় তিনি কুশলী শিল্পী, নানা দেশের বিচিত্র ফুল নিপুণ হাতে সাজিয়েছেন অথচ সে বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ড চিত্তের, অনবচ্ছিন্ন মেজাজের নিশানা আছে। তাঁর দৃষ্টির পরিধি একপক্ষে বিস্তৃত, অপরপক্ষে সংহত। বিস্তৃতি ও সংহতির এমন মিশ্রণ দেশী বা বিদেশী অনুবাদ-সাহিত্যে আছে ব'লে চট্ ক'রে মনে পড়ছে না। স্যর মরিস্ বাওরা সুন্দর অনুবাদ করেছেন কিন্তু তাঁর অনুবাদ সবসময় সৌন্দর্যঘন হয়নি। বাংলাতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনেকগুলি অনুবাদ করেছিলেন, আর করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়। যে সব ভাষা থেকে এ দু'জন বাঙালী কবি তর্জমা করেছিলেন ততগুলি ভাষাই তাঁরা জানতেন কি না, জানলে কতটা জানতেন সে বিষয়ে কোন তথ্য আমার জানা নেই। বিষ্ণু দে-র সংক্ষিপ্ত ভূমিকা থেকে অনুমান হয় তিনি বহুভাষাবিদ্ কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা যে সত্যেন দত্ত-র ও সুরেন মৈত্র-র অনুবাদের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র অনুবাদের সে প্রভেদ যে প্রভেদ এলিয়ট পেয়েছিলেন গিলবর্ট মরে ও হিল্‌ডা ডুলিট্‌ল্-এর গ্রীক অনুবাদে। বিষ্ণু দে-র অনুবাদ-গুলি মূলের তুলনায় কতটা যথাযথ হয়েছে সে বিচার উপযুক্তভাবে করতে পারেন তাঁর সমতুল্য বহুভাষাবিদ্ সহৃদয় বাঙালী সমালোচক। আমি স্বীকার করছি আমার ভাষা-পারদর্শিতা সীমাবদ্ধ। 'হে বিদেশী ফুল'-এর সমালোচনা লেখা আমার অভিপ্রেত নয়, রিভিউ-লেখক হিসাবে মোটামুটি গ্রন্থ-পরিচয় লিখেই সন্তুষ্ট হব।

সে রকম গ্রন্থ-পরিচয় লিখতেও কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি। এ মুহূর্তে আমি সমালোচক (রিভিউ-লেখক), আর সচরাচর আমার পেশা অধ্যাপনা। সমালোচক ও অধ্যাপক দু'জনেই সাহিত্যিকের কাছে অবজ্ঞার্হ। প্রোফেসর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : 'রুচি জিনিসটা বড়ো চপল, ওকে একটুও বিশ্বাস নেই, তাই তিনি (অধ্যাপক) প্রথমেই ওটাকে গলা টিপে মেরেছেন; তাঁর যেটা নির্ভর, সেটা অতিশয় ভারি ওজনের, সেই তাঁর নীরন্ধ্র পাণ্ডিত্যের বর্মকে, কোন নামগোত্রহীন প্রভাব কি ভেদ করতে পারবে?' (উত্তরতিরিশ)। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন—

পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
বসে আছে সিংহাসনে,—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক;—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিচুঁটি;

বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুটি।

বাস্তবিক বারো মাস তিরিশ দিন অধ্যাপকদের হাতে কবি বেচারারা এতই নিগৃহীত ও ব্যবচ্ছিন্ন হচ্ছেন যে অন্তত একটিবারও কবিরা পাল্টা গালি দেবেন না সে কেমন কথা, হোন না কেন তাঁরা নিজেরাও অধ্যাপক! এ তো ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লড়াই নয়, সত্তায় সত্তায় লড়াই, কবিসত্তায় আর অধ্যাপকসত্তায় লড়াই, খণ্ডিত সত্তার দু'খণ্ডে লড়াই। আমি একে তো পাপী অধ্যাপক, তায় আবার রিভিউ লিখছি, আর রিভিউ-লেখক ক্রিস্টোফার নর্থ সম্বন্ধে তরুণ টেনিসন যে বিদ্রূপ লিখেছিলেন বিষ্ণু দে প্রবীণ বয়সে তার তর্জমা করেছেন—

আমার লেখার রিভিউ করেছ তুমি সম্প্রতি,
খড়খড়ে নটবর,
খিচুড়ি করেছ খানিক নিন্দা খানিক স্তুতি,
মড়মড়ে নটবর,
যেই শুনলুম লেখকটি কে সে সমালোচনার
বিনা বাকোই ক্ষমা করলুম নিন্দার ভার,
নড়বড়ে নটবর,
অপারগ আমি ক্ষমা করতে যে তোমার স্তুতি
হড়হড়ে নটবর।

(You did late review my lays
Crusty Christopher ;
You did mingle blame and praise
Rusty Christopher.
When I learnt from whom it came,
I forgave you all the blame,
Musty Christopher ;
I could not forgive the praise
Fusty Christopher.)

কিছুকাল পূর্বে একটি গ্রন্থালোচনা লিখেছিলাম, আমার সাধ্যমতো সততাসম্পন্ন আলোচনা, কিন্তু গ্রন্থলেখক (তাঁর ধারণায়) আচ্ছি তরহসে আমাকে ধমকে দিয়েছিলেন কথার ভেলকিবাজি-লাগানো প্রখর প্রত্যুত্তরে। লেখকরা নিজেদের নিরঙ্কুশ ভাবতে ভালোবাসেন, তুচ্ছ রিভিউ-লেখা যে সততাসম্পন্ন ও গ্রাহ্য হ'তে পারে (টেনিসন্ নিজে ক্রিস্টোফার নর্থ'র আলোচনা-নির্দেশ অনেকাংশে মেনেছিলেন) সে কথা তাঁরা প্রায়ই বিস্মৃত হন।

সম্ভবত রুচি-বর্জিত নির্দশ্ত অধ্যাপকী মনোবৃত্তিতে ভুগছি ব'লেই এ-কথা আমার মনে হয়েছে যে, বিষ্ণু দে-র অনুবাদগুচ্ছের কোনো জায়গায় (হয়তো সূচীপত্রে অথবা প্রত্যেক কবিতার শিরোনামায়) মূল কবিতাগুলির নির্দেশ থাকলে ভালো হতো। সে নির্দেশ না থাকলে শুধুমাত্র মূল কবির নাম জেনে সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না। কোনো তর্জমার মূল কবি হায়নে বা এলুয়ার এ-সংবাদে পাঠকের লাভ সামান্যই যেহেতু এমন পাঠক কমই আছেন যে অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার জন্য এলুয়ারের বা হায়নের সমগ্র কাব্যরাশি মন্থন করতে

যাবেন। টমাস হার্ডির একটি অনূদিত কবিতার মূল ইংরেজি বার করার জন্য ৭৫০ পৃষ্ঠা দীর্ঘ সম্পূর্ণ কবিতাবলী আমাকে ঘাঁটতে হয়েছে। আমি তাতে ক্ষুব্ধ নই। একটির সন্ধানে আরো অনেকগুলি কবিতা আবার পড়ে ফেললাম যা এককালে আমাকে মুগ্ধ করেছিল কিন্তু অনেকদিন পড়া হয়নি। তবুও মূল কবিতা সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত দু-একটি তথ্য যদি অনুবাদক ও প্রকাশক সরবরাহ করতেন, কাব্যগ্রন্থকে নির্দেশ-ভারাক্রান্ত না ক'রে, তাহ'লে আমা-হেন পাঠক লাভবান হ'তে পারত। মূলের সঙ্গে তুলনায় অনুবাদ পাঠের আনন্দ। কেবল বিষ্ণু দে-র কবিতা যদি জানতে চাই তাহ'লে বিষ্ণু দে-র নিজের কবিতাই পড়ব। 'হে বিদেশী ফুল' যখন পড়ছি তখন বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়ছি না, পড়ছি এলুয়ার-বিষ্ণু দে-র কবিতা অথবা হুইটম্যান্-বিষ্ণু দে-র কবিতা। অতএব অনুবাদ পড়তে হবে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে।

এ রিভিউ-এ যদিও মূল ও অনুবাদের তুলনা বিস্তৃতভাবে করতে পারছি না, তবুও কয়েকক্ষেত্রে সম্ভব দেখছি, বিশেষত ইংরেজি ও আমেরিকান কবিতাগুলির ক্ষেত্রে, যেহেতু আর পাঁচজন পাঠকের মতো আমিও বিদেশী ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজির সঙ্গেই সর্বাধিক পরিচিত। উপরে টেনিসনের একটি কবিতা—মূল ও বিষ্ণু দে-র অনুবাদ—দেওয়া হয়েছে। তা থেকে বোঝা যাবে অনুবাদে কী আশ্চর্য যথাযথ্য! প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ-ই, কিন্তু অনুবাদ কখনই অ-স্বচ্ছন্দ হয়নি, বাংলা বাক্‌রীতি থেকে অপসৃত হয়নি, অনুবাদটি নিজেই একটি মৌলিক বাংলা কবিতা এ-কথা মনে না করবার কোনো কারণ নেই। তার উপরে কৃতিত্ব যে মূলের মেজাজ সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে। কুশলী অনুবাদ যথাযথ হবে অথচ অনূদিত রূপে তার কাব্যমাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকবে—এ-দুটি সর্ত 'হে বিদেশী ফুল'-এ প্রায়ই সার্থক হয়েছে। সে সার্থকতা টেনিসনের কবিতাগুলিতে লক্ষণীয়। 'ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো' (Break, break, break) ও 'ঈগল' (The Eagle) কবিতা দুটি ধরা যাক। প্রথম মূল কবিতাটিতে আপাতসরল শব্দপ্রয়োগের সঙ্গে যে উত্থেল অথচ সংহত অনুভূতি মিশেছে, তা অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রয়েছে, উপরন্তু অনুবাদটি এতই সাবলীল যে এটিকে মৌলিক কবিতা ভাবলে বিশেষ ভুল হবে না। অনুবাদক ও মূল কবি এক্ষেত্রে একাত্ম। 'ভাঙো, ভাঙো, ভাঙো' কবিতার শেষ কথাটি—"হায়!"—ও 'ঈগল' কবিতার "ভ্রূকুঞ্চিত", এ-দুটি শব্দ কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক। মূলে Alas নেই, অথবা তৃতীয় স্তবকে যেমন O for the touch ইত্যাদি আছে তেমন কোনো খেদোক্তি নেই, "হায়" কথাটিকে আমদানি করা হয়েছে যেন নিতান্তই ছন্দোপূর্তির খাতিরে। 'ঈগল' কবিতার মূলে আছে the wrinkled sea beneath him crawls, এর অনুবাদে "ভ্রূকুঞ্চিত" না লিখে "নিচে গুটি গুটি চলেছে সাগর তরঙ্গকুঞ্চিত" লিখলে হয়তো নেহাৎ অযোগ্য হত না। টেনিসনের আরেকটি কবিতা ধরা যাক, "এই তো ঘুমায় রাঙা পাপড়ি ঘুমায় এই শাদা" (Now sleeps the crimson petal)। এ-অনুবাদটি আমার কাছে চমৎকার মনে হয়েছে, বিশেষত (Cypress)এর তর্জমা চেনার, আর "এখন অহল্যা পৃথ্বী মেলে আছে সহস্র তারায়" (Now lies the Earth all Danae to the stars), আর

এখন ত্বরিতে নামে স্তব্ধ উল্কা আর রেখে যায়
সীতা এক দীপ্ত রেখা . . .
(Now slides the silent meteor on, and leaves
A shining furrow . . . .).

কিন্তু কোনো কোনো সময় মূলের তুলনায় অনুবাদটি যথাযথ হয়নি, কখনও বা যথাযথ্যের অভাবে অনুবাদ নির্বল হয়েছে। নিচের দৃষ্টান্ত দুটি, বিশেষত দ্বিতীয়টি লক্ষ্য করা যাক —

জোনাকিরা জেগে ওঠে, জাগো তুমি আসপ্তে আমার
(The fire-fly wakes ; waken thou *with me*)
এবং ছায়ার মতো তারও প্রভা ডাকে যে আমায়
(And like a ghost she *glimmers* on to me)

"আসপ্তে" ও "সপ্তে" তো এক কথা নয়। "আসপ্তে" কথাটি with me-র অর্থ ছাড়িয়ে গেছে। "প্রভা ডাকে"—যেন নিতান্তই নতুন পদ্যলিখিয়ের বাক্যবন্ধ। মনে হয় যেন অনুবাদক glimmer-এর প্রতিশব্দ না পেয়ে প্রথম draft-এ যা-হোক দুটি শব্দ বসিয়েছিলেন, তারপর কবিতার আর অপমার্জনা হয়নি। কতকগুলি অনুবাদই যুগপৎ দুর্বলতা ও চমৎকারিতায় মেশানো। এড্‌গার অ্যালান পো-র কবিতাটি ধরা যাক—

Helen, thy beauty is to me
Like those Nicean barks of yore,
That gently, o'er a perfumed sea,
The weary, way-worn wanderer bore
To his own native shore.

On desperate seas long wont to roam
Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy Naiad airs have brought me home
To the glory that was Greece,
And the grandeur that was Rome.

Lo! in you brilliant window-niche
How statue-like I see thee stand!
The agate lamp within thy hand,
Ah! Psyche, from the regions which
Are Holy Land!

বিষ্ণু দে-র অনুবাদ :

হেলেন, তোমার রূপ মোর মনে হয়
সেকালের ভিনীসীয় তরণীর মতো,
সুগন্ধ সমুদ্রবক্ষে শান্ত ধীরে বয়
ক্লান্ত প্রবাসীকে দীর্ঘপথশ্রমাহত
আপন স্বদেশে সমাগত।

কত না দুরন্ত সিন্ধুবিহারের পরে
তোমার অতসী কেশ, ক্লাসিক বয়ান,

নেয়াড্‌ তোমার লাস্য, মোরে আনে ঘরে
গ্রীসে, চিরগৌরবের আদিপীঠস্থান
আর রোমে, আছিল যে বৈভবাশিখরে।

দেখি বাতায়নবেদীতে উদ্ভাস
আভপ্তে খোদাই স্তব্ধ স্থির মূর্তি তুমি
মর্মরের দীপ জ্বলে করপুটে চুমি।
আহা সাইকি! যেই দেশে তোমার নিবাস
সে যে পুণ্যভূমি!

এ অনুবাদের কয়েকটি অংশে আমি আকৃষ্ট বোধ করেছি : "কত না দুরন্ত সিন্ধু-বিহারের পরে", "অতসী কেশ", "আভপ্তে খোদাই" এগুলি উৎকৃষ্ট অনুবাদ। কিন্তু অপরপক্ষে কতকগুলি অংশ দুর্বল মনে হচ্ছে : "আপন স্বদেশে"—অনাবশ্যক পুনরুক্তি দোষ হয়নি কি? "ক্লাসিক বয়ান"—ইংরেজি (face) কথাটির সুষ্ঠু প্রতিশব্দ বাংলাতে চলতি নেই, কিন্তু অর্থতৎসম শব্দ "বয়ান" অপ্রচলিত, আর তা ছাড়া বয়ান শব্দটির আরবী অভিধা (বিবরণ) অধিক প্রচলিত। "রোমে, আছিল যে বৈভবাশিখরে"—অপটু অনুবাদ, অনর্থক একটি নিষ্প্রাণ রূপক ঢুকে গেছে। এ-সব ত্রুটি ছাড়া brought me *home* to . . . . Greece এর তর্জমা "মোরে আনে ঘরে" দেখে বিমূঢ় বোধ করছি। আক্ষরিক অনুবাদে কি ইডিয়মের অনুবাদ হয়?

স্মরণীয় চমৎকারিতা ও ক্লেশকর দুর্বলতার সমাবেশ অন্য কবিতাতেও পাচ্ছি। ব্রাউনিঙের সুন্দর ছোট কবিতাটির অনুবাদ পড়া যাক—

The grey sea and the long black land ;
And the yellow half-moon large and low ;
And the startled little waves that leap
In fiery ringlets from their sleep,
As I gain the cove with pushing prow,
And quench its speed i'the slushy sand.

Then a mile of warm sea-scented beach ;
Three fields to cross till a farm appears ;
A tap at the pane, the quick sharp scratch
And blue spurt of a lighted match,
And a voice less loud, thro' its joys and fears,
Than the two hearts beating each to each!

Meeting at Night

ধূসর সমুদ্র আর, দীর্ঘ এক কৃষ্ণ তটরেখা,
এবং হলুদ অর্ধচন্দ্র স্ফীতমুখে আছে হেলে,
ছোটো ছোটো ঢেউগুলি আচমকা ঘুম থেকে জেগে
চমকে লাফায় ক্ষ্যাপা পাকে পাকে যেন ঘুর লেগে,

খাড়িতে পৌঁছাই যবে শেষে আমি লগি ঠেলে ঠেলে
পিচ্ছিল বালিতে তার বেগ রুদ্ধ করি দিয়ে ঠেকা।

তারপরে ক্রোশটাক সমুদ্রসুরভি উষ্ণবেলা
তিনটি ক্ষেতের পরে শেষে এক গোলাবাড়ি আসে,
সার্শিতে একটি টোকা, ক্ষিপ্রখর একটি আঁচড়,
আর এক দেশলাইয়ে নীল দ্যুতি ক্ষণিক ভাস্বর,
আর এক কণ্ঠ—তার শব্দ, জোড়ে বাঁধা তালে মেলা
দুইটি বক্ষের চেয়ে আরো নিচু, আনন্দে সন্ত্রাসে।

দ্বিতীয় স্তবকে সুষ্ঠু অনুবাদ পাচ্ছি। "সার্শিতে একটি টোকা, ক্ষিপ্রখর একটি আঁচড়"—এখানে মূলের ধ্বন্যলংকার অনেকটা বজায় রয়েছে। "ক্ষিপ্রখর"-চমৎকার portmanteau word ; তবে মূলের spurt কথাটির উপযুক্ত প্রতিশব্দ পেলে ("ছিটকনো"?) স্তবকটি নিখুঁত হতো। প্রথম স্তবকে তৃপ্তি পাচ্ছি না। চতুর্থ ছত্রে fiery ringlet সরিয়ে দিয়ে নতুন ইমেজ আনা হয়েছে—"চমকে লাফায় ক্ষ্যাপা পাকে পাকে যেন ঘুর লেগে"। এতে খুবই লোকসান হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়। শেষ ছত্রে quench কথাটির আশ্চর্য ব্যঞ্জনা রক্ষিত হয়নি। "**পিচ্ছিল** বালি" যথাযথ অনুবাদ তো নয়ই, তা ছাড়া সমুদ্রসৈকতের ভিজে বালি পিচ্ছিল হয় কি? আমার বেশি আপত্তি দ্বিতীয় ছত্রে : yellow half-moon large and low, "হলুদ অর্ধচন্দ্র স্ফীতমুখে"। অর্ধচন্দ্র কথাটি half-moon-এর আক্ষরিক তর্জমা কিন্তু বাংলা ইডিয়মে তুচ্ছার্থসম্পন্ন। অনুবাদক যখন তার উপরে লিখলেন "স্ফীতমুখ" তখন তুচ্ছতার সে ব্যঞ্জনা আরো প্রখর হলো যদিচ মূলে এমন কোন ব্যঞ্জনা তো নেইই, অনুবাদক-ও সম্ভবত সে-ব্যঞ্জনার প্রয়াসী নন। ইংরেজি কথা কয়টির বাংলা তো এইরকম : হলুদ মস্ত আধখানা চাঁদ। কথা কয়টিকে কাব্যছন্দে রূপান্তরিত করার কৌশল আমার চেয়ে ভালো জানেন কবি-অনুবাদক।

ইংরেজি ইডিয়মের অনুবাদে ত্রুটি আরো কয়েকটি নজরে পড়েছে—

যে যার আপন **সীমায়** (each in our *degree*)—হার্ডি, ৯০ পৃঃ।

এ কবিতা করেনি **অক্ষম** (my verse *astonished*)—শেক্‌স্‌পীয়র, ৭২ পৃঃ।

নিকৃষ্ট **খেয়ালে** (worse *essays*)—শেক্‌স্‌পীয়র, ৭৪ পৃঃ।

সে আমারই **রোখে** (*that is I*)—হার্ডি, ৯১ পৃঃ।

তোমার উপমা আমি দেব না কি বসন্তের **দিনে** (shall I compare thee to a summer's day)— শেক্‌স্‌পীয়র, ৬৭ পৃঃ।

নক্‌সীর কাঁথা (embroidered cloths)—ইয়েটস্‌, ৯৫ পৃঃ। হওয়া উচিত নক্‌সী-কাঁথা।

দুই তিনজনা ছিল **লাবণ্য-ধূপ** (And two or three had charm)—ইয়েট্‌স্‌, ৯৫ পৃঃ।

সে লাবণ্য সে মুখ আজ **আফ্‌শোষ** (But charm and face wore *in vain*)—ইয়েট্‌স্‌, ৯৫ পৃঃ।

উলুর বনের খড় (ইয়েটস্‌, ৯৫ পৃঃ), হওয়া উচিত উলুবনের খড়।

মনে হয় অনুবাদকর্মে বিষ্ণু দে কোন কোন সময় কিছু strain বোধ করেছেন। অন্তত

দুটি দৃষ্টান্ত পাচ্ছি যেখানে খুবই সম্ভবত মিলের খাতিরে অযথা শব্দ ঢোকানো হয়েছে। একটি উপরে উদ্ধৃত হার্ডির ছত্র—"সে আমারই রোখে"—"চোখে"-র সঙ্গে মেলানো। আরেকটি শেক্‌স্‌পীয়র অনুবাদে—

তবু তো সৌন্দর্য, আহা, ঘড়ির কাঁটার মতো **ঋানু** (Ah! yet doth beauty, like a dial-hand)। মূলে "ঋানু" কথাটির কিছুমাত্র ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত নেই, তবুও অযথা কথাটি অনুবাদে স্থান পেয়েছে সম্ভবত "স্থানু"-র সঙ্গে মিলবার জন্য। এই strain-এর আভাস পাই সম্বন্ধ পদের বেহিসাবী প্রয়োগে : আমার পড়ুয়ার খাতাপত্রে; উলুর বনের খড়; আমার নেকড়ের পদক্ষেপ; আশার তোমার কঠিন শস্যের শীষ্‌; বীর কাপ্তেনের তোমার তনু।

অনুবাদগুলি কয়েকবার পড়ে, মূল ইংরেজি, কয়েকটি ফরাসী ও জার্মান কবিতার সঙ্গে অনুবাদের তুলনা ক'রে আমার ধারণা হয়েছে যে যদিও বিষ্ণু দে-র রুচি উদার ও বহুস্পর্শী, তাঁর অনুবাদকৃতিত্ব সীমাবদ্ধ। র‍্সার, র‍্যাঁবো, এলুয়ার; ড্রেটন, ব্লেক, এলিয়ট, সরোজিনী নায়ডু; হায়নে ও রিল্‌কে; এমার্সন, ফ্রস্ট, কমিংস, এত সব বিভিন্ন মেজাজের কবির প্রতি বিষ্ণু দে আকৃষ্ট হয়েছেন—বিভিন্ন মেজাজের, বিভিন্ন করণ-কৌশলের। যদি বলি বিষ্ণু দে has taken all poetry for his province, খুব একটা অত্যুক্তি হবে ব'লে মনে হয় না, কিন্তু কেবল রুচির ব্যাপকতাতে সব সময় অনুবাদের সার্থকতা হয় না। কোনো কোনো সময় দেখা গেছে অনুবাদক মাত্র একটি লেখকের অনুবাদেই পূর্ণ কৃতিত্ব লাভ করেছেন। আসলে কুশলী নটের মতো কুশলী অনুবাদক অর্ধেক পরাশ্রয়ী, অর্ধেক স্রষ্টা। দু'জনেরই কারুকার্য অপর-সৃষ্ট শিল্প থেকে উদ্ভূত, কিন্তু দু'জনেই শিল্পের নূতন রূপ দেওয়ার সন্ধানী। অতএব, শেষ পর্যন্ত এ'দের প্রতিভার স্ফূর্তি সেখানেই হয় যেখানে এ'রা মেজাজের সমধর্মিতা বোধ করেন। বিষ্ণু দে বর্তমান ক্ষেত্রে অনুবাদক, অথচ স্বাধিকারে কবিও। তাঁর স্বাভাবিক কবিমেজাজ, তাঁর বাক্‌ভঙ্গী, তাঁর মনন, 'হে বিদেশী ফুল'-এর ৫৭ জন কবির সঙ্গেই সমপর্যায়ী নয়। উদার রুচিতে তিনি যে বিদেশী কবিকে গ্রহণ করেছেন, কবিমেজাজে তাঁর সঙ্গে হয়তো সাযুজ্য বোধ করেননি। সাযুজ্যের সে অভাব অনুবাদের strain-এ লক্ষ্য করি। একপক্ষে যেমন বিষ্ণু দে-র স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশল নূতনভাবে প্রমাণিত হয় তাঁর নিপুণ ছন্দোবৈচিত্র্যে—terza rima, rondel, troubadour metre, free verse, sonnet ইত্যাদি—একপক্ষে যেমন তাঁর বাগৈশ্বর্যের অনেক পরিচয় সমগ্র অনুবাদগ্রন্থেই ছড়িয়ে আছে, অন্যদিকে কোন কোন অনুবাদে কেমন একটা শিথিলতা এসে গেছে, একটা প্রয়াস-ক্লিষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য। দান্তের অনুবাদে লক্ষ্য করছি পুরানো বাংলা কবিতার ডিক্‌শন্‌ প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে : যবে, সবাকার, গেনু, দোঁহে, হিয়া, বাহিরিয়া, মোর, মাঝারে, তব, তিয়াষে ইত্যাদি। এই প্রাচীন ডিক্‌শন্‌ চসরের অনুবাদেও পাওয়া যায় : হানিবে, নারিব, হৃদিমাঝে, অগেয়ানী। অথচ প্রাচীন চৈনিক কবিতার অনুবাদে নেই। জানি না অনুবাদকের মনে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল কিনা যে জন্য প্রাচীন ডিক্‌শন্‌ ব্যবহৃত হয়েছে, একক্ষেত্রে হয়েছে অথচ অপর ক্ষেত্রে হয়নি। আমার মনে হয়েছে, দান্তে, চসর, স্পেন্‌সর্‌, শেক্‌স্‌পীয়র, গ্যোয়টে প্রভৃতি কবির কবিতা-অনুবাদে বিষ্ণু দে স্বচ্ছন্দ নন। এসব কবি ও বিষ্ণু দে সমমেজাজী নন।

অপরপক্ষে সমমেজাজী কবির অনুবাদে বিষ্ণু দে-র স্বাধিকারসম্পন্ন কবিত্বশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হ'য়ে উঠেছে। আধুনিক স্পানিশ কবি, বোদেলেয়র থেকে আরাগ' অবধি ফরাসী

কবি, এজরা পাউণ্ড ও এলিয়ট, রিলকে ও সাম্প্রতিক মার্কিন কবি, এ'রা ও বিষ্ণু দে সগোত্র। ইমেজ ও সিম্বল প্রয়োগে, সাবলীল মৌখিক ভাষার প্রয়োগে গদ্যছন্দের জটিল তানবৈচিত্র্যে, সূক্ষ্ম শ্লেষপ্রিয়তায়, বিষ্ণু দে-র নিজস্ব কবিতা ও এসব কবিদের রচনায় আদৌ কোন দুস্তর ব্যবধান নেই। সম্ভবত সেজন্যই এ'দের কবিতার অনুবাদে বিষ্ণু দে স্বচ্ছন্দগতি। সেজন্যই থেকে থেকে এমন ইমেজ পাই যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন আচ্ছন্ন ক'রে রাখে—

তুষার-কণার দীপ্তিতে বোনা স্বপ্নের দুই পাড়।

পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে ছোটে,
বাতাস আমাকেও ছুঁয়ে যায়।

বালুকানপুরে বাঁধা পাথরের জানুজঙ্ঘাপদের সুষমা।

উষা আসে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে।

শীতল যেন ভুঁইচাপার পাণ্ডু ভিজে পাতা
আমার পাশে সে শুয়ে ভোরবেলায়।

এসব কবিতার সঙ্গে বিষ্ণু দে একাত্ম হ'য়ে যেতে পারেন ব'লেই যে বিদেশী ইমেজ স্বচ্ছন্দ-কৌশলে ভারতীয়কৃত হ'য়ে যায় তার দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিই—

কে করে শীতল ঐ দগ্ধ গিরি, কালিন্দীর বালুতীর কে করে সংহত
অপরাজিতার নীলে যেই নীল রাধার অম্বরে
শুন বন্ধু কহে স্মরিও আহ্মা হে (এলিয়ট)

ঘুম চাই ঘুম, নান্দীমুখের শিখা
কপিলগুহায় জ্বলুক না পুরোডাশ,
বয়ে যাবে সোম, জীবনের উল্লাস
ভগীরথ-স্রোত, থৈ থৈ মরীচিকা। (র‍্যাঁবো)

অনুবোদ আর অনুবাদ নেই, হয়েছে সৃষ্টি, স্বাধিকারোজ্জ্বল কবিতা। 'হে বিদেশী ফুল'-এর কোন কোন জায়গায় অস্বাচ্ছন্দ্য, আড়ষ্টতা আছে বটে, কিন্তু যেখানে অনুবাদ সার্থক, সেখানকার স্বাধিকারদীপ্তি বাংলার অনুবাদসাহিত্যে ঐশ্বর্য এনেছে সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

অমলেন্দু বসু

The Suez War. *By* Paul Johnson. *With an introduction by Aneurin Bevan.* Macgibbon & Kee. London. 10/6*d.*

মিউনিকের পর বৃটিশ রাজনীতির এমন চরম বিপর্যয় আর দেখা যায়নি। মিউনিকে চেম্বারলেনের চেষ্টা ছিল হিটলারকে তুষ্ট ক'রে শান্তির ছলনাটুকু অন্তত বজায় রাখা।

সুয়েজ যুদ্ধে স্যার অ্যাণ্টনী ইডেনের চেষ্টা হল প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে শায়েস্তা ক'রে পশ্চিম এশিয়ায় বৃটেনের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা। মিউনিকে চেম্বারলেনী তোষণনীতির সঙ্গে সুয়েজযুদ্ধে স্যার অ্যাণ্টনীর আক্রমণনীতির আপাতদৃষ্টিতে কোন মিল দেখা যাবে না। তবে তলিয়ে দেখলে কয়েকটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মিউনিকের তোষণনীতি ব্যর্থ হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি এবং চেম্বারলেনের "phoney peace" ফেল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চেম্বারলেনের রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয় হল। প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে স্যার অ্যাণ্টনী ইডেনের সুয়েজ যুদ্ধও বেশ তাড়াতাড়িই "phoney war" হ'য়ে দাঁড়াল; ফলে এই মহাসম্মানিত টোরীকুলচূড়ামণির রাজনৈতিক জীবনের যে অপমানজনক পরিসমাপ্তি ঘটল তা চেম্বারলেনের ভাগ্যবিপর্যয়ের চেয়েও মর্মান্তিক। কারও কারও মতে মিউনিকের দুঃস্বপ্নেই স্যার অ্যাণ্টনী সংকল্প করেছিলেন যে প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে কোনমতেই তোষণ করা হবে না—যুদ্ধই সুয়েজখাল ব্যাপারে ইজিপ্টের ধৃষ্টতার একমাত্র জবাব।

সুয়েজযুদ্ধ মিউনিকের মতই অতি নাটকীয় এবং নাটকীয় তার ঘটনা-বিন্যাস। পল জন্‌সন এই ঘটনাবলীকে তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থনের উপযোগী ক'রে সাজিয়েছেন। জন্‌সন 'নিউ স্টেটসম্যান য়্যাণ্ড নেশনের' সহকারী সম্পাদক। সুয়েজ যুদ্ধের সুরু থেকেই এই প্রগতিশীল বামপন্থী পত্রিকাখানি টোরী গভর্ণমেণ্টের বেপরোয়া আক্রমণশীল নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনে অগ্রণী হয়েছিল। তা ছাড়া পল জন্‌সন উত্তর আফ্রিকা এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে সব ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন সেগুলিতেও তাঁর তীক্ষ্ণ্য বাস্তবজ্ঞান ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া গেছে। সুয়েজ যুদ্ধের কার্যকারণ এমনই বিস্ময়কর যে এর অনেকগুলি সূত্র এখনও জানা বা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। পর্দার আড়ালে সুয়েজ আক্রমণ নিয়ে যে সব কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র চলেছিল জন্‌সন তার কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। এগুলির অবশ্য রীতিমত প্রমাণ নেই। তবে জন্‌সনের পরেও সম্প্রতি দু'জন ফরাসী সাংবাদিক কতকগুলি চাঞ্চল্যকর গোপন তথ্য প্রকাশ করেছেন—সুয়েজযুদ্ধ সুরু করা নিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ইডেন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী গী মোলে এবং ইসরেলের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে যোগাযোগ এবং বন্দোবস্তের কাহিনী এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে তা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। ফরাসী সাংবাদিক ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিযোগ লণ্ডন অথবা প্যারিস খণ্ডন করার চেষ্টাও করেনি। পর্দার আড়ালে যে চক্রান্ত হয়েছিল ঈজিপ্ট আক্রমণের জন্য তার সপক্ষে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রদের প্রকাশ্য অজুহাতটিই ছিল নির্লজ্জ প্রতারণা। ৩০শে অক্টোবর (১৯৫৬) ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রেরা তাদের চরমপত্রে ঘোষণা করে যে ঈজিপ্ট এবং ইসরেলের মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ করার মহান (!) উদ্দেশ্যেই ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী সুয়েজখাল এলাকায় হস্তক্ষেপ করান। পশ্চিম এশিয়ার ভক্ষকেরাই রক্ষকের ছদ্মবেশে দেখা দিলেন; সুপরিকল্পিতভাবে ফরাসী বিমানবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ইসরেল আক্রমণ করে ঈজিপ্টকে; ইংরেজ বোমারু বিমান এবং যুদ্ধজাহাজ এর পর আক্রমণ সুরু করে পোর্ট সৈয়দ বন্দরের উপর। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ইডেন এবং লয়েড স্বীকার-ই করতে চান না যে ঈজিপ্টের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। পল জন্‌সন এই সময়কার দৈনন্দিন ঘটনাবলী এবং লণ্ডন ও প্যারিসের বড় কর্তাদের বিবৃতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন সুয়েজ যুদ্ধটা কী পর্বতপ্রমাণ শঠতা, ছলনা, মূঢ়তা ও ভীরুতার কলঙ্কে কালিমাময়। সুয়েজযুদ্ধ ব্যাপারে বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রনেতারা জঘন্য মিথ্যাচারণের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে পল জন্‌সনের উক্তি উদ্ধৃতি করার যোগ্য :

"At the heart of our political consciousness is the notion that a British Minister of the Crown is an honourable man. If this is destroyed, the system is fatally injured; its life-blood—public confidence—drives away.

"In the last few weeks, we have had the spectacle of British Ministers lying to the House of Commons, to their own party and to the public. They have lied to United Nations and to their own allies. When exposed, they have compounded these falsehoods by more lies."

পল জন্‌সনের উক্তি যে পক্ষপাতদুষ্ট নয় তার প্রমাণ একই বিষয়ে লণ্ডন 'টাইমস' পত্রিকার মন্তব্য—

"The Anglo-French ultimatum of October 30 was dishonest, in the sense that its real object was not to protect British and French lives, to separate the combatants, to safeguard shipping or to forestall a Russian *coup*, but to enable us to seize the canal by force and above all to destroy the Nasser regime."

অর্থাৎ সুয়েজযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল খাল দখল এবং প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ইডেন এবং গী মোলের ভরসা ছিল যে, যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারলে শেষপর্যন্ত মার্কিন মিত্রকেও পাশে পাওয়া যাবে। গী মোলের আরও আশা ছিল যে, প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে সরাতে পারলে উত্তর আফ্রিকার আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করা যাবে। সুয়েজ যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা কার, ইডেনের অথবা গী মোলের, তা ঠিক ক'রে বলা যায় না। মিঃ ডালেসের ভূমিকা আরও রহস্যাবৃত। যাঁর কূটনীতির বহুবিঘোষিত কায়দা হলো যুদ্ধের কিনারে কিনারে থাকা, তিনিই কি না শেষ পর্যন্ত ইডেন এবং মোলেকে নিরাশ করলেন! অনেকের কাছেই এটা প্রহেলিকা মনে হয়েছে। কারও মতে সময়টা ছিল মার্কিন প্রেসিডেণ্টের নির্বাচন-দ্বন্দ্বের, কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তারা যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে নতুন ফ্যাসাদ বাধাতে প্রস্তুত ছিলেন না। খুব সাত্ত্বিক ব্যাখ্যা একটি হলো, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর জীবনের সায়াহ্নে বড় রকম যুদ্ধ বাধানোর অভিসম্পাত মাথা পেতে নিতে রাজী ছিলেন না। কারণ এ-কথা ঠিক যে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ইণ্গ-ফরাসী আক্রমণকারীদের সংগে যোগ দিলে অপর পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন ইজিপ্টের সাহায্যে অগ্রসর হতো। সুয়েজযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত তৃতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হ'তে পারেনি, তার কারণ বহুবিধ। পল জন্‌সন বিবিধ কারণ উল্লেখ ক'রে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন নভেম্বরের (১৯৫৬) প্রথম সপ্তাহে ইডেনের কাছে মার্শাল বুলগানিনের কড়া চিঠি—পোর্ট সৈয়দে বোমা ফেলে ইজিপ্টকে শায়েস্তা করা যদি সহজ হয়, তাহলে লণ্ডন এবং প্যারিসের উপরে রকেট বোমায় পাল্টা জবাব দেওয়া খুব শক্ত নয়। ঐ সময়ের ইডেন-বুলগানিন পত্রাবলী সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে; তাতে দেখা যায় যে, সুরুতে মার্শাল বুলগানিন রকেট বোমার ভয় দেখাননি; বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ইজিপ্টের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান না চালানোর জন্য। মিউনিকের সংগে যেমন সুয়েজযুদ্ধের বিপরীত সাদৃশ্য দেখা গেছে, তেমনই অলক্ষ্য যোগাযোগ

ইজিপ্ট-আক্রমণ এবং হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট সামরিক হস্তক্ষেপের মধ্যে। খুব সম্ভবত ইণ্গ-ফরাসী মিত্রেরা ইজিপ্ট আক্রমণ না করলে সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রুশ্চেভ-মিকোয়ানের প্রতিশ্রুতিমত হাঙ্গেরী থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতো।

৩০শে অক্টোবর হাঙ্গেরী থেকে সোভিয়েট সৈন্য অপসরণ সুরু হয়েছিল। মস্কোর তখন পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিমী শক্তিরা হাঙ্গেরীকে তাদের সামরিক গোষ্ঠীভুক্ত করার জন্য চেষ্টিত হবে না। ৩১শে অক্টোবর ইজিপ্টের বিরুদ্ধে ইণ্গ-ফরাসী মিত্রদের চরমপত্র ঘোষিত হলো। তারপরই সুরু হলো ইজিপ্টের উপরে বোমাবর্ষণ। ঠিক এর পরই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট হাঙ্গেরী থেকে সৈন্য অপসরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। কেবল পল জন্‌সন নয়, কোনো কোনো রক্ষণশীল রাজনৈতিক ভাষ্যকারও বলেছেন যে, ইজিপ্ট আক্রমণের ফলেই হাঙ্গেরীর উপরে সোভিয়েট খবরদারীর দাবী সবলে প্রয়োগ করা হয়েছে।

"It was alleged at the time—and bitterly resented by Government supporters—that Anglo-French intervention precipitated the final Russian decision to reoccupy Hungary by force. In the fatal debate in the Kremlin, it was said, the bombing of Egypt tripped the balance in favour of violence . . . In this sense, it is agreeable that our action undermined the position of the liberal wing in the Kremlin, and so helped to win the debate for the Stalinists."

ইডেন, গী মোলে, নাসের এবং বুলগানিনের ঐতিহাসিক ভূমিকা মোটামুটি সহজ-বোধ্য। কিন্তু সুয়েজ নাটকের সূত্রধার মিঃ ডালেস যবনিকার অন্তরালে যে জটিল কূটকৌশল প্রয়োগ করছিলেন তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য আমেরিকা ইজিপ্টকে যে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত ছিল মিঃ ডালেস অকস্মাৎ তা প্রত্যাহার করেন। সুয়েজ-নাটকের সুরু এখানে। মিঃ ডালেসের এই আকস্মিক নীতি পরিবর্তন সম্বন্ধে পল জন্‌সন কয়েকটি ঘটনার সূত্র ধরে চমৎকার একটি কাহিনী রচনা করেছেন। এই কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা বলা যায় না। তবে কূটনীতির ইতিহাসে আড়ি-পেতে-শোনা অথবা বন্ধ দরজার চাবির ফুটো দিয়ে দেখা ঘটনার বৃত্তান্ত একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। আসোয়ান বাঁধ এবং নাসের সম্বন্ধে মিঃ ডালেসের হঠাৎ মেজাজ বিগড়ানোর যে কাহিনী পল জন্‌সন বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে পণ্ডিত নেহেরু এবং মার্শাল টিটোর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। অর্থাৎ পল জন্‌সনের মতে, মিঃ ডালেসের মেজাজ বিগড়ানোর কারণ হলো, ব্রিয়োনীতে নিরপেক্ষ নেহেরু-টিটোর সংগে নাসেরের বন্ধুতা।

"What finally made him (ডালেস) change his mind was the news that Nasser was to take part in a meeting on the Yugoslav island of Brioni with Nehru and Tito. It was the Press-announced, 'Conference of the Neutralist Powers', and it was taking place without Dulles' consent or encouragement. He read the papers, crowded with photographs of the Brioni junketings, with increasing irritation within a few days, he had come to a decision, and his first act was to replace Byrrode in Cairo and transfer Allan . . . The same afternoon he

telephoned the President to get his agreement to scrap the Aswan project."

অতঃপর মানতেই হবে যে, সুয়েজযুদ্ধে বৃটেনের আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি নষ্ট হলেও মিঃ ডালেস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। সুয়েজ-নাটকের যবনিকা-পতন হয়েছে এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। মিঃ ডালেস যতদিন এই নাটকের সূত্রধার ততদিন অবশ্যই চেষ্টা চলবে নাসের-নেহেরু-টিটোর 'নিরপেক্ষ-এলাকা'কে বিচ্ছিন্ন, বিদীর্ণ করার। সে চেষ্টার সাম্প্রতিক সাক্ষ্য জর্ডানে। সুয়েজযুদ্ধে বৃটিশ নীতির বিপর্যয় থেকে 'আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের' জন্ম। সুয়েজ-নাটকের নানা ঘটনা আপাত-দৃষ্টিতে হতবুদ্ধিকর, পরস্পরবিরোধী মনে হ'লেও, সূত্রধার মিঃ ডালেস তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখে সুকৌশলে অগ্রসর হ'তে পেরেছেন। বলাই বাহুল্য, পশ্চিম এশিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে মিঃ ডালেস অগ্রসর হ'তে পেরেছেন, মানে হলো, ঈজিপ্ট কোণঠাসা হচ্ছে এবং সেই সংগে বান্দুং-এর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বাধীন, গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হচ্ছে।

সরোজ আচার্য

The Fall *By* Albert Camus. Hamish Hamilton. London. 10/6*d*.

আলবিয়র কাম্‌-র নতুন উপন্যাস *The Fall* পড়তে আরম্ভ করে কোলরিজের 'রাইম অব দি এন্‌শেণ্ট মেরিনারের' কথা মনে পড়ে যায়। অ্যালবাট্রস হত্যার পাপবোধ বৃদ্ধ নাবিকের হৃদয় এমন ভারাক্রান্ত করেছিল যে স্বীকারোক্তি দ্বারা তার ভার লঘু করবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। বিয়ের বরযাত্রীকে আটক করে স্বস্তিলাভের আশায় তাকে নিজের কাহিনী শুনিয়েছিল। তেমনি কাম্‌র নায়ক জাঁ-ব্যাপ্তিস্ত ক্লামেন্স আমস্টার্ডাম শহরের 'নিউ মেক্সিকো' রেস্তোরাঁয় বসে ক্ষণিকের পরিচিতের কাছে নিজের অতীত জীবনকে উদ্‌ঘাটিত করে দেবার জন্য ব্যগ্র। বৃদ্ধ নাবিকের মতো ক্লামেন্সের জীবনও শেষ হয়ে গেছে। অতীতের অনুতপ্ত রোমন্থনই এখন একমাত্র কাজ।

ক্লামেন্স প্যারিসের প্রতিষ্ঠাপন্ন আইন ব্যবসায়ী। অনাথ, বিধবা ও দরিদ্র মক্কেলদের মামলা বিনা পারিশ্রমিকে সে পরিচালনা করে। অর্থের লোভ তাকে মিথ্যা মামলা তদারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কখনো প্ররোচিত করতে পারেনি। সকলের সংগে তার সহৃদয় ব্যবহার। শুধু আইনজীবী হিসাবে নয়, একজন রুচিবান, উদারহৃদয় নাগরিক হিসাবেও প্যারিসের সমাজে তার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্লামেন্সের অবচেতন মনে বেশ খানিকটা গর্ববোধ লুকানো ছিল। কিন্তু সমাজের উপর তলায় স্থান পাবার আত্মপ্রসাদ তার ব্যবহারে ঘুণাক্ষরেও বোঝবার উপায় নেই।

পর পর দুটি ঘটনায় ক্লামেন্স তার জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। যে জীবন শ্রদ্ধায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় এবং আত্মপ্রসাদে পূর্ণ ছিল হঠাৎ তার মধ্যে অতলস্পর্শ ফাঁকির গহ্বর দেখতে পেয়ে সে চমকে উঠল। প্রথম ঘটনাটি ঘটল রাজপথের উপরে। ক্লামেন্সের গাড়ীর সামনে এক মোটর-সাইকেল-আরোহী অন্যায়ভাবে দাঁড়িয়ে গেল। অগ্রসর হবার সবুজ সংকেত যখন পাওয়া গেল তখন মোটর সাইকেলের দম নেই; প্রাণপণে দম দেবার

চেষ্টা করেও আরোহী সফল হতে পারছে না। ক্লামেন্স এবং তার পিছনে আরো অনেক-গুলি গাড়ী সবুজ সংকেতের সংকীর্ণ সময় বৃথা চলে যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। গাড়ী থেকে নেমে সে বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে সাইকেল আরোহীর কাছে এগিয়ে এল; আর ঠিক তখনই দম পেয়ে ফট ফট শব্দ করে সাইকেল অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার তার গাড়ী পিছনের গাড়ীগুলির পথ আটকে আছে। ক্রমাগত হর্ণ বাজতে শুরু হয়েছে। ক্লামেন্স নিজের গাড়ীতে ফিরে আসবার সময় শুনতে পেল সমবেত জনতার মধ্যে থেকে কে একজন তাকে উদ্দেশ করে বলল, 'সিলি আস্‌'। ক্লামেন্সের পরনে নীল রঙের দামী পোষাক; বেশ মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারা। এমন লোকের সম্বন্ধে এরূপ অবমাননাকর মন্তব্য জনতা উপভোগ করল। যারা উপরে আছে, তাদের নিচে টেনে আনবার মধ্যে একটা কুটিল আনন্দ পাওয়া যায়। সে টেনে নামানোর মধ্যে কোনো যুক্তি না থাকলেও।

এই দুটি কথা ক্লামেন্সকে কশাঘাত করল। এক নিমেষে উপলব্ধি করল মিথ্যা তার এতদিনের সামাজিক প্রতিষ্ঠার গৌরব। এতগুলি লোকের সামনে অকারণে যদি এমন-ভাবে অপমানিত হতে হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে তার সামাজিক মর্যাদার গৌরব একান্তভাবেই ফাঁকির উপরে দাঁড়িয়ে ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো গভীরভাবে তার মনকে আঘাত করল। এক রাত্রিতে একটি তরুণী প্রায় তার চোখের সামনেই পুলের উপর থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আত্মহত্যা করবার জন্য। ক্লামেন্স সব জেনেও দ্রুতপায়ে বাড়ী ফিরে এল। মেয়েটিকে রক্ষা করবার জন্য জলে ঝাঁপ দিতে পারল না। অথচ তার উপচিকীর্ষা সর্বজনবিদিত। তবু এটুকু সাহস কেন তার হল না? অতি সাধারণ শ্রেণীর লোকও এ ধরনের উদ্ধারকার্যকে অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করে। নিজের প্রতি মাত্রাহীন ভালোবাসার জন্যই কি সে পারেনি? তাহ'লে তার যত দয়া, সৌজন্য ও মানবতাবোধ একেবারেই কি ফাঁকি? এই প্রশ্ন তাকে ক্রমাগত পীড়া দিতে লাগল।

এর পর থেকে ক্লামেন্স মাঝে মাঝে হঠাৎ শুনতে পায় কে যেন হাসছে। কার হাসি? চারদিকে চেয়ে দেখে কেউ নেই। জীবনের ফাঁকি ধরা পড়ায় তার বিবেক হেসে ওঠে। ক্লামেন্সের মনের শান্তি ঘুচে গেল। সে শুরু করল আত্মবিশ্লেষণ। উপলব্ধি করল, আত্মপ্রেমই মানুষের জীবনে একমাত্র সঞ্চালক। প্রণয়িণীর প্রতি প্রেম, বন্ধুর জন্য ভালোবাসা, অন্যের ভালো করবার প্রবৃত্তি,—এই সবকিছুর পশ্চাতেই আছে নিজের প্রতি গভীর আসক্তি। যে উপচিকীর্ষা নিয়ে সে গর্ব করত তার মধ্যেও যে কত বড় ফাঁকি লুকিয়ে ছিল তা এখন বুঝতে পারে। আজ সে প্রশ্ন করে, তার পরোপকারবৃত্তি যদি নিষ্কলুষ হয় তাহলে উপার্জিত অর্থ সকলের সংগে ভাগ করে ভোগ করেনি কেন? রাস্কিনের মতো সে এখন উপলব্ধি করছে যে চারপাশের দুঃখের মধ্যে শুধু নিজেকে নিয়ে সুখে থাকবার চেষ্টা বিবেক কখনো ক্ষমা করে না।

আমরা প্রত্যেকেই দ্বৈত জীবন যাপন করি। বাইরের পালিশ-করা মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে আমাদের স্বার্থকলঙ্কিত জীবন। চাকচিক্যময় মুখোশটাকেই জীবন মনে করে সে ভুল করেছে। এখন জানতে পেরেছে নিজের সত্য পরিচয়, মনের অন্ধকার গুহায় যে পরিচয় এতদিন লুকিয়ে ছিল। নিজেকে জেনে সে সমাজকেও জানতে পেরেছে। যে প্যারিসের বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে এতদিন ডুবে ছিল এখন সেই প্যারিসকেই মনে হয় 'a magnificent dummy setting inhabited by four million

silhouettes.' ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরা বর্তমান যুগের মানুষ সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য একটি বাক্যেই শেষ করতে পারবেন। সেই সর্বার্থবোধক বাক্যটি এই : 'he (modern man) fornicated and read the papers.'

জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ক্ল্যামেন্স আইন-ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমস্টার্ডামে 'নিউ মেক্সিকো' রেস্তোরাঁয় বসে সে তার অতীত জীবনের কাহিনী বলছে। একটি দীর্ঘ 'মনোলগ'। যেন নিজেকে সে অভিযুক্ত করছে। তার বিবেক-দংশন পাঠকের বিবেকও সচেতন করে তোলে। এখানেই এই বইয়ের সার্থকতা। ব্যক্তিবিশেষের বিচার নয়, আধুনিক সমাজের বিশ্লেষণ; সমাজের বিবেককে চাবুক মেরে সচেতন করবার প্রয়াস। কামু-র আঙ্গিকই এই উদ্দেশ্যের সহায়ক। মনে হয়, নায়ক যেন পাঠকের সামনে বসে কথা বলছে; তার কথা শোনবার জন্য আর কেউ উপস্থিত নেই। তাই প্রত্যেকটি শব্দের ভার অনেক গুণ বেশি হয়ে পাঠকের মনের উপর আঘাত করে।

বইখানিকে উপন্যাস বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ আছে। নায়কের বিবেক-দংশনের ক্রমাভিব্যক্তির যে নিপুণ বিশ্লেষণ আছে তা যতটা মনোবৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়ে করা হয়েছে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি দিয়ে ততটা নয়। স্বীকারোক্তির পরিবেশটি ইঙ্গিতময়। শহরের বৃত্তাকার পরিখার উপর গাছের পাতা ঝরে পড়েছে, বন্ধ জলাশয় থেকে পচা পাতার গন্ধ উঠছে; কখনো সেই পরিখার ধারে বসে, কখনো বা মৃত সমুদ্র জাইডার জী-র উপর দিয়ে নৌকা করে যেতে যেতে ক্ল্যামেন্স তার কাহিনী বলছে। বিবেকহীন বিবর্ণ জীবনের উপযুক্ত পরিবেশ। কোলরিজের বৃদ্ধ নাবিকের অস্বাভাবিক ভাস্বর দৃষ্টি যেমন বরযাত্রীকে বন্দী করেছিল, তেমনি ক্ল্যামেন্সের বিবেক-দংশনের তীব্র যন্ত্রণা প্রথম থেকেই পাঠককে আকৃষ্ট করে। এই জীবনযন্ত্রণা তো শুধু নায়কের নয়, সে যন্ত্রণার বলি পাঠকও। এই অনুভূতির চেতনা পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যায়। চেতনা জাগাবার কৃতিত্ব লেখকের। মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস ভবিষ্যতে কি রূপ লাভ করবে আলোচ্য বইখানি হয়ত তার পূর্বাভাষ। কিংবা জীবন সম্বন্ধে একটি গভীর তত্ত্বকে কতটা সহজ ও সুখপাঠ্য করা যায় এটি তারও উদাহরণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কামু-র রচনাবলীর মধ্যে *The Fall* একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাসের চরিত্রগুলি ক্ল্যামেন্স-এর মতো জটিল নয়। তাই লেখক যথাসম্ভব ব্যক্তিনিরপেক্ষতা বজায় রেখে চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এখানে ক্ল্যামেন্স-এর মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রসারটা সুস্পষ্ট। এর চেয়ে বড় কথা কামু-র নতুন জীবন দর্শন। তাঁর পূর্ববর্তী উপন্যাস *The Outsider* এবং *The Plague*- এ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেই মানুষের জীবনের দুঃখকষ্টের জন্য পরোক্ষে দায়ী করা হয়েছে। হিটলারিজম, স্ট্যালিনিজম, রাজনৈতিক চক্রান্ত, যুদ্ধ প্রভৃতি বাহ্যিক ঘটনা ও পরিস্থিতি আমাদের দুঃখের কারণ। আমরা এদের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে কামু বাহিরকে উপেক্ষা করেছেন। দেখিয়েছেন, নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতার জন্যই আমরা দুঃখ পাই, আমাদের পতন ঘটে।

জীবনের এই গভীরতর উপলব্ধির দ্বারা কামু-র সাহিত্য নিছক সাময়িক সমস্যার আবর্ত থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

The Deer Park *By* Norman Mailer. Allan Wingate Ltd. London. 12/6*d*.

নর্মান মেইলারের *The Naked and the Dead*-এ যে গভীর নৈরাশ্যের সুর ছিল, বর্তমান উপন্যাসে তা আর-ও পরিণতি লাভ করেছে। জীবন সম্পর্কে লেখকের ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা এবং অনুধ্যানের পরিচয় যেমন এতে আছে, তেমনি লেখক-মানসে জীবন-যাপনের গভীর অর্থহীনতা দৃঢ়তর প্রতীতি নিয়ে দানা বেঁধেছে।

The Deer Park-এর পটভূমিকা আমেরিকান একটি ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য-উপনিবেশ—যে জাতীয় উপনিবেশ আমেরিকার ধনকুবেরেরা অর্থ-বিনিয়োগের একটি ক্ষেত্র হিসাবে নির্মাণ ক'রে থাকেন। নতুন-গড়া উপনিবেশ ব'লে এখানে বাসিন্দার সংখ্যা কম, এবং স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা আরও কম। এরই মধ্যে বিভিন্ন কার্য-কারণের দ্বারা চালিত হ'য়ে উপন্যাসোক্ত নায়ক-নায়িকারা এসে জড়ো হয়েছে এবং দিন কয়েকের জন্য নানা বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে জড়িত হ'য়ে পড়েছে। এদের কারও পূর্বের ইতিহাসই সরল রেখাঙ্কিত নয়। সার্জিয়াস, যে উত্তম পুরুষে কাহিনীটা বিবৃত করছে, এক অনাথ-আশ্রমে মানুষ; সামরিক বিমান-বাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে সে বর্তমানে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে বেকার হিসাবে। জুয়ো খেলায় হাজার কয়েক ডলার পেয়েছিল; তাই তার একমাত্র সম্বল। Deer Park-এ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো ইটেলের, যে প্রচুর মদ খায় কিন্তু মাতাল হয় না। এক অস্ট্রিয়ান বাপ এবং এক ফরাসী মায়ের সন্তান হলো ইটেল। বংশের মধ্যে সে-ই প্রথম কলেজে পড়তে যায়, তারপর ভবিষ্যতের পেশা নিয়ে বাপের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে এবং একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমে-পড়ায় সে মেয়েটিকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে আসে এবং কালে একজন নামজাদা সিনেমা-পরিচালক হয়। সে পর-পর তিন-চারটি মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং যথাসময়ে তাদের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদও করেছে। যখন সে সুনামের উচ্চশিখরে তখন হঠাৎ সে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সন্দেহে Anti-Subversive Committee- র কবলে পড়ে। সে যদি দোষ স্বীকার ক'রে তার কম্যুনিস্ট বন্ধুদের নাম প্রকাশ ক'রে দিত তবে সম্মানজনকভাবে অব্যাহতি পেতে পারত এবং যে ধনকুবের স্টুডিও-পরিচালকের কাছে সে কাজ করত সে কাজ-ও তার অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু আত্মসম্মানবোধ তার এই হীন স্বীকারোক্তির পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ালো। আর তার ফলে উপজীবিকা-চ্যুত হ'য়ে সে এসে উপস্থিত হয়েছে, এই 'ডেজার্ট ডর' উপনিবেশে।

দু'টি প্রধান নারীচরিত্র আছে—এলিনা আর লুলু। এলিনা মুন্সিন নামে এক সিনেমা-প্রযোজকের কাছে থাকত; এখানে এসে সহজেই সে ইটেলের সঙ্গে বসবাস সুরু ক'রে দিয়েছে। এলিনা এক অদ্ভুত অনিশ্চিত চরিত্রের মেয়ে। জীবনে তার কোন স্থির লক্ষ্য নেই। ইটেলের প্রতি মোটামুটি সে বিশ্বাস রক্ষা ক'রে চলে; কিন্তু সে জানে ইটেলের সঙ্গে তার সম্পর্ক একদিন ভেঙে যাবে; এবং ভরসা রাখে অন্য পুরুষের আশ্রয়ের অভাব তার হবে না। লুলু কিন্তু একটু বেশি ব্যক্তিত্বশালিনী, ইটেলের ভূতপূর্ব পত্নী। এখানে সে সার্জিয়াসের সঙ্গে বাস করছে। কিন্তু সে সিনেমা-অভিনেত্রী। কোন কণ্ট্রাক্ট নিয়ে সে সিনেমারাজ্যে চলে যাবে, এবং তখন কাকে বিয়ে করবে, তার-ও মোটামুটি ঠিক আছে।

এই নানাজাতীয় চরিত্রের মধ্যে একটা সাধারণ মিল আছে—এরা সবাই কম বেশি শিল্পীভাবাপন্ন। সার্জিয়াস্ লেখক হওয়ার বাসনা রাখে, এবং সেইজন্য সিনেমার একটা

লোভজনক প্রস্তাবকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। ইটেল পরিচালক এবং সিনেমার গল্প-রচয়িতা। একটি প্রকৃত শিল্পোত্তীর্ণ কাহিনী রচনার তার অভিলাষ আছে। লুলু অভিনেত্রী। এলিজার-ও মনের মধ্যে শিল্পজনোচিত স্পর্শকাতরতা আছে। এরা সবাই বুদ্ধিমান এবং যোগ্যতাসম্পন্ন; তবু উৎপাদন-যন্ত্র এদের হাতে নেই ব'লে এদের ভাগ্য মালিকপক্ষের মর্জির উপর নির্ভরশীল।

এই মালিকপক্ষ যে কত স্থূল মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং স্বার্থসর্বস্ব, লেখক তা-ও দেখিয়েছেন টেপিসের চরিত্রে এবং খানিকটা তার জামাই মুসিনের চরিত্রে। এদের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্প-বোধের অভাব, তেমনি স্থূল এবং কদর্থ লালসা একটা বাইরের সম্মানের কাঠামোর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। মানুষকে এরা নিজেদের খুশির এবং প্রয়োজনের পুতুলে পরিণত করতে চায়।

আর একটি খুব অদ্ভুত চরিত্র আছে—ডোরিয়ান ফে। উপনিবেশের এক রেস্তোরার অধিকারিণীর কোন এক পূর্ব স্বামীর ছেলে সে। মায়ের ঠি-সীমানাও সে মাড়ায় না, এবং স্বাভাবিক কারণেই। তার রহস্যময় জীবন-যাত্রার মধ্যে একটা জিনিষ আমরা জানতে পারি,—সে কতকগুলো 'কল গার্ল' পোষে, এবং খদ্দেরদের থেকে তারা যা পায় তার নির্দিষ্ট অংশ সে গ্রহণ করে। এক জায়গায় আমরা তাকে খুব বিচলিত অবস্থায় দেখতে পাই। প্রাণপণে সে তার মনের মায়া-মমতা জাতীয় কোমল বৃত্তিগুলোকে পিষে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে। এই নিষ্পিষ্ট কোমলতা প্রতিক্রিয়ায় তার মনে একটা জিঘাংসামনোবৃত্তির জন্ম দিয়েছে। এলিনা যখন ইটেলকে ছেড়ে তার সঙ্গে বসবাস সুরু করেছিল, তখন সে তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেছিল; এবং না পেরে মোটর দুর্ঘটনায় তার জীবনাবসান করায় প্রয়াসী হয়েছিল।

ডোরিয়ান ফে-র চরিত্রের এই বিশেষত্ব নিছক একটি ঘটনা নয়। এর গভীরতর তাৎপর্য আছে। এর সমান্তরাল ঘটনা হিসাবে আমরা দেখতে পাই, ইটেল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি হিসাবে যে কাহিনী রচনা করতে চায় তা এমন একজন লোকের কাহিনী যে জগতের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে গিয়ে দয়ার সমুদ্রে ডুবে মরেছিল।

এই দুটো জিনিষ এক সঙ্গে ক'রে দেখলে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যায়। যে আধুনিক সভ্যতা মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্মুখে রেখে যাত্রা সুরু করেছিল আজ তিন চার'শো বছর পরে সেই মানবধর্ম মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বিশ্বযুদ্ধ (যুদ্ধের একটা পশ্চাৎপট সার্জিয়াসের মারফৎ আগাগোড়াই বইতে উপস্থিত), বিরাট রাষ্ট্রদানব, মুনাফা শিকারের অর্থনীতি, সমস্ত মিলিয়ে পৃথিবীকে আজ এমন জায়গায় এনে ফেলেছে যেখানে মানুষের মায়া-মমতা বা দুঃখ-মোচনের সংকল্প নিতান্তই উপহাসের বস্তু। বরং আরও সংগতভাবে এই কথা-ই মনে হয় যে মানবিকতা নিরুদ্ধ হ'য়ে উদ্দাম দানবিকতায় রূপান্তর লাভ করেছে।

বস্তুত, মানবধর্ম, গণতন্ত্র এবং এ-সবের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় মূল্যবোধের অপমৃত্যুই এ-বই-এ উল্লিখিত চরিত্রদের প্রধান বিশেষত্ব, জীবন-যাত্রার তাগিদে তারা চালিত হয়,—উচ্চাশা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং প্রেম। ইটেলের জীবনে আমরা দেখতে পাই, অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝতে পারলো চলচ্চিত্র-পরিচালক হিসাবে সে এমন একটি মুনাফা-শিকারের যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত যেখানে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির আশা সফল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। বাকি রইল শুধু শারীরিক আরামের জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জনের;—আর আমেরিকার

জীবন-যাত্রা এমনি যে অর্থ-উপার্জনের নেশা মানুষকে তৃপ্তি না দিক তার নাগপাশ থেকে অব্যাহতি পাওয়া বড় শক্ত। Anti-Subversive Committee-র প্রস্তাব না মানার ফলে দিন কতকের জন্য সে কর্মজগৎ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ল। ইটেল ভাবল, কমিটির প্রস্তাব না মানাটা নেহাত-ই তার ব্যক্তিগত অহংকারের ব্যাপার। এর সঙ্গে যে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক প্রশ্ন জড়িত আছে, তা নিয়ে একবারও মাথা ঘামালো না। তার কারণ গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি মূল্যবোধ সে হারিয়ে ফেলেছে। দুর্বল ব্যক্তির অহংকার এক সময় ধূলায় লুটিয়ে পড়ল; সে কমিটির কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সিনেমাজগতে ফিরে যাওয়ার পথ তৈরী ক'রে নিল। 'ডেজার্ট ডরে' অবস্থানকালে ইটেল এলেনা-র সঙ্গে বাস করত। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে প্রেম গভীর হয়ে উঠত। কিন্তু যেহেতু সে প্রেমের কোন উচ্চমূল্যে বা প্রেমের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী নয়, সেই হেতু সে মাঝে মাঝে এলিনার প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করার একটা দুর্বার অনির্দেশ্য প্রয়োজন বোধ করে। সে অতি-কামুক নয়, কিন্তু এটাকে সে তার স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করে। সেইজন্যই পরবর্তীকালে এলিনাকে বিয়ে করার পরে এবং তার সন্তানের জনক হওয়ার পরও সে মাঝে মাঝে অন্য নারীর ঘরে রাত্রিবাস করতে যাচ্ছে। তার সর্বশেষ প্রশ্ন মূল্যবোধের এই অপমৃত্যুরই স্বাভাবিক পরিণতি—জীবনের বাকি দিনগুলো নিয়ে সে কী করবে?

লেখকও আমাদের সামনে এই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, এই গতানুগতিক জীবন যাপনের অর্থ কি?

সমস্তরকম মানবীয় আদর্শে অবিশ্বাস অন্যান্য চরিত্রেরও বিশেষত্ব। সার্জিয়াস সিনেমার লোভজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে পরে অনুতাপ বোধ করে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসানের আর কোন পথ যখন সে দেখতে পাচ্ছে না, তখন লেখক হবার আদর্শের মূল্য সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। তবু শেষ পর্যন্ত তার মনে হয়, লেখক হবার জন্য যে রহস্যজনক মনের অধিকারী হওয়া দরকার, নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সেই মন তার আয়ত্তে এসেছে। এই একমাত্র আশার কথা আমরা সার্জিয়াসের চরিত্রে পাই।

নারীচরিত্রগুলি অবশ্য এ-সব দার্শনিক চিন্তার স্বারা পীড়িত নয়। বিলাস এবং আরামের সঙ্গে বেঁচে থাকবার জন্য উপস্থিত যে-কাজ তাদের সামনে এসে পড়ে তাই নিয়েই তারা ব্যস্ত। তাদের আর একটা সমস্যা—প্রেমের মূল্যবোধ ভেঙে গিয়েছে ব'লে প্যাশানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব এবং তার জন্য মানসিক অশান্তি অনেকগুণ বেড়েছে।

লেখকের অন্যতম গুণ তাঁর সত্যভাষণ। জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যা লেখক অনুভব করেছেন তা তিনি নিষ্ঠুর সততার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, কোন সস্তা আবরণ দিয়ে নিজের বিশ্বাস-ভঙ্গকে ঢাকতে চেষ্টা করেননি। কাজেই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী নৈরাশ্যবাদীর হ'লেও জীবনের গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত এ নৈরাশ্যবাদকে মূল্য দিতেই হবে। লেখকের দ্বিতীয় গুণ তাঁর বাস্তববাদ। অবশ্য বলা বাহুল্য, লেখক বাস্তববাদীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে—সমাজজীবনের কোন খণ্ডাংশের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সমস্যাবলী উপস্থিত করার জন্য এ বই লেখেননি। তাঁর উদ্দেশ্য কয়েকটি ব্যক্তিচরিত্রের মানসলোকের সন্ধান দেওয়া। কিন্তু যে চরিত্রগুলিকে তিনি নির্বাচিত করেছেন তারা আমেরিকার সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। তাদের ভিতর দিয়ে আমরা আমেরিকার সমাজের অন্তর্জীবনের অনেক দূর অবধি দেখতে পাই। জটিল চরিত্রগুলির চিত্রায়নে লেখক পর্যবেক্ষণশক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। এমন সত্যনিষ্ঠ চরিত্রায়ণ সাম্প্রতিককালের আমেরিকান সাহিত্যে খুব বেশি নেই

ব'লেই মনে হয়।

লেখকের নৈরাশ্যবাদও স্বাভাবিক। গতানুগতিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে অবলম্বন ক'রে যে ব্যক্তি ভাবনা সুরু করে, গণতন্ত্র ব'লে কোন আদর্শ শেষ পর্যন্ত তার কাছে অসম্ভব ব'লে প্রতীত হয়। এই সিদ্ধান্তের ঊর্ধ্বে উঠতে গেলে লেখকের পক্ষে প্রয়োজন আমেরিকান সমাজের আবর্তের এবং চিন্তাশৃঙ্খলের বাইরে এসে এই সমাজকে পর্যবেক্ষণ করা। কাজটা কঠিন সন্দেহ নেই; কাজেই লেখক তা পারেননি বলে আপশোষ ক'রে কোন লাভ নেই।

আজকালকার অধিকাংশ আমেরিকান উপন্যাসেই মনোরম আধা-রোমাণ্টিক আধা-নিউরোটিক কাহিনী বা ফ্রয়েড-ভিত্তিক মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রদর্শন-ই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু *The Deer Park* এমন একখানা বই যার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার ছাপ আছে। অথচ কাহিনীকে লেখক তত্ত্ব ক'রে তোলেননি, তত্ত্ব রয়েছে কাহিনীর অনেক গভীরে। এই-খানেই লেখকের কৃতিত্ব।

অচ্যুত গোস্বামী

The Accumulation of Capital. *By* Joan Robinson. Macmillan & Co. Ltd., London. 15*s.*

রক্ষণশীল দেশ ইংল্যান্ড, এবং সনাতন রীতিনীতির চরম শাসন সম্ভবত কেম্ব্রিজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়াদিতে। অতএব প্রায় বাজি রেখেই বলা চলে, অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত শ্রীমতী রবিনসন রীডার হয়েই থাকবেন, মার্শাল অধ্যাপকের পদ দূরে থাক, সাধারণ কোনো অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করবার জন্য পর্যন্ত তাঁকে আহ্বান জানানো হবে না। কিন্তু তাতে কী-ই বা এসে যায়, মনীষা নিজের নির্ঝর বেয়ে অব্যাহতই প্রবাহিত হবে। পঁচিশ বছর আগে Marginal বিশ্লেষণের আলোড়নের তরঙ্গে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন তিনি, তার স্বাক্ষর তাঁর প্রথম বই *Economics of Imperfect Competition*। কেইন্‌সের নতুন বিশ্লেষণের সরলীকরণ ও প্রসারণের ব্যাপারেও শ্রীমতী রবিনসনের কীর্তি কম নয়। আর এখন, নতুন ক'রে চারদিকে যখন growth economics নিয়ে আলাপ-আলোচনা-উদ্যম শুরু হয়েছে, এই নতুন বই লিখে তিনি আরো একবার সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

এক হিসেবে বলা চলে, ধনবিজ্ঞানের ধ্রুপদী চিন্তার বিন্যাস প্রায় এক-শো বছর আগে মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলে, অ্যাডাম স্মিথের অন্বিষ্ট ছিলো জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির মূল-সূত্রাদির উদ্ঘাটন; রিকার্ডো জানতে চেয়েছিলেন জাতীয় প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মজুরি, মুনাফা ও জমিকরের পারস্পরিক সম্পর্কের কেমন ধারা পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অব্যবহিত পরেই বিশেষত ইংল্যান্ডের মাটিতে ধনবিজ্ঞানে বিশ্লেষণের দিগন্ত হঠাৎ ছোটো হয়ে এলো; সামগ্রিক ও কালাপেক্ষী সমস্যাদি একপাশে সরিয়ে রেখে আণবিক ও একদর্শী সংস্থার ভিত্তিতে relative prices- এর রহস্যনির্ণয়ে পণ্ডিতদের প্রয়াস আটকে রইলো, ধনবিজ্ঞান ভুললো তার আদি অঙ্গীকার। কেইন্‌সের General Theory বহুযুগ বাদে সর্বপ্রথম প্রথাগত প্রাচীরে আঘাত হানবার চেষ্টা, কিন্তু তা-ও বিশেষ এক সমস্যার প্রসঙ্গে ব'লে, এবং বিশ্লেষণে তাৎক্ষণিকতার সাহায্য গ্রহণ করা হ'য়ে থাকতে, তেমন বিপ্লবদ্যোতক হয়নি।

আসলে নতুন চিন্তার জোয়ার এসেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, গত দশ বছরের পরিসরে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিতে, সদ্য-স্বাধীনতা-প্রাপ্ত প্রাক্তন উপনিবেশাদির প্রসঙ্গে, কিছুটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা বজায় রাখবার তাগিদে, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতির প্রণালী, প্রকরণ ও পরিষঙ্গ আবিষ্কারের জন্য তদ্গত অনুসন্ধান শুরু হলো, বৈশ্লেষণিক ধনবিজ্ঞানে নতুন হাওয়া খেলে গেলো, সেই সঙ্গে ধ্রুপদী চিন্তাবিন্যাস নিয়ে নতুন ক'রে গবেষণা।

সাম্প্রতিক এই আপ্রাণ তাগিদ থেকে *Accumulation of Capital*-এর রচনা। যে কেন্দ্রিক সমস্যা এ-বইয়ের প্রধান উপজীব্য, তা নিয়ে কিছুদিন ধ'রে প্রভূত আলোচনাই পণ্ডিতমহলে চ'লে আসছে, খণ্ড খণ্ড অনেক মহৎ চিন্তার সূত্র প্রস্তাব করেছেন, শ্রীমতী রবিনসনকে বাদ দিয়েও, কাল্‌ডর, হ্যারড, হিকস্‌, কাহন্‌ প্রমুখ (শুধু ইংরেজি ধন-বিজ্ঞানীদেরই উল্লেখ করা হ'লো) মনীষীরা, তাই আলোচ্য গ্রন্থটির অন্তর্গত ঠিক কোনো চিন্তাকেই সুতীক্ষ্ম অভিনব ব'লে মনে হবে না এখন; *Economics of Imperfect Competition*-এর মতোই, এ-বইতে শ্রীমতী রবিনসনের কৃতিত্ব প্রস্তাবনার চাতুর্যে, বিন্যাসের চমৎকারিত্বে, প্রাঞ্জলীকরণের প্রায় জাদুধর্মী ক্ষমতায়। যেন রূপকথা বলা হচ্ছে ধীর মন্থর অথচ নিরুদ্বেগ গতিতে, সরল থেকে জটিলে যাত্রা, ছোটো-ছোটো অধ্যায়ের সাহায্যে। সম্পদ কাকে বলে, আয় কাকে বলে, ক'রকমের আয় হ'তে পারে, পুঁজির রূপ কী, আয়ের সঙ্গে পুঁজির সম্পর্ক, বিনিয়োগের প্রকৃতি, বিনিয়োগের শুভংকরিতা, বিনিয়োগ ও প্রাকরণিক প্রগতি, প্রাকরণিক প্রগতির প্রকৃতিফের ও ফলাফল, পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক। তারপর ক্রমে-ক্রমে বিশ্লেষণ আরো গভীরতায় গিয়ে প্রবেশ করেছে, শ্রেণীসম্পর্ক ও প্রগতির পারস্পরিক অভিঘাত; বিদেশী বাণিজ্য; লগ্নি ও লগ্নির হার; জমিকর ও পুঁজির সম্পর্ক ইত্যাদি অনেকবিধ আনুষঙ্গিক প্রশ্ন শ্রীমতী রবিনসন আলোচনা করেছেন। সবশেষে, প্রচলিত নানা মতবাদ ও তত্ত্বর গহনে ঢুকে দেখতে চেষ্টা করেছেন জাতীয় প্রগতির ও সঞ্চয়ের সমস্যার প্রসঙ্গে এদের কোনো সংস্থান আছে কিনা।

আবার বলতে হচ্ছে, গ্রন্থটির প্রধান গুণ পরিচ্ছন্নতা; প্রগতির সূত্রগুলো প্রথাগত ধনবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ ও পরিভাষার সাহায্যে খুলে মেলা হয়েছে, পুরোনো চিন্তায় যাঁরা চির-অভ্যস্ত, তাঁদেরও, অন্তত বোঝবার মুহূর্তে, হোঁচট খেতে হবে না। বিশেষ ক'রে ছাত্রদের পক্ষে তাই এ-বই পরম আদরণীয় হবে।

তা'হলেও কয়েকটি আপত্তির কথা উল্লেখ করতেই হয়। ভূমিকাতে শ্রীমতী রবিনসন বলেছেন, তাঁর বিশ্লেষণের প্রস্থানভূমি কেইন্‌সের General Theory-র সূত্রগুলি থেকে। এমন উক্তি তিনি এর আগে *Theory of Interest and other Essays*- এও করেছেন, কিন্তু কোন অর্থে? মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীরা যতই বলুন না কেন, কেইন্‌সের তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ-প্রকরণের দীর্ঘকালিক সম্প্রসারণ সম্ভব নয়, খোল-নল্‌চে বদলে ফেলতে হয় তাহলে। স্বীকার করতে না চাইলেও, শ্রীমতী রবিনসন অনেক বেশী উপকার পেয়েছেন ধ্রুপদী মনীষীদের রচনা পুনঃপঠনে, এমনকি মিকাল, কালেস্‌কী প্রমুখ অনেক সমকালীন কণ্টিনেণ্টাল ধনবিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুধাবন ক'রে। এমন অনেক-কিছু যা তাঁর কাছে অত্যন্ত অভিনব ব'লে মনে হয়েছে, গণিতের সাহায্যে তা অনেক আগেই জার্মানী অথবা হল্যান্ড কি ফ্রান্সের ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে।

আরেকটি কথা, সারা বইতে মার্ক্সের নামোল্লেখ নেই কোথাও, অথচ ধ্রুপদী ধনবিজ্ঞানের

সারাৎসার ঊনবিংশ শতকে একমাত্র মার্ক্সের রচনাতেই অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিয়ে বেঁচে থেকেছে; অর্থনৈতিক প্রগতির সামগ্রিক সমস্যার কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ—সে-বিশ্লেষণের প্রবণতা ও সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন—আজ পর্যন্ত *Das Kapital*-এই বিধৃত হয়ে আছে। এটা নিঃসংশয় যে, শ্রীমতী জোন রবিনসন তাঁর মার্ক্সের উপর পড়াশুনো থেকেও প্রভূত উপকার পেয়েছেন; কিন্তু সে ঋণের স্বীকৃতি এড়িয়ে যাওয়াকে সমবারি ছাড়া কী বলবো।

তাছাড়া, জোন রবিনসনের আগেও *Accumulation of Capital* হুবহু এই একই নামে আরেকজন মহিলা একটি মূল্যবান বই লিখেছিলেন : তিনি রোজা লুক্সেমবার্গ। সে-বইয়ের এক বিশেষ সংস্করণে শ্রীমতী রবিনসন একটি ভূমিকাও লিখেছিলেন। মাত্র কয়েকবছরের কথা তা। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে মাত্র একটি পাদটীকায় রোজা লুক্সেমবার্গের উল্লেখ সারা হয়েছে যদিও, শ্রীমতী রবিনসন নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বিশেষ করে বহির্বিনিয়োগের প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা শ্রদ্ধাশীলতার সঙ্গে অধ্যয়ন করা উচিত।

অশোক মিত্র

৫·৪১% আয়কর মুক্ত

১২-বছর মেয়াদী নতুন জাতীয় পরিকল্পনা সার্টিফিকেট কিনুন
এবং
আয়কর মুক্ত ৫·৪১% সুদ উপার্জন করুন।

এই সার্টিফিকেটে লগ্নী করা আপনার প্রত্যেক ১০০৲ টাকা ১২ বছর সময়কালের পরে ১৬৫৲ টাকার সমান হবে। যে কোনো ডাকঘরে এই সার্টিফিকেটগুলি পাবেন।

আপনার সঞ্চয় থেকে এখন আরো বেশী আয় হবে।

১০-বছর মেয়াদী ট্রেজারী সেভিংস ডিপোজিট সার্টিফিকেট

মেয়াদকাল পূর্ণ হলে বছরে ৪% হারে করমুক্ত সুদ দেয়। সুদের টাকা বছরে বছরে আপনাকে দেওয়া হয়।

পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিটস্

সুদের হার বছরে ২½%

ন্যাশনেল সেভিংস অর্গানাইজেসন

DA—57/82